ব্যঞ্জনা
৩৭০ আপার চিৎপুর রোড
জোড়াসাঁকো : কলিকাতা ॥

প্রথম প্রকাশ—

আষাঢ় ১৩৬৫,

জুন ১৯৫৮।

প্রকাশক—

পূর্ণচন্দ্র দে

ব্যঞ্জনা

৩৭০, আপার চিৎপুর রোড,

জোড়াসাঁকো,

কলিকাতা।

প্রচ্ছদপট—

চিত্তরঞ্জন ঘোষ।

নাম পত্র ও রক্ষাপত্র—

শ্যামল সেন।

ব্লক—

রূপমুদ্রা প্রাইভেট লিমিটেড।

মুদ্রাকর—

পূর্ণচন্দ্র দে

লক্ষ্মী প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড,

৩৭০, আপার চিৎপুর রোড,

কলিকাতা—৬।

পাঁচ টাকা

শ্রীবিমলকুমার ঘোষ

বন্ধুবরেষু
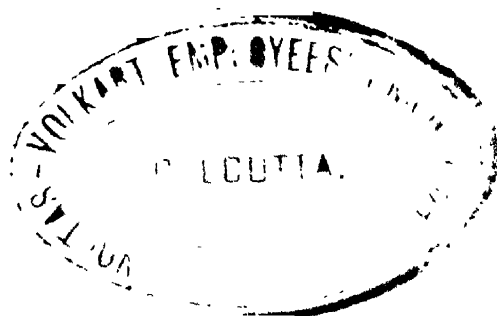
ভ্রমণ আলেখ্যটি শনিবারের চিঠি মাসিক পত্রে কার্তিক, ১৩৬৩ থেকে পৌষ, ১৩৬৪ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ সেই কাঠামোরই পরিবর্দ্ধিত পরিমার্জিত—পূর্ণতর—সংস্করণ।
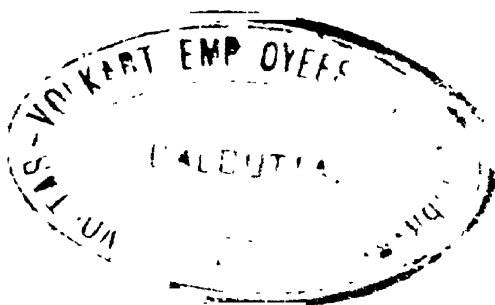
We do not know what God with us intends,
We are his playthings, clay beneath his hands,
Dumb, inarticulate, stuff which he bends,
And kneads, yet never in the furnace brands,
Could we be turnd to stone but once, endure !
For this we crave all our uneasy days,
Yet dread alone retains its sinecure,
And nothing on our pilgrimage allays.

—Hermann Hesse, Translated by Melvyn Savill.
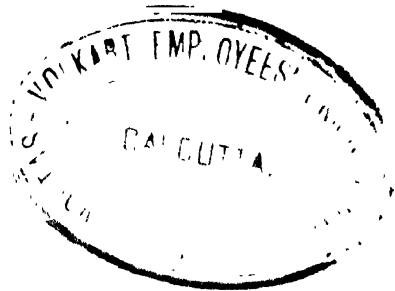
এক

তিন সপ্তাহের অনুমোদিত বাৎসরিক ছুটিতে, নিতান্তই অবসর বিনোদনের অজুহাতে—কেদার-বদরিকা ঘুরে এসেছি। তা'তে করে পুণ্যার্জন যদি বা কিছু হয়েও থাকে তবে তার পরিমাণ নিশ্চয়ই এমন অপরিমিত নয় যে, দশ জনের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ না করলে অগ্নিমান্দ্য হবে; বরং সেই ভ্রমণের বিশদ বিবরণে পাঠকের বিরক্তি উদ্রিক্ত হবারই আশঙ্কা। তা ছাড়া থলে থেকে হয়তো বেড়াল বেরিয়ে পড়বে। ভ্রমণটা যে কি পরিমাণ কৃত্রিম ও হাস্যকর তা আর গোপন থাকবে না। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কেউ কেউ যে যাত্রায় একবার শুধুমাত্র গমন করতেন, আমি মাত্র একুশ দিনে সেই যাত্রা সমাপ্ত করে প্রত্যাগমন করেছি।—যে পথের নাম মহাপ্রস্থানের পথ আমার নিকট তার দৈর্ঘ্য মাত্র তিন সপ্তাহ। আগে যে পথে যাত্রা করে যাত্রী দেহরক্ষা করতেন সেই পথ থেকে আমি আমার মাথার প্রতিটি চুল পরিপাটী রেখে ফিরে এসেছি। স্পষ্টতই দশজনের কাছে গর্ব্ব করে গল্প করবার মত আমার যাত্রা নয়। আমার বরাত মন্দ যে বিশ বা ত্রিশ বছর আগে আমি এ পথে যাইনি। অভিশপ্ত জন্মলগ্নের ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ভূমিষ্ঠ হইনি।

তবে আমার বরাত ভালো যে আরও দু বছর অপেক্ষা করিনি পথ সুগমতর হবার আশায়। আর কেদার-বদরিকার দুর্গম পথের পূর্ণ আশীর্ব্বাদ থেকেই কি সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়েছি? জানি না হরিদ্বার বা হৃষিকেশ থেকে হেঁটে অধিকতর ক্লান্ত দীন অবস্থায় কেদারনাথে পৌছলে কী প্রশান্তি আমার চিত্তগত হত, একেবারে নতুন কোন

জীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘটত। তবে সে ক্ষেত্রেও অন্যতর লেখকের মত হতাশ বা বীতশ্রদ্ধ হবার আশঙ্কা একেবারে অভাবনীয় ছিল না। অবশেষে এইবার সবিনয়ে যোগ করব, ভিন্নতর ও মহত্তর একটি জীবনের অন্তত আভাস আমি কেদার-বদরিকার পথে খুঁজে পেয়েছি। নিহিতং গুহায়াম্ কোন সত্যের অধিকারী নিশ্চয়ই হইনি, তবে দ্বিতীয় এক দিগন্তের অস্তিত্ব প্রতিভাত হয়েছে অনস্বীকার্য-রূপে। সেই আভাস টুকুকেই পূর্ণতর রূপ দেবার বা পুনরায় একবার উপলব্ধি করবার নিরীহ প্রয়াস আছে বর্তমান লেখায়।

উদ্দেশ্যটা স্পষ্টতই ব্যক্তিগত ; অতএব তা এমন ভাবে হাটের মাঝে মেলে ধরবার যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন জাগা একান্ত স্বাভাবিক। তাহলে এবার সত্য কথাটা স্বীকার করি : আমি বাঙালী। অর্থাৎ আমি তাঁদের একজন যাঁরা কিছু লিখবেন না জানলে দেশে-বিদেশে তো দূরের কথা বালিগঞ্জ থেকে বালিতেও যাননা। আপন গণ্ডির বাইরে ক্ষণকালের জন্যেও দৃষ্টিপাত করেন না। আমিও কিছু লেখার কথা না ভেবে নিষ্কাম চিত্তে কেদার-বদরিকার দুর্গম পথে পা বাড়াইনি। যাত্রাকালে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে স্মরণ করিয়েছি, ক্ষণেকের তরেও চোখের পলক ফেলব না। সামান্যতম ঘটনার কথাও রোজনামচায় টুকে রাখব। চেতনার প্রতিটি বিক্ষোভ, চিন্তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাঁজ কিছুই উপেক্ষা করব না।

ট্রেণে উঠেও সেই শপথটির প্রতি নজর ছিল, এবং হায়, অবশ্যম্ভাবী-রূপে শুধু এই শপথটির প্রতিই নজর ছিল। ট্রেনে কে উঠল না উঠল, কে কোথায় বসল, কার কাঁধে ট্রাঙ্ক পড়ল, কার ছেলে কাঁদল, কার বিছানায় কুঁজো গড়াল, কখন ট্রেন ছাড়ল কিছুই খেয়াল করিনি। কী এক অজানা ভাবনায় যেন বিভোর ছিলাম। হয়তো সদ্য-বিগত কলকাতা-জীবনের কর্মহীন ব্যস্ততা ও বৃত্তাকার অর্থহীনতার কথাই ভাবছিলাম, কিন্তু যখন হুঁশ হল তখন আর ভাবনাটার কথা মনে পড়ল না। হঠাৎ খেয়াল হল, আমি যে কলকাতা ছেড়ে চলেছি সেটাই যেন ঠিক অনুভব করছি না। বিষয়টা কিছু বিস্ময়কর। কেননা এর আগে প্রতিবারই দেখেছি কলকাতা ত্যাগ করবার অনেক আগেই আমি কলকাতা ছেড়ে থাকি, অথচ এবার কলকাতা ছাড়বার পরেও মাঝে

মাঝে কেবলই মনে হতে লাগল আমি কলকাতাতেই আছি, সকাল হলেই স্নান সেরে আপিসে যাব।

* * * * *

সেই সঙ্কল্প নিয়েই তো বেরিয়েছি, এখন দেখি বাবা কেদারনাথের ইচ্ছা।—গাড়ি ছাড়বার কিছুক্ষণ পরে সবাই সুস্থির হয়ে বসতে যাত্রীদের মধ্যে বাক্যালাপ শুরু হল। কেদারনাথের নাম শুনে বক্তৃীর দিকে একবার চাইলাম। মধ্যবয়স্কা, রুগ্না, শীর্ণা মহিলা কথা কয়টি বলেই কপালে হাত দুটো ঠেকালেন; অনেকটা মনে হল, যান্ত্রিক অভ্যাসে। কিন্তু পর-মুহূর্তেই আবার শুধু কেদারনাথকে নয় আমার সহযাত্রিনীরও অস্তিত্বটুকুর কথা বিস্মৃত হলাম। মানে, তখনও পর্য্যন্ত আমার কেদার যাত্রাটা জ্ঞানেই আছে, বোধে আসেনি। আশ্চর্য্য! এমন ভারতীয় কে আছে যে, এই যাত্রার স্বপ্ন প্রথম জ্ঞানোন্মেষের শুরু থেকেই দেখে না! অথচ সেই যাত্রায় পা বাড়াতেও আমার মন তা জানতে পারল না, আশ্চর্য্য নয়! আসল কথাটি হচ্ছে, নিজের সৌভাগ্যে তখনও বিশ্বাস হয়নি। একাদিক্রমে সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের অভ্যস্ত জীবনের পর এমন বিচিত্র ব্যতিক্রমে চট করে আস্থা স্থাপন কোন মধ্যবিত্তের পক্ষে সম্ভব!

সংস্কারমত তাই কোডর্মা ষ্টেশনে অভ্র-বাজারের সাময়িক মন্দার কথা মনে হল, গয়ায় মনে পড়ল মাছি ও পাণ্ডার কথা, ডেহরি-অন-শোনে সুরেশ ও অচলার কাহিনী, লক্ষ্ণৌতে নবাবী গালগল্প, বেরিলিতে সিপাহী-বিদ্রোহের কথা। মধ্যবিত্ত জীবনের অনুমোদিত সব অনুসঙ্গ। মাঝে কে যেন একবার আমার গন্তব্যস্থলের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। বলেছি: টিকিট দেরাদুনের, ছুটি দু মাসের, দেখি কোথায় যাই।

আমার কণ্ঠস্বরে হয়তো উণ্মনস্কতা ছিল। এবং প্রশ্নকর্তা স্পষ্টতই আলাপবিলাসী; আমার কথার সূত্র ধরেই তিনি আবার বললেন: তবে কেদার-বদরিকা যাবার যদি বাসনা থাকে, তাহলে বরং হরিদ্বারেই নেমে পড়ুন।

এইবার প্রশ্নকর্তার দিকে ভাল করে তাকাতে হল। চমৎকার সুঠাম স্বাস্থ্য, অবয়বে বুদ্ধির ও শক্তির ছাপ, বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশ, পরণে শার্ট পাতলুন। ক্ষুদ্র দীপ্ত চোখ দুটোর দিকে একবার চাইলেই নির্ভয়ে এঁর সঙ্গে উত্তরমেরু ঘুরে আসতে সাহস হয়। স্বার্থপর কারণে এইবার

একটু মৃদু হেসে বললাম : কেন বলুন তো ? দেরাদুন থেকেও হৃষিকেশের বাস পাওয়া যায় বলে তো শুনেছি।

তা পাওয়া যায়। কিন্তু হরিদ্বার দিয়ে না গেলে কেদার-বদরিকাগ্রন্থের একটি মহৎ অংশ অপঠিত থাকে। হরিদ্বার হচ্ছে কেদার-বদরিকাগ্রন্থের অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা। মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে নাটকীয় কথাগুলো ঘরোয়া সুরে স্বাভাবিক ভাবে বলে ভদ্রলোক একটু হাসলেন। প্রতি কথার আগে পরে হাসি ওঁর মুখে লেগেই আছে।

কিন্তু আমার যে টিকিট তাতে হরিদ্বারে তো নামতে দেবে না। অসহায়তার অছিলায় ক্ষীণ অনীহাটুকু গোপনের সামান্য প্রয়াস পেলাম। একক যাত্রার প্রথম পদক্ষেপে এবং প্রথম সুযোগেই আকস্মিক এক সঙ্গী জুটিয়ে নেবার দুরভিসন্ধি আমার ছিল না। অনাগত কালের জন্য একখানা মহাকাব্য লেখবার আগ্রহ যতই উদগ্র হোক, তার উপকরণ সংগ্রহের অবকাশে এবং নাগরিক জীবনের কোলাহল থেকে দূরে, হিমালয়ের নির্জ্জন নিঃসঙ্গতায় নিজেকে একবার বাজিয়ে দেখবার বালসুলভ উচ্চাকাঙ্খাও তৎসহ কতকটা জড়িত ছিল। ভদ্রলোকের আপ্যায়নে তাই কিঞ্চিৎ বিব্রত না হয়ে পারলাম না।

কিন্তু ভদ্রলোক তন্মধ্যে অধিকতর উৎসাহিত হয়ে উঠলেন : আরে, আমারও যে সেই টিকিট। তাই বলে চেষ্টা করব না! আপনার টিকিটটাও না হয় আমার কাছে দিন। আমাকে দেখিয়ে দিয়ে আপনি প্ল্যাটফর্ম থেকে আগে বেরিয়ে যাবেন।

এর পরেও ভদ্রলোকের প্রসারিত উষ্ণ হস্ত গ্রহণ না করা চূড়ান্ত অভদ্রতা হ'ত। অন্তত সেই অজুহাতে নিজের সহজাত দুর্ব্বলতার নিকট প্রচ্ছন্ন আত্ম-সমর্পণ যেন অনেকটা সহজতর হ'ল। আমি যে আজন্ম পরাশ্রয়ী সেই দীনতাটুকু প্রকাশ না করেই সচ্ছন্দে পরের আশ্রয় মিলে গেল।

নিঃসংকোচে এবং বিনাদ্বিধায় টিকিটটা হাতে তুলে দিয়ে এইবার ভদ্রলোকের নাম জিজ্ঞাসা করলাম। নাম—ননীগোপাল গোস্বামী। নিবাস—পূর্বে ছিল পূর্ববঙ্গ, এখন কলকাতা। কেন্দ্রীয় সরকারের কেরানী, ছুটি নিয়ে কেদারবদরিকা চলেছেন। একাই চলেছেন। প্রস্তাব বিনিময়ের আর প্রয়োজন ছিল না, এক ভাঁর করে চা-বিনিময়ের পর

উভয়ে উভয়ের সহযাত্রী হয়ে গেলাম। সচ্ছন্দে।

শুনেছি নাকি ভয়ানক পথকষ্ট—প্রবোধ সান্যালের বইটির কথা স্মরণ হলে তো এখনও মনে হয় বরং মুসুরী চলে যাই।

কিন্তু ওই উনিও যাচ্ছেন।—পূর্বোক্ত সেই শীর্ণা মহিলার দিকে ননীবাবু অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন। ননীবাবুর চোখেমুখে কিসের যেন একটা অনমনীয় প্রতিজ্ঞা।

আমি বললাম, ওর বিশ্বাসের জোর আছে, কিন্তু আমাদের ?:

আমাদের বয়স আছে, যৌবন আছে।

রসিকতার আড়ালে কথাটার সত্যতা গোপন করে আমি হেসে বললাম, একবচন হলেই কথাটা বোধ হয় শুদ্ধ হত। তা ছাড়া ওই দুটোই কি যথেষ্ট ?—কথার শেষে দুজনে যুগপৎ হেসে বাইরের দিকে তাকালাম।

ট্রেন ততক্ষণ লাকসার ছাড়িয়েছে। দূরে কালো মেঘের মত হিমালয়ের গিরিশ্রেণী দিগন্ত উন্মোচিত করে ধরেছে। সেদিকে চাইতেই মনটা আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠল। দূর থেকে পর্বত দেখতে চমৎকার, তখন তাকে নিয়ে কাব্য লেখাও শক্ত নয়। কিন্তু সেই দুর্গম গিরি যখন সত্যি সত্যি লঙ্ঘিতে হয়, তখন ? সেই তখনের আসন্নতায় মন আশা ও আশঙ্কায় নিথর হয়ে গেল।

হরিদ্বারে ট্রেন পৌঁছল বেলা ন'টায়। ভিড় ঠেলতে ঠেলতে কখন দেখি, নিজের অজ্ঞান্তে গার্ডকে ফাঁকি দিয়ে প্ল্যাটফর্মের বাইরে এসে গেছি। ননীবাবুও এসে গেছেন আমার পেছন পেছন। দু-চারজন পাণ্ডাকে নিরস্ত করে একটা রিক্‌শা নিতে যাব এমন সময় একজন বুশশার্ট পাতলুন পরনে কালোমত মোটা মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক হাঁসফাঁস করে এগিয়ে এসে বললেন, আচ্ছা দাদা; গার্ড কি কাউকে ধরেছে দেখলেন।

হ্যাঁ, দেখলাম, নীল খদ্দরের পাঞ্জাবি পরনে এক ভদ্রলোককে ধরেছে।

ব্যাস্, নির্ঘাত তারাদাকে ধরেছে। এত করে বললাম যে—। অথচ দেখুন আমি ঠিক বেরিয়ে এসেছি! এই সমস্ত যুধিষ্ঠিরদের নিয়ে পথ চলা দায় মশাই।—ভ্রূ কুঁচকে, ফোঁস করে একটা শব্দ করে ভদ্রলোক আবার বললেন, আপনারা আমার মালগুলো একটু দেখুন, আমি চট

করে একবার দেখে আসছি ব্যাপারটা।—কোন প্রকারে কথা কয়টি শেষ করে পর্বত তো বৈশাখের মেঘ হয়ে নিরুদ্দিষ্ট হল, এখন আমরা করি কি?

কী আর করি, হতাশাভরে দুজনে দুজনের দিকে একটু হেসে যাত্রীদের গমনাগমন দেখি। মালের সল্পতা ও বিছানার উপরকার অয়েলক্লথ দেখে বোঝা গেল, যাত্রীদের অধিকাংশই কেদারযাত্রী। অধিকাংশই বাঙালী এবং তাঁদের প্রায় সবাই মধ্যবিত্ত। হিন্দুস্থানীদের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প আর তাঁদের সবাই নিম্নবিত্ত। আবার মনে প্রশ্ন জাগল, কেন? এরা সবাই কি ওই সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের সচেতন উলুখড়—কেদারবদরিকার পথে বেরিয়েছে সমাধানের আশায়? না কি এ অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ধার্মিক সাংস্কৃতিক সঙ্কট থেকে পলায়নের ব্যক্তিগত প্রয়াস? এই যে পিতামহের বয়সী বৃদ্ধ, ওই যে দিদিমার বয়সী বৃদ্ধা, ওই যে মুখে-বার্ডসাই কাঁধে-ক্যামেরা যুবক, ওই যে হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ অবয়বে প্রসাধনের দোকান যুবতী—কোন্ অস্বস্তি কোন্ আবেগ এদের তাড়িত করে এ পথে এনেছে? নাকি এ নিছক ন্যু থিয়েটার্সের চিত্রপ্রসূত ফ্যাশন? কিংবা নিছক একটু নিরাপদ অ্যাডভেঞ্চারের রোমান্স? প্রশ্নটাতে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললাম, ঠাঁই পেলাম না। কেননা আমি নিজে কেন যাচ্ছি তাই যে সঠিকরূপে জানি না।

নাঃ, তারাদাকে বের করা গেল না। সর্বদা কি আর প্রিন্সিপ্‌ল্ নিয়ে পথ চলা যায়, বলুন তো? নিন, চলুন একটা টাঙ্গা নেওয়া যাক। —ভদ্রলোক এমন ভাবে কথাগুলো বললেন যেন আমরা তাঁর বহুদিনের অনুগত শিষ্য। বহুকালের অনুগত শিষ্যেরই মত বিনাপ্রশ্নে আমরা তাঁর পিছন পিছন গিয়ে টাঙ্গায় উঠলাম।

বুঝলেন না, তারাদা এসেছেন ধর্ম করতে, তাই মিথ্যে কথা বলবেন না। আরে, গার্ডকে টিকিটটা না দেখালেই কি লোক ঠকানো হল? টিকিটটা তো পকেটের পয়সা দিয়েই কেনা। না, তিনি ধর্ম করতে এসেছেন, অতএব আচারটুকুও লঙ্ঘন করবেন না। গুলি মারো অমন ধর্মে।

সুযোগ পেয়ে এইবার আমি প্রশ্নটা করে ফেললাম, তাহলে আপনি কেন এসেছেন?

আমি ? না মশাই, শুধু ধর্ম করতে আমি আসি নি। ধর্ম যেটুকু হল হল, না-হল না-হল ; আমি এসেছি দেখতে।—রূঢ় হত তাই আর বললাম না যে, শুধু দেখতে যদি তবে তো মুসুরি ছিল, নৈনিতাল ছিল। জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টিটা তাই এবার ননীবাবুর দিকে ফেরালাম, তিনি আবার হাসলেন। তখন আর একবার নিজের অন্তরের দিকে দৃক্‌পাত করলাম, এবং দেখে নিশ্চিত হলাম যে, অন্য যে কারণেই আমি এসে থাকি, শুধু দৃশ্য দেখতে আসি নি। না না, আমাকে অনেক কিছু জানতে হবে, বুঝতে হবে, খুঁজতে হবে। যদিও কি যে জানতে হবে, আর কি যে বুঝতে হবে, আর কি যে খুঁজতে হবে তা কিছুতেই ঠাওর করতে পারলাম না। তবু এইটুকু আবারও বুঝলাম যে অনুসন্ধিৎসাটা অনির্দেশ্য হলেও অমূলক নয়।

আপনারও ধর্ম করবার উদ্দেশ্য নিশ্চয় নয়, আপনি কেন যাচ্ছেন ? —ভদ্রলোক, মানে বাগবাজারের সুশীলবাবু আমার নিশ্চুপতায় উৎকন্ঠিত হয়ে অকস্মাৎ প্রশ্ন করলেন।

দেখি, সেই কারণটুকু অন্তত জানতে পারি কিনা !

আমার বাক্যে বা চিন্তায় চোখ দুটো নিয়োজিত ছিল না। প্রথম দর্শনে অন্যান্য নগরের সঙ্গে হরিদ্বারের শুধু এইটুকু পার্থক্য চোখে পড়ল যে, কেবল হরিদ্বারের নামই হরিদ্বার। তা নয় তো পথিপার্শ্বের দোকানের সারিতে সেই যন্ত্রজাত সুলভ পণ্যের সমারোহ আর পথিমধ্যে গবাদি পশু ও টাঙ্গা রিক্‌শার ভিড়। চৌমাথার মোড়ে বহুশ্রুত শিবের মূর্তিটি দেখে মন যেন আরও বেশী নিরাশ হল। উত্তর-ভারতীয় ভাস্কর্যের পরাকাষ্ঠা শিল্পসৌকর্যহীন গ্রাম্য শিবমূর্তিটির জটা থেকে একটা ফোয়ারা বেরিয়ে আবার গঙ্গাকে ব্যঙ্গ করছে। কিছুরই অভাব নেই, এমন কি বেদীর পাশে কাচ পর্য্যন্ত বসানো আছে সারি সারি লাল, নীল, সবুজ। দেখে ভয় হল, মূলও এই প্রতিমূর্তির মত গ্রাম্য ও নির্জীব হবে না তো !

নাঃ, চোখ দিয়ে অন্তত কলকাতার কোন অঞ্চল থেকে হরিদ্বারকে আলাদা বলে চেনা যাবে না। তবে আমি যাত্রী বলেই হয়তো আমার মনে হল, হরিদ্বার অন্যান্য নগরীর মত সম্পূর্ণ স্থাবর নয়। ভুবনেশ্বর, দিল্লী, আগ্রা ইত্যাদির চেহারায় যেমন একটা স্থায়িত্ব ও প্রাচীনত্বের নির্ভুল ছাপ আছে হরিদ্বারের তা নেই। এ যেন গ্রাম্য বাজারের

সাপ্তাহিক হাট, ভিড় ঠেলে এগিয়ে যাবার সময়েও মনে হয় আর একটু পরেই সব ফাঁকা হয়ে যাবে—ক্রেতাও থাকবে না, বিক্রেতাও থাকবে না। *দশজনের মধ্যেও সেখানে পাশেই নিঃসঙ্গতা আছে।*

হরিদ্বারবাসীরাও বলেন, এ তো নগর নয়, পান্থশালা। যাত্রার মৌসুম পড়েছে, তাই যাত্রীতে গিজগিজ করছে। দোকান এখন খোলেও রোজ আর তাতে জিনিসপত্রও পাওয়া যায় কিছু কিছু। মৌসুম ফুরিয়ে গেলে আসবেন, দেখবেন অধিকাংশ দোকানেরই ঝাঁপ ওঠে নি; পথে যে দু-চার জন লোকের সঙ্গে দেখা হবে তাদের মধ্যেও পনেরো আনাই সাধু সন্ন্যাসী।

সুশীল ও ননী ষ্টেশনে তারাদার খোঁজে চলে যেতে, দ্বিপ্রাহরিক স্তব্ধতায় আমাকে ঘরের মধ্যে একলা বসে থাকতে দেখে ভোলাগিরি আশ্রমের একজন অল্পবয়স্ক নবীন সন্ন্যাসী ধীর-স্বরে হরিদ্বার-প্রসঙ্গ পেড়েছিলেন: এখন আর হরিদ্বারে দেখবেন কি? হয় মনসার পাহাড়ে উঠবেন, নয় দূর থেকে চণ্ডী পাহাড়ের ছবি নেবেন, কিংবা বড় জোর টাঙ্গা ভাড়া করে কঙ্খল অঞ্চল দেখে আসবেন। গঙ্গাকেই কি আর দেখবার উপায় আছে,—সিদ্ধি-মেশানো মালাই বরফের জালায় সে দৃশ্যও রুদ্ধ! হরিদ্বারের মাহাত্ম্য বুঝতে হলে দক্ষিণ থেকে এলে হয় না, উত্তর থেকে আসতে হয়, আর তাও শুধু তখনই যখন লোকের ভিড় থাকে না। তেমন অবস্থাতেই কেবল বুঝতে পারবেন যে, সত্যি হরিদ্বারেই গঙ্গা মর্ত্যাবরণ করেছেন। এখন তো হরিদ্বারকে দেখলে মনে হবেই যে, আমাদের সমস্ত লোকশ্রুতিই নিছক গাঁজাখুরি গল্প।

সেদিন বিকালে সবাই মিলে টাঙ্গা ভাড়া করে সরকারী পুলে গঙ্গা পেরিয়ে যখন কঙ্খলে গিয়ে উপস্থিত হলাম, এবং তারপর 'যখন টাঙ্গা-ওয়ালা এক-একবার এক-এক দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলতে থাকল: এই পুকুরে সতী শিবের সাধনা করেছিলেন; এইখানে ছিল দক্ষের প্রাসাদ, এই তার ভগ্নাংশ, যজ্ঞ করেছিলেন তিনি ওইখানে; তখন যদিও বাঙালী সাধুর সেই সাবধান-বাণী স্মরণ ছিল তবু এই সমস্তকেই নিছক গাঁজাখুরি গল্প বলে বুঝতে বিলম্ব হল না। এই পুকুরে সতী সাধনা করেছিলেন?—তবে তো তাঁর সাধনা এমন চিরস্মরণীয় হবার নয়।

আর ওই বুঝি দক্ষের ভগ্ন প্রাসাদ? কিন্তু তা হলে ওই ভগ্নাংশেই মুসলমান স্থাপত্যের ছাপ এত স্পষ্ট কেন? অথচ এর কি প্রয়োজন ছিল? দক্ষ, সতী এঁদের নামের সঙ্গে যুক্ত না হলেও স্থানটির প্রাকৃতিক মাধুর্য তো একটুও ক্ষুণ্ণ হত না; স্থানটির ঐশী রমণীয়তাও সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকত। কিন্তু কে বলবে, কেন?

কন্খল পরিভ্রমণের পর ক্লান্তমনে গঙ্গার তীরে এসে দেখি, সে-প্রসঙ্গেও সাধু আদৌ অত্যুক্তি করেন নি। বড় বেশী লোক। অত্যধিক পসরা। কেনাবেচার দৈনন্দিন জগৎ থেকে এক ইঞ্চিও দূরত্ব নেই। তবে, ঠিক তার পাশেই নিস্তরঙ্গ গঙ্গা নিকটের ডামাডোলের দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে নিঃশব্দে বয়ে চলেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন আদৌ বইছে না; যেন গঙ্গা নয়, একটি সরোবর মাত্র। কিন্তু মালাই বরফ ও আলোক-চিত্রের সাময়িক দোকানের সারি অতিক্রম করে একটু কাছাকাছি এস, আরও একটু কাছে এস, দেখবে সেই গঙ্গা সেই গঙ্গাই আছে—অদূষণীয়, অপরিবর্তনীয়, অপ্রতিরুদ্ধগতি। খরস্রোতা কিন্তু নিঃশব্দ; তরঙ্গহীন কিন্তু ঐরাবতেরও সাধ্য কি তাঁকে আটকায়! সর্ব ইন্দ্রিয় রুদ্ধ করে আর একবার দেখ, বুঝতে পারবে, গঙ্গাই ভারতবর্ষকে বাঁচিয়ে রেখেছে প্রতি ক্ষণে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বহন করে ভারতকে অমর করে, সঞ্জীব করে রেখেছে—যুগে যুগে ভারতের দেহ থেকে সঞ্চিত পাপ ও গ্লানি পরিমার্জ্জন করে দিচ্ছে। বুঝতে বিলম্ব হল না, গঙ্গা যতদিন বইবে, ভারত ততদিন বাঁচবে! অতি ক্ষীণ মৃদু মৃদু জলকল্লোল, কিন্তু মুহূর্তমধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার শ্রেষ্ঠতম অবদান মুখর সংশয়বাদ মূক হয়ে গেল, নাগরিক চাতুরি আত্মবিবরে লুকোল। এমন সজীব ঐতিহ্যের পাশে দাঁড়িয়ে আবেগ মুক্ত থাকা, আধুনিকতা বজায় রাখা শুধু অসম্ভব নয়, লজ্জাকর।

অব্যক্ত নিমগ্নতায় পারিপার্শ্বিকের কথা বিস্মৃত হয়েছিলাম; হরকী প্যারীতে শিবারতির গম্ভীর ঘণ্টা বাজতে একটা সিগারেট ধরালাম। তারাদা সপ্তোত্থিতের মত হঠাৎ বললেন, চল।—বলে বসেই রইলেন। আমি মনে মনে জিজ্ঞাসা করলাম: কোন্ দিকে? কিন্তু উঠলাম না। আমার পশ্চিমী পোষাকের বোতামগুলো একবার আরও ভাল করে এঁটে নেবার প্রয়োজন ছিল।

ঠিক এমনি সময়ে উত্তর দিক থেকে ফুলের সাজিতে প্রদীপের মত জলন্ত কর্পূরের মালা গঙ্গাবক্ষে ভেসে আসতে লাগল। রহস্যঘন অন্ধকার গঙ্গাবক্ষে দ্রুতগামী ক্ষণজীবী কর্পূরশিখা, একটার পর একটা আসছেই আসছে—একটা বিচিত্র আনন্দে মনটা ভরে গেল। একটু এগিয়েই কম্পমান শিখাগুলো নিবে যাচ্ছে, তখন আর ফুলের সাজিটিও দেখা যাচ্ছে না। ক্ষণিক নৃত্যের পর চিরতরে লুপ্তি—মানুষের জন্ম, জীবন ও মৃত্যুর সঙ্গে কোথায় যেন শিখাগুলোর অনস্বীকার্য জ্ঞাতিত্ব আছে। কিন্তু আশ্চর্য, মৃত্যুকে লুপ্তিকে এখানে একবারও ভয়াল মনে হল না। সে যেন সুন্দর জীবনের প্রশান্ত উপসংহার। সঙ্গীতের সম।

কিন্তু নিজেকে তাড়াতাড়ি স্মরণ করিয়ে দিলাম, নিজের নাম সংস্কার এবং গোত্র। আর বিলম্ব না করে' উঠে দাঁড়ালাম।

তারপর ধীরপদে হাঁটতে হাঁটতে হরকী প্যারীর দিকে গেলাম। গঙ্গার স্রোত অত্যন্ত প্রবল বলে স্নানের সুবিধার জন্য এইখানে সিমেণ্টের চাতাল মত তুলে একটা কৃত্রিম অববাহিকা সৃষ্টি করা হয়েছে। এই অববাহিকার বক্ষেই হরিদ্বারের সুবিখ্যাত শিবমন্দির। দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের অনমুরূপ এই মন্দিরগুলোতে কোন শিল্পনৈপুণ্যই নেই। মন্দিরাভ্যন্তরের বিগ্রহগুলোও লালিত্যহীন এবং গ্রাম্যদোষে দুষ্ট। বিশ্বাসীদের মনে এই সব মন্দির কোন্ আবেগের সঞ্চার করে আমি জানি না। আমার কেবল মনে হল, নেহাৎ গঙ্গা তাই রক্ষে, ডনের বক্ষে হলে ডন নদী কি আর অত ধীরে বইত!

ব্যস্ত দিনের শেষে পাঞ্জাবী হোটেলে নিরামিষ আহারের পর রাত দশটায় সবাই আবার ভোলাগিরি ধর্মশালার সাময়িক আস্তানায় ফিরে এলাম। দলে ইতিমধ্যে আমরা পাঁচজন হয়েছি। বালিগঞ্জের ননী ও বাগবাজারের সুশীলের সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে খড়দহের তারাদা—মানে তারাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ও হাওড়ার নীলমণি হাজরা। তারাদার বয়স পঁয়ত্রিশ; বর্ণ কালো; অবয়ব বৈশিষ্ট্যবর্জিত! পরনে মিলের ধুতি ও খদ্দরের নীল পাঞ্জাবি। বিশ্বাসে ধর্মকামী গোঁয়া হিন্দু। স্বভাবে এত বেশী স্পষ্টভাষী যে রূঢ়। ছলাকলা জানেন না এবং আপন অভব্যতায় গর্ব বোধ করেন। আমার মত তিনি নিজের জন্য সদা লজ্জিত বা সদা সঙ্কুচিত নন। তাঁকে দেখেই মনে হয়েছিল, এঁতে দেখবার আছে।

নীলমণি হাজরার নিবাস হাওড়ায়। হাওড়ার ধুলোবালি, কালি-ঝুলি আসবার সময় ও কিছুই যে ছেড়ে আসে নি তা ওর দুটো কথাতেই টের পাওয়া গেল। সে কথাগুলো উদ্ধৃত করলে এ লেখা অবৈধ হবে। ওর দুটোকথা শুনেই মনে হল, এ যাত্রায় ও সঙ্গী না হলেই ভাল হত। কিন্তু তার আর উপায় নেই; যাদের সঙ্গে ও রওয়ানা হয়েছিল তাদের ও হারিয়ে ফেলেছে। আসলে, আমি বুঝলাম, ও কথা মিথ্যা; আমাকে তো আমার অভিশাপ সঙ্গে নিয়েই যেতে হবে! তথাস্তু, তা-ই চলুক।

পরদিন বেলা বারোটায় বাসে হৃষিকেশের পথে রওনা হলাম। ততক্ষণে পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে দ্রৌপদী ও কুকুররূপী ধর্মও জুটে গেছে। দ্রৌপদীর পিতৃদত্ত নাম জিতরাম। গাড়োয়ালী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—আমাদের ছড়িদার—রান্নাও করবে খাবারের পরিবর্তে। কুকুরটির নাম বললো, দেশীরাম—আমাদের মাল বহন করবে।

দেরাদুন জঙ্গলের বক্ষ ভেদ করে হৃষিকেশের পিচবাঁধান পাকা সড়ক। আগের মত অধিক সংখ্যায় নয়, তবু আজকালও নাকি এ অঞ্চল যথেষ্ট শ্বাপদ-সংকুল। চলমান বাস থেকে কিন্তু দুন-জঙ্গলের ভয়ঙ্কর রূপ চোখে পড়ল না। সূর্যালোকে সে তখন হাসছে—যেন পথটিকে রমণীয় করা ছাড়া, আমাদের একটু আনন্দ দেওয়া ছাড়া আর কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নেই। যে কারণেই হোক, মনটা প্রফুল্ল ছিল; প্রত্যাশার ওজন যেন অনেক কমে গেছে; প্রাপ্তি সম্পর্কে যেন এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত। দূর থেকে হৃষিকেশ চোখে পড়ল, যেন প্রবাস জীবনে স্বদেশের স্মৃতি।

গঙ্গার তীরে হৃষিকেশ অতি ক্ষুদ্র নগর। হরিদ্বার যদি পুরোপুরি স্থাবর নয়, তবে হৃষিকেশ সম্পূর্ণ জঙ্গম। প্রতিদিন সকালে ও বৈকালে এখানকার জনসংখ্যা সহস্র ও শতকের ঘরে ওঠানামা করে। এখানে বাড়ি মানেই ধর্মশালা। পথিক মানেই যাত্রী। দোকানদারদের ভরসাও ওই এক যাত্রী। অতি প্রত্যুষে দেবপ্রয়াগের বাস ছেড়ে যেতে জনশূন্য হৃষিকেশ খাঁ-খাঁ করতে থাকে। দোকানদার তখন মাছি তাড়ায়। তারপর যেই হরিদ্বার থেকে আবার বাস এসে হাজির হয় অমনি হৃষিকেশ গমগম হয়ে ওঠে। দোকানদার তখন মাছিই বিক্রি করে। হৃষিকেশে পৌঁছে আমাদের দল ত্রিধাবিভক্ত হয়ে আশ্রয়ের খোঁজে তিন দিকে

বেরিয়ে পড়েছিল। মাল তদ্বিরের অজুহাতে বাস-ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আমি ইতিমধ্যে শহরটাকে দেখে ও নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। শেষোক্ত কাজটার অবশ্য প্রয়োজন ছিল।

কেন না, আমরা যারা কলকাতার কূপবাসী, এবং বাঙালী বলে কল্পনাবিলাসী, হরিদ্বার হৃষিকেশ ইত্যাদি পৌরাণিক স্থানগুলো আমাদের মনে একটা বিচিত্র গৌরবময় কাল্পনিক আসনে অধিষ্ঠিত। স্থানগুলোর নাম শুনলেই মনটা আবেগে মূর্ছা যায়, স্বচ্ছ দৃষ্টি লোপ পায়। মনে হয় স্থানগুলো ইহলোকে নয়, এই স্থানের অধিবাসীরা নিশ্চয়ই আমাদের মত রোজ স্নান করতে এবং ভাত খেতে অভ্যস্ত নয়। পথিপার্শ্বের গাছে সেখানে অজস্র ফল ফলে আছে। পয়সা কাকে বলে তা নিশ্চয়ই সেখানে কেউ জানে না। সে যে হৃষিকেশ, সে যে হরিদ্বার! অথচ সরজমিনে আজ এ কী দেখছি!—রাস্তায় মোটর টায়ারের দাগ, মোরে সোকোনির পরিচিত উড়ন্ত ঘোড়া, প্রতিমুহূর্তে হোটেলের দালাল ও মুটে এসে বিরক্ত করছে। এই কি সেই হৃষিকেশ?—পশ্চিম যে একেও দশ-আনা ছ-আনায় নামিয়ে এনেছে! আমি তাড়াতাড়ি কোটের বোতামগুলো খুলতে লাগলাম।

এমন সময় বিভিন্ন দিক থেকে আশ্রয়ান্বেষী ভগ্নদূতেরা ফিরে আসতে লাগল। তিল ধারণের স্থান নেই কোথাও; সবাইয়ের বিমর্ষ বদন।

চলুন। 'স্থান করি লব কোন মতে এক পাশে'। সর্বশেষে এসে নীলমণি কুলিদের মাথায় মোট চাপিয়ে আগে আগে চলতে লাগল। অচিরেই পাঞ্জাব সিন্ধুক্ষেত্র ধর্মশালায় এসে পৌছুলাম। ব্যারাকরূপী বিরাট ধর্মশালা। অন্দরে স্থান না পেয়ে অনেক যাত্রী বারান্দায় শয্যা বিছিয়েছে। দেখলাম, অনেক ধনী পরিবারও দরিদ্রের সঙ্গে স্থান ভাগ করে নিয়েছে। ধর্মশালার চৌধুরী আমাদের একটা ছোট্ট কুঠরি দিল, দেড়তলায়। বিস্ময়ে নীলমণির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ফেলতে ও নীরবে শুধু একটা চোখ বুজল। চাবিটি থাকলে যে-কোন দরজাই যে এক লহমায় খোলে তা জানতাম; কিন্তু সেই চাবি যে এইখানেও সমান কার্যকরী তা জানা ছিল না। জানবার পরে সামান্য বিব্রত হলাম বটে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী আশ্বস্ত হলাম।

দ্বিপ্রাহরিক ভোজন সেদিন আমরা হরিদ্বার থেকেই সেরে

এসেছিলাম। আশ্রয়ের বন্দোবস্ত হতে আমরা তাই তখন জিতরামকে রেখে ছুটলাম লছমনঝুলা দেখতে। দূরত্ব এখান থেকে মাত্র তিন মাইল; বাসভাড়া তিন আনা। গঙ্গার তীর ধরে পথ।

লছমনঝুলায় সংস্কারবশত সন্তর্পণে বাস থেকে নামলাম। পাছে সুর কেটে যায়, তাল ভেঙ্গে যায়, ধ্যান ব্যাহত হয়। বাসের কর্কশ আর্তনাদটা থামতেই গঙ্গার উপলব্যথিত কলস্বর কানে এল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপর পারের স্বর্গাশ্রম ও মন্দিরাদি চোখে পড়ে। নীলকণ্ঠ পাহাড়ের নীচে আশ্চর্য শান্ত গম্ভীর পরিবেশ—পটভূমিতে গঙ্গার অবিরত কলনাদ—স্বর্গাশ্রমের প্রশস্ত স্থানই বটে। বাস্তব জগৎ এতক্ষণে কল্পলোকের কাঁধে কাঁধ মেলাল; এ যে এমন তা কস্মিনকালে কল্পনাও করতে পারি নি। এ ঠিক পটে আঁকা ছবি নয়, তার চেয়েও সুন্দর—এ যেন ভারতাত্মা, এ যেন আমাদের শিরা-উপশিরায় মূর্তিমান ঐতিহ্য। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, এমন প্রচণ্ড সৌন্দর্য গ্রহণ করবার ক্ষমতা আছে কি না ভাবতে গিয়ে মুহূর্তের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলাম।

সামনেই লছমনঝুলার দিকে উতরাই পথ নেমে গেছে। উতরাই যে উতরাই তা তখনও পর্যন্ত কারও জানা ছিল না, অতএব ননী, নীলমণি ও সুশীল তিনজনে হাসতে হাসতে গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছিল। নামতে নামতে পিছন থেকে লক্ষ্য করলাম তিনজনেরই চলার ভঙ্গীতে কেমন যেন একটু গর্ববোধ। আমিও অনুভব করছিলাম যে, আমার জন্মসাথী হীনমন্যতা ও অপরাধবোধটা যেন একটু পিছিয়ে পড়েছে। একটু নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল নিজেকে, কিন্তু সব শূন্যতা পূর্ণ করে দিয়েছিল হিমালয়ের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। স্পষ্ট মনে আছে ওই দিন ওই ক্ষণে সমুন্নত মস্তকে আমি এগিয়ে যাচ্ছিলাম; স্পষ্ট মনে আছে পশ্চিমের তুলনায় সেদিন নিজেকে একটুও দরিদ্র মনে হয় নি। অভিনব অনুভূতি!

ডানদিকে লক্ষ্মণজীর মন্দির ছেড়ে কয়েক পা নেমে এলে সামনেই সামান্য একটু সমতলভূমি। সেখানে দাঁড়িয়ে গঙ্গার যে রূপ চোখে পড়ল তার সঙ্গে তুলনীয় কিছু আছে বলে স্মরণ হল না। জল এখানে এতই অগভীর যে তলার চকচকে নুড়িগুলো স্পষ্ট দেখা যায়; তাদের ঘর্ষণে ক্রমাগত ফেনা উঠছে; গঙ্গাবক্ষ এইখানে দুগ্ধ-ফেননিভ। গঙ্গা নৃত্যচটুল লাস্যময়ী—হাস্যের তার অন্ত নেই। এবং হাসিটা ভয়ানক

ছোঁয়াচে, দেখতে দেখতে দর্শকের মনও আনন্দে শুদ্ধ হয়ে যায়,—অবশ্য পাশে যদি তারাদা না থাকে তবেই। আমার দুর্ভাগ্য, মিনিটখানেক দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই তারাদা হঠাৎ পেছন থেকে মুখ বাড়িয়ে বললেন : এখনও শিবের বক্ষলগ্না কিনা তাই অত হাসি, অত উচ্ছলতা। তারপরই তদ্গত হয়ে যোগ করলেন : ঈশ্বর; তোমার মহিমার অন্ত নেই, তোমার মহিমায়ই তা বুঝছি।

হুঁ।—মুহূর্তমধ্যে দেবলোক থেকে যেন মর্ত্যলোকে আছাড় খেয়ে পড়লাম। কতকগুলো ভাবের কথা যে শুধু ভাবতে হয়, বলতে নেই ; বললে যে সেগুলোর সৌন্দর্য ক্ষুন্ন হয়, প্রশান্তি নষ্ট হয়, ঐশীভাব কলুষিত হয়ে যায়—আতিশয্যের বশে তারাদা সেই সত্যটা প্রতিমুহূর্তে বিস্মৃত হন। তাঁর বিস্মৃতির ফল আমাতে বর্তাতে ভয়ানক রাগ হল, এবং আমি যে তক্ষুনি ধাক্কা মেরে পত্রপাঠ ওঁর সদ্গতি করি নি তার একমাত্র কারণ আমার দৈহিক কৃশতা! মনের ক্ষোভ মনে চেপে তৎক্ষণাৎ আবার নামতে শুরু করলাম। একটু নামতেই সামনে বহুখ্যাত, বহুশ্রুত ও ততোধিক প্রত্যাশিত লছমনঝুলা আকাশে নাক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ দর্শনে কিঞ্চিত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম। এই কি লছমনঝুলা—এ যে একটা নিছক এঞ্জিনীয়ারিং ঔদ্ধত্য! আমাদের লেকের পুলের দোসর! শূন্যে দুটো পা তুলে হিমালয়কে যেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছে। বাল্যের পাঠ্যপুস্তকে কি এই পুল অতিক্রমণের ভয়াবহতার কথা পড়েই দেহ রোমাঞ্চিত হয়েছিল? এর পরে মহাপ্রস্থানের পথের মাহাত্ম্য আর রইল কোথায়! যন্ত্র সভ্যতার কুৎসিত ঔদ্ধত্যে নিজেকে অপরাধী মনে হল। যন্ত্র-সভ্যতা দূরকে নিকট করেছে সত্য, কিন্তু পরকে যে ভাই করে নি তার প্রমাণ গত দুটো যুদ্ধেই জেনেছিলাম, এখন জানলাম যে অতি-নিকটকেও সে ধরাছোঁয়ার বাইরে নির্বাসন দিয়েছে।

গঙ্গার কলরোল ততক্ষণে আমার কানে আর্তনাদ হয়ে বাজছে ; পারিপার্শ্বিক সমস্ত কিছু সৌন্দর্যবিরহিত। কিন্তু তবু এই নতুন দ্বিতীয় জগৎটা না হয় আমার আয়ত্তের বাইরেই রইল, আমাকে আবার পুরানো সেই জগতে ফিরে তো মুখ দেখাতেই হবে। অতএব টুরিস্টদের মত যান্ত্রিক দৃষ্টিতে সব কিছু শুধু দেখে নিতে লাগলাম। দেখতে দেখতে ঝুলা অতিক্রম করে গঙ্গার অপর পারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মন্দির বা

বিগ্রহ দেখবার উৎসাহ তখন আর বিশেষ ছিল না। অতএব চায়ের দোকানে বসে এক গ্লাস চায়ের নির্দেশ দিলাম।

কই গো মাসি, তাড়াতাড়ি আহ, আমরা আউগাইলাম।—রাস্তার পাশে পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে একদল যাত্রী বিশ্রাম করছিল। প্রথমটায় আমরা শুধু ওদের দেখেই ছিলাম; নির্বিশেষ একদল যাত্রী, কেবল ভারতীয়, তদতিরিক্ত কোন ভৌগোলিক ছাপ নেই কা'রো মধ্যে। এখন ওদের মুখে বাংলা কথা শুনে তারাদা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলেন: আপনারা বুঝি বাঙালী?

আইজ্ঞা হ।

কতদুর যাবেন?

যাওনের ইচ্ছা তো সর্বত্রই; দেখি কোনান পর্যন্ত যাইতাম পারি!

কালীকমলীওয়ালা থেকে তো চারধামের টিকিটই পেয়েছি; এখন দেখি কতদূর শরীরে দেয়।—পূর্ববঙ্গীয়া থামতে, যাত্রীদলের বয়জ্যেষ্ঠ যাত্রীটি এগিয়ে এলেন। বয়স তাঁর আশী যদি পেরিয়েও না থাকে, তবে তার কাছাকাছি নিশ্চয়ই এসেছে। তারাদা আবার জিজ্ঞেস করলেন: আপনারা কোথা থেকে আসছেন?

বৃন্দাবন।

পুরোটা পথ পায়ে হেঁটে?

আইজ্ঞা হ। পয়সা পামু কনে র‍্যালগাড়িতে উঠুম।

যাবেন কোথায়?

ওই যে বললাম, চারধামের টিকেট আছে!

পায়ে হেঁটে?

যাত্রীদলের সবাই সমস্বরে শুধু দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। তারাদা তখন বিশেষ করে বুড়োর দিকে চেয়ে বললেন, আপনার দেশ কোথায়?

আজ্ঞে, মেদিনীপুর।

দেশে কেউ নেই? ছেলেপুলে, নাতি নাতনী বা বউ, কেউ—

আজ্ঞে, আছে বইকি। সব আছে, বলাইয়ের বউ তো এই সেদিন মোটে একটা ছেলে বিয়োল। কিন্তু কী করব বলুন, দেশে পর পর তিন বছর অজন্মা—ক্ষেতে নেই শস্য, গোলায় নেই ধান। তাই ভাবলাম

একবার দেখি জিজ্ঞেস্ করে: কি পাপে আমার এই শাস্তি! কথা কয়টি বলে বুড়ো আকাশের দিকে চেয়ে হু-হু করে কাঁদতে লাগল: বিষয় আশয় ছেড়ে তাই এবার ভগবানকেই ধরলাম। দেখি উনি যদি রাখেন। কাঁদতে কাঁদতে বুড়ো বার বার কার উদ্দেশ্যে যেন প্রণাম নিবেদন করতে লাগল।

ঠিক এতটা বোধ হয় তারাদা আশঙ্কা করতে পারেন নি,—আমিও উদ্‌গ্রীব না হয়ে পারলাম না এবার। তারাদার জিজ্ঞাসার উত্তরে এইবার পূর্বোক্ত পূর্ববঙ্গীয়া বললেন, আর জিগান ক্যান? ঘর থাকলে কি আর কেউ ঘর ছাড়ে! একটা পোলা আছিল হেইটারে মুসলমানরা মারল, একটা ঘর আছিল হেইটারে পোড়াইল—তখনে আর করি কি, এইখানে তো তবু ধর্মশালা আছে, মাঝে মাঝে কেউ দুই-চারটা পয়সাও দেয়। ঘরে কেউ ত্থাখনের আছিল না, এইখানে তবু ভগমান আছেন।

এইবার আমাকে আলস্য ত্যাগ করে উঠতে হল: কিন্তু পায়ে জুতো নেই, এতটা পথ হাঁটবেন কী করে? পা যে এর মধ্যেই ফেটে গেছে!

আমার কথা শুনে অবিশ্বস্ত চোখে মহিলা একবার নিজের পায়ের দিকে তাকালেন—ভাবখানা, ফেটে গেছে, তাই নাকি! বললেন, সবঐ হ্যার ইচ্ছা, জুতার দরকার থাকলেও হ্যায়ঐ দিব।

ইতিমধ্যে অন্যতরা মহিলা তারাদার কাছে আত্মপরিচয় দিচ্ছিলেন: ইনি আমার স্বামী, চোখে দেখতে পান না, অন্ধ। স্বামীর যষ্টির অগ্রভাগ মহিলার হাতে; এবং তাঁর কাঁধে দুই বছরের একটি শিশু। অন্ধের পাও জুতোহীন এবং ক্ষত-বিক্ষত। তারাদার প্রস্তাবমত আমাদের সবার কাছ থেকে একটি করে টাকা সংগ্রহের পর ওঁদের দুজনাকে জুতো কিনতে দেওয়া হল। আশীর্বাদ করতে করতে ওঁরা আবার ওঁদের পথ ধরলেন; দেখলাম ওঁদের পথ সামনে প্রসারিত। সরল এবং ঋজু।

কিন্তু ওঁরা আমাকে বিস্ময়ে একেবারে থ করে দিয়ে গেলেন। ঈশ্বরের হাতে এমন অকাতর আত্মসমর্পণ যে আজও সম্ভব তা কিছুতেই বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না। আমাদের কাছে ঈশ্বর বড়জোর মৃত একটি আদর্শ, কিম্বা তত্ত্বগত প্রস্তাব মাত্র—প্রাচীন সাহিত্য বা ইতিহাসের ব্যাখ্যার প্রয়োজন ব্যতিরেকে আমরা কদাচিৎ তাঁর নাম মুখে আনি। অথচ আমাদের ঠিক পাশেই তাঁতে শুধু যে বিশ্বাস করা হচ্ছে তাই নয়,

অবলম্বন করা হচ্ছে; তাঁর হাতে আত্মসমর্পণ করা হচ্ছে এবং তা বর্তমান মুহূর্তেই! এই সত্য এর পরে আর অস্বীকার করতে পারব না, কিন্তু উপলব্ধি করতে পারব কি কোন কালে?

যাত্রীদল তখন আমাদের নিকট থেকে বেশ কিছু দূর এগিয়ে গেছে; কিন্তু সেই দূরত্ব কিছু নয়, তখনও বোধ হয় ডাকলে শুনতে পেত। আমি ভাবছিলাম আমাদের সাংস্কৃতিক দূরত্বের কথা, বোধের দূরত্বের কথা, বিশ্বাসের দূরত্বের কথা। ট্রেনের লাইন যতদূর বিস্তৃত হোক, কমেটের গতি যতগুণই বর্ধিত হোক—সে দূরত্ব কোনদিনই আর ঘুচবার নয়, ঘুচবার হলে আজ অন্তত মুহূর্তের জন্য ওদের, আমার দেশবাসীদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে পারতাম। কিন্তু আমার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল—ওঁরা আরও দূরে চলে যেতে লাগলেন। এই ব্যক্তিবিভাগের পাশে দেশবিভাগ ইংরেজ রাজত্বের নগণ্য ক্ষতি।

জন্মান্তরের পাপে, ওই দুয়ারটুকু পেরিয়ে যাত্রীদলের জীবনে প্রবেশ করতে পারলাম না বটে; কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করলাম যে অনতিক্রম্য সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ওঁদের আশীর্বাদ আমাকে আমার গ্লানির কথা ভুলিয়ে দিল। সত্যিই তো, তেমন পাপ করবার আমার ক্ষমতা কোথায় যে, ওঁদের আশীর্বাদ আমায় ছুঁতে পারবে না! এইবার আবার দেখলাম, হিমালয় থমকে দাঁড়ায় নি; দাঁড়িয়েছে আপন ঐশ্বর্যে, গৌরবে, নিশ্চয়তায়। শুনলাম, গঙ্গা আর প্রলাপ বকছে না, ছন্দে সুরে আত্মহারা হয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করছে। বুঝলাম, লছমনঝুলা ঔদ্ধত্যে যতই মাথা তুলে দাঁড়াক, হিমালয়ের পাশে সে বামনমাত্র।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনীভূত হয়ে আসছিল। অপরপারে লক্ষ্মণজীর মন্দিরের সুউচ্চ চূড়া অস্তগামী সূর্যের আভায় চকচক করছে। ঝুলা পেরিয়ে সামান্য একটু চড়াই ভেঙ্গে আমরা মন্দির দেখতে গেলাম। অন্য সব মন্দিরের ন্যায় এই মন্দিরটিও প্রায় বৈশিষ্ট্যহীন। দক্ষিণী সূক্ষ্মতা, পূর্বী লালিত্য বা উত্তর-ভারতীয় ঐশ্বর্য—মন্দিরগাত্রে কোন কিছুরই বালাই নেই। নেহাত সাদাসিধে—সরল ও সহজ। কিন্তু মনে হল, বন্যেরা যেমন বনে সুন্দর, হিমালয়ের পাশে তেমনি এই-ই বেশ মানানসই। এখানেও যদি মানুষ তার গুণপনা ও শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শনের আয়োজন করত তবে তা বড়ই হাস্যকর হ'ত। মন্দিরের অভ্যন্তরেও পাণ্ডার বা যাত্রীর

বাহুল্য নেই! একজন পূজারী শুধু নিঃসঙ্গ বসে ছিল। যেদিকে চাই, সব কিছুর মধ্যেই কেমন যেন একটা অনির্দেশ্য ধ্যানমগ্নতা। অবিশ্বাস্য কিন্তু অত্যন্ত সংক্রামক।

একে একে সবাই বিগ্রহ দেখে এল; অগত্যা আমিও গেলাম। কিন্তু, আমার কপাল পোড়া, যেই মন্দিরে ঢুকতে যাব অমনি মাথাটা দরজায় ঠুকে গেল। বাঁধা পেতে উপর দিকে চেয়ে দেখি, নিচু দরজার ঠিক মাঝখানটাতে অ্যানাসিনের একটি শূন্য প্যাকেট সযত্নে সেঁটে দেওয়া। কোন্ ভক্ত যে ভক্তিভরে এহেন স্মারক এমন জায়গায় লাগিয়েছে তা বুঝতে পারলাম না, তবে বিগ্রহ আমার আর দেখা হল না। এক ঠোকরে আমার আত্মসচেতনতা ফিরে এল। সেই সকাল থেকে সযত্নে সন্তর্পণে যে একটা ভাবজগৎ গড়ে তুলছিলাম মুহূর্তমধ্যে তা সম্পূর্ণ চুপসে গেল। ওই মন্দিরেরই চত্বরে বসে তখন ভাবতে লাগলাম: আশ্চর্য! আমার আজকের দিনটা আশ্চর্য একটা দিন। ব্যস্ততম দিন। সেই সকাল থেকে কত কথা মনে এল, কত ভাব হৃদয়ে জাগল, কোনটা তার অপরিচিত কোন-কোনটা বা পরস্পরবিরোধী। এক হিমালয়, এক গঙ্গাকেই কতবার ভাল লাগল, কতবার খারাপ লাগল। কতবার মনে হল, হিন্দুধর্মের মত ধর্ম নেই, হিন্দু বলে আমার গর্ব বোধ করা উচিত; অথচ ঠিক তার পর-মুহূর্তেই প্রতিবার মনে হল হিন্দুধর্ম তো কাঙাল-ধর্ম, নয় তো এমন ভাবে অপ্রয়োজনে পাশ্চাত্ত্যের দুয়ারে হাত পাতে! এক গঙ্গার কলনাদকেই কখনও মনে হল আর্তনাদ, আবার কখনও মনে হল মন্ত্রোচ্চারণ। আশ্চর্য নয়! এর আগে আর কোন দিন এমন ব্যস্ততায় অতিবাহিত করেছি বলে স্মরণ হল না। তবে কি গুহার আঁধারে আজ প্রভাত-পাখীর গান পশেছে? ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে বুঝলাম যে আমার প্রস্তরীভূত মনের দুয়ারে আজ কে যেন আঘাতের পর আঘাত করেই চলেছে! সে কি হিমালয় না আমারই আহত কৃত্রিমতা ঠিক চিনে উঠতে পারছিলাম না; তবে স্মরণ আছে সেই সন্ধ্যায় অন্তত এঁদের কোনটির প্রতিই আমি তেমন কৃতজ্ঞ বোধ করি নি। একটা একাগ্র প্রতিজ্ঞাবোধ ছাড়া সেদিন আমার মনে অন্য কোন বিশুদ্ধ ভাবই ছিল না।

ফেরবার সময় আর বাস পাওয়া গেল না বলে সেদিন আমাদের

হৃষিকেশে পৌছতে রাত সাড়ে আটটা বাজল। মনে আছে, সেদিন হেঁটে ফেরবার পথে পথিপার্শ্বের প্রতিটি ঝরণা—শুষ্ক ও প্রবহমান—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছিলাম প্রতিটির জল স্পর্শ করে। পথের কোন নুড়িকেই সেদিন উপেক্ষা করবার মত নগণ্য মনে হয় নি। প্রতিটি বৃক্ষের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে দেখেছি, কিন্তু কী দেখেছি বা খুঁজেছি তা সেদিনও জানি নি, আজও জানি নে।

হয়তো সবই নিছক ছেলেমানুষী বাতুলতা, হয়তো অন্যতর কিছু!

বাস রিজার্ভেশন ও নৈশাহার সেরে সেদিন অবশেষে যখন আবার ধর্মশালায় ফিরলাম রাত তখন দশটা। যাত্রীদের অধিকাংশই নিদ্রামগ্ন—কেউ কেউ রান্না শেষে আহারে ব্যস্ত। কথাবার্তা শুনে মন হলে, আমাদের পাশের কুঠুরিতে কোন অবাঙালী পরিবার আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু আমাদের নীলমণিও সেদিন বড় ক্লান্ত ছিল, অতএব প্রতিবেশীর পরিচয় অজ্ঞাতই রয়ে গেল। অচিরেই অন্যান্যের নাসিকা গর্জ্জন কানে এল। পাশের ঘরের কলরোলও স্তব্ধ হল। কিন্তু কী যেন একটা বিষয়ে কোন একটা সিদ্ধান্তে না পৌছানো পর্যন্ত আমার ঘুম আসছিল না কিছুতেই। একটু পরে পাশের ঘর থেকে একটা সুর ভেসে এল, কে যেন রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইছে। পাশের ঘরে রবীন্দ্র-সঙ্গীত! কিন্তু তখন আর গবেষণার উৎসাহ ছিল না। গান শুনতে শুনতে নিদ্রায় আস্তে আস্তে আমার চোখ দুটো থেকে জিজ্ঞাসা চিহ্নগুলো মুছে গেল। প্রতীক্ষাক্লান্ত মন আবেশে ঢলে পড়ল।

দুই

প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের অ-নাগরিক অভ্যাস আমার কোন কালে ছিল না। কিন্তু সকালে উঠেই দেবপ্রয়াগ রওয়ানা হতে হবে—পূর্বদিন এই কথা ভেবে শুয়েছিলাম, সম্ভবত সেই কারণেই পরদিন আমার যখন ঘুম ভাঙল তখন রাত সাড়ে তিনটে। নকল সূর্যের আভায় হৃষিকেশ ইতিমধ্যেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ধর্মশালায়ও তখন আর কেউ ঘুমিয়ে নেই। যাত্রীদের কলস্বরে ধর্মশালা মুখরিত। কেউ বিছানা গুছচ্ছে, কেউ প্রাতঃকৃত্যের পর সশব্দে হস্তমুখ প্রক্ষালন করছে, কেউ কাঁধে কম্বল বেঁধে নিচ্ছে, কেউ বা হাতে লাঠি নিয়ে 'জয় বদরিনাথ' বলে পথে বেরিয়ে পড়ছে। কার সাধ্য তখন অলস হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে! আমরাও উঠে পড়লাম, এবং তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র বেঁধে কুলির মাথায় তুলে দিয়ে যখন বেরিয়ে আসছি তখন দেখি, লোকারণ্য ধর্মশালা এর মধ্যেই শ্মশানের মত খাঁ-খাঁ করছে।

সমবেতভাবে কিছু একটা করার যে রোমাঞ্চ, আমরা বাঙালী নাগরিক মধ্যবিত্তরা তার সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত। নিঃসঙ্গতায় আমরা শুধু জন্মি ও মরি না বাঁচিও। আমরা সব বিষয়েই স্বার্থপর। আমাদের প্রমোদ চিত্রগৃহের অন্ধকার নিঃসঙ্গতায়; আমাদের রাজনীতিও ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদ। আমাদের ফ্ল্যাট বাড়ির সিঁড়িতে ঝাঁট পড়ে না, আমাদের সঙ্গীত 'একলা চল রে'! জীবনের এই বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিকে আমি অবিমিশ্র মন্দ বলি না, কিন্তু এর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গিতেও যে প্রশংসনীয় কিছু থাকতে পারে তা সেদিন ধর্মশালার বাইরে পা দিয়েই স্পষ্ট অনুভব করলাম। হৃষিকেশের পথে তখন যাত্রীর অন্ত ছিল না;

সবাই ত্রস্ত; দোকানদারেরা হিমসিম খাচ্ছে। যেই মনে পড়ল যে এরা সবাই সহযাত্রী, তখন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম আমার মনের চতুর্দিকের দেওয়ালগুলো চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ছে—বাইরের জোয়ারে আমার মন উছলে উঠছে। সেই থেকে আর আমি বলে কেউ রইল না; সব আমরা। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার অন্যতম পুরস্কার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সেই মুহূর্তে কোথায় যেন উবে গেল।

এই যে বিষয়টার কথা বললাম, সেইটা বড় সহজে বলা গেল। কিন্তু কাজটা অত সহজে সাধিত হয় নি। যদিও এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, এই স্বার্থপরতা, এই মানসিক কাঠিন্যের প্রতি কোন কালেই আমার কণামাত্র মোহ ছিল না, তবু এইগুলো থেকে বিচ্যুত হতে সেদিন একটা নির্বোধ ভয়ে কণ্টকিত হয়ে উঠেছিলাম। অস্ত্রোপচারিত অবশ অঙ্গটির প্রতি মনুষ্যমাত্রেরই যে একটা অযৌক্তিক করুণা আছে, সেদিন সেইটে জয় করতে আমার সময় লেগেছিল, কষ্টও হয়েছিল।

কিন্তু আমার বরাত ভাল, কষ্টটাকে রয়ে-সয়ে ভোগ করবার মত অবকাশ তখন ছিল না। জোয়ারের ধাক্কায় মিনিট তিনেকের মধ্যে বাস-স্ট্যাণ্ডে পৌঁছে দেখি, সেখানেও প্রচণ্ড ভিড়। প্রচণ্ডতর কোলাহল। নীলমণির তৎপরতায় আবার সবার আগে আমাদের টিকিট কেনা হয়ে গেল। মালপত্র বাসের মাথায় চাপিয়ে তৎক্ষণাৎ বাসে উঠে পড়লাম। আপন আসনে বসে ড্রাইভার ষ্টিয়ারিঙে দুবার মাথা ঠুকল। 'জয় বাবা কেদারনাথ,' 'জয় বদরিবিশাললাল' ধ্বনির মধ্যে মুহূর্তকাল পরেই বাস ছেড়ে দিল। একটি দুঃসহ ও রোমাঞ্চকর অধীরতায় আমি তখন থরথর করে কাঁপছি। এর আগে বিশেষ একজনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটি ছাড়া আর কোনদিন এমন অধিরতা বোধ করি নি। সকাল থেকে সব কিছু যেন এক লহমায় ঘটে গেল! চোখের নিমেষে!

অথচ অন্য সবাই নির্বিকার। পিছনের হিন্দুস্থানী মহিলারা আবক্ষ ঘোমটায় আবৃত করে সমস্বরে গান ধরেছেন, তাঁদের কর্তারা বাসের টিকিট ও টাকার হিসেব মিলাতে ব্যস্ত। কেউ সিগারেট ধরাচ্ছেন, কেউ গাঁজার কল্কে সাজাচ্ছেন, আবার কেউ আপন মনে বিড়ি টানছেন ও গুনগুন গাইছেন। আমাদের তারাদা অভ্যস্ত ভাববিলাসিতায় বার বার বলছেন, আমাদের যাত্রা হল শুরু—আমাদের যাত্রা হল শুরু।

সুশীল এক টিপ নস্যি নিয়ে নোংরা রুমালে নাসিকা প্রসাধনে ব্যস্ত। ননী একবার এর হাতের ঘড়ি, আর একবার ওর হাতের ঘড়ি দেখে ডাইরিতে টুক করে কী যেন লিখে নিল। আমাদের নীলমণিও একটা সিগারেট ধরিয়ে যে ভদ্রলোক ওর পাশে মূর্তিবৎ বসে উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপের সুযোগ পেল।

মশায়ও কি কেদারবদরিকা যাচ্ছেন ?

কিন্তু ভদ্রলোক বোধ হয় প্রথমবার শুনতে পেলেন না। নীলমণি ভদ্রলোকের কানের আরও কাছে মুখটা এনে প্রশ্নটার পুনরুক্তি করল। ভদ্রলোক এইবার চমকে উঠে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

একাই যাচ্ছেন ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভদ্রলোক আবার বাইরের দিকে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি ফিরালেন। হতাশ হয়ে নীলমণি এবার আপন মনে সিগারেট টানতে লাগল। কিন্তু ভদ্রলোকের স্বল্পভাষিতা ও উদ্‌ভ্রান্তির অন্তরালে একটা বিষাদের ছায়া অব্যক্ত বেদনায় ছল ছল করতে থাকল।

খানিকটা পথ এঁকেবেঁকে এগিয়ে অবশেষে হৃষিকেশের আউটপোস্টে এসে বাস থামল। যাত্রীদের সবাই কলেরা বসন্তের টিকা নিয়েছে কিনা এইখানে তাই পরীক্ষা করা হয়। বাস থামতে ডাক্তারের মুখ দেখা যেতেই যাত্রীদের মধ্যে কান্নাকাটির রোল পড়ে গেল। টিকা ইন্‌জেকশনের ব্যাপারে এখানে সমতলের চাইতেও বেশী আতঙ্ক। অনেক ভেবে-চিন্তে একজন বাঙালী যুবক তো ওইখান থেকেই পিছন ফিরলেন। একজন হিন্দুস্থানী সাধু ডাক্তারের প্রস্তাব শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে চেঁচিয়ে বলল—এখানে আমরা শিউজীর ভরসায় এসেছি ; টিকা নেব আবার কী জন্যে ? আমি তখন সাধুকে বুঝিয়ে বললাম, শিউজীর ভরোসায় যদি টিকা না নিতে পার তো তাঁর ভরোসায় একটা টিকা নিতে পারবে না ? মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে সাধুজী আমার প্রস্তাবটা বিবেচনা করল, তারপর সুড়সুড় করে নেমে গেল টিকা নিতে।

আমাদের সেই উদ্‌ভ্রান্ত বাঙালী ভদ্রলোকেরও টিকা-সংক্রান্ত কাগজপত্র ঠিক ছিল না। তিনি নীরবে নেমে নিঃশব্দে টিকা নিয়ে আবার আপন নিঃসঙ্গতায় নিথর হয়ে বসলেন।

আবার বাস ছাড়ল। মুনীকি রেতী ও লছমনঝুলা অতিক্রম করে বাস এখন গঙ্গার তীর ধরে এগিয়ে চলেছে। ছোট সঙ্কীর্ণ একমুখো বাস-পথ। পথের ধারে কোন প্রকার রেলিং নেই; পথের পাশেই অতল গভীর খাদ। বাসের বাইরের দিকের চাকা তিনটা অনর্গল পথ দিয়েই চলেছে, না কি মাঝে মাঝে শূন্য দিয়েও বিচরণ করছে হঠাৎ তা বোঝা যায় না। প্রতি পরমুহূর্তেই বিস্ময় হয়, পূর্বমুহূর্তে বাসটা পড়ল না তো! সামনের দিকে চাইলে সামান্য দু' হাত পথ চোখে পড়ে। তারপর পথটা কি শুধু উৎরাই নেমেছে, না কি বাঁয়ে ঘুরেছে, আর ঘুরে থাকলে কত ডিগ্রী কোণে ঘুরেছে তা অনুমান করবার কোন উপায় নেই। তখন একমাত্র উটপাখীর অনুসরণে চোখ মুদে পলায়ন করা ছাড়া যাত্রীর নাস্তি গতিরন্যথা। অথচ চোখ বুজলেই ডান দিকের খাদটা দ্বিগুণ গভীর হয়ে মনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে; যাত্রীর অসহায়তা দ্বিগুণ হয় তখন! মনে হয়, যদি একান্তই পড়ি তবে তো চোখ বুজে থাকলে, বাসের হাতল বা সীটের পিছন ওই ধরনের কিছু ধরেও বাঁচবার চেষ্টা করতে পারব না! না, এতে হাসির কিছু নেই, যাত্রীও তো আসলে মানুষই। ওই পার্বত্য পথে অজ্ঞাত-কুলশীল অপর একজনের হাতে সম্পূর্ণরূপে জীবন সমর্পণ করে নিপুণতম ট্রাপিজ খেলোয়াড়ের পক্ষেও নির্বিকার থাকা সম্ভব নয়। অচিরেই তাই পশ্চাতে হিন্দুস্থানী রমণীদের সমবেত সঙ্গীতস্বর দ্রুত সপ্তমে উঠে গেল। গঞ্জিকাসেবী অধিকতর নিবিষ্টতার সঙ্গে কল্কেতে মন দিলেন; বাবা বদরিনাথের নামোচ্চারণে যাত্রীসাধারণের উৎসাহ অত্যধিক পরিমাণ বেড়ে গেল; আমাদের ননীবাবু সামনের আসনের হেলান দেবার জায়গাটা সজোরে চেপে ধরে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় বসলেন; নীলমণি ও সুশীল সোৎসাহে যুগপৎ শ্যামাসঙ্গীত ধরল। বাসের হট্টগোলে আমার ভয় আদৌ ভাঙল না; বিরক্তি বাড়ল। ওই ভদ্রলোক কিন্তু আপন স্থানটিতে ঠিক আগেকার মত স্থাণু হয়ে বসে রইলেন; তাঁর মুখের রেখায় আর যে ভাবই থেকে থাকুক, ভয় বা বিরক্তি ছিল না।

ওঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে দূরে বাইরের দিকে তাকাতে প্রথমটায় বিস্ময়ে নিশ্চল হয়ে গেলাম, তারপর আনন্দে আত্মহারা হলাম। নবোদিত সূর্যের করসম্পাতে হিমালয়ের তখন ধ্যান ভেঙেছে। চতুর্দিকে

একের পর এক অজস্র সস্মিত চূড়া দেখে মনে হল, ওই তো 'সব পেয়েছির দেশ'। এমন অনাবিল আলো, উদার ব্যাপ্তি, সুনিশ্চিত সৌন্দর্য ও অটল গাম্ভীর্য!—কোন সন্দেহ রইল না যে, বাসের শব্দটা থামলেই সামগানও শুনতে পাব। এর পরে আর কী চাওয়ার বা পাওয়ার থাকতে পারে? আমি হেন যে জন্ম-অতৃপ্ত বিতৃষ্ণাবিলাসী সেই আমারও মনে হল, আমি আজ পূর্ণ, আমার জীবন আজ সার্থক। অথচ এই উদার সৌন্দর্যেরই পাশে বসে আমি কিনা এতক্ষণ আপন সঙ্কীর্ণতায় নিজের দৃষ্টি আবৃত রেখেছিলাম, মৃত্যুভয়ে মরছিলাম।

সেই দিন সেই মুহূর্তেও আমার স্মরণ ছিল যে, আমি বাঙালী-জনোচিত ভাববিলাসিতার উর্ধ্বে নই আদৌ। আর সেই কথা স্মরণ রেখেই সেদিন আমার উপলব্ধি হয়েছিল যে, আমি পূর্ণ, আমি সার্থক। আজ এখন সে মুহূর্তের সেই পূর্ণতার কথা বলে কেবলই মনে হচ্ছে, পুরো কথাটা বোধ হয় বলে উঠতে পারলাম না। আমি নিজে যেমন আজ আর সেই পূর্ণতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুভব করে উঠতে পারছি না, আমার পাঠকও নিশ্চয়ই তেমনই দুয়ারের বাইরেই থেকে যাচ্ছেন। কী করব, ভাষাই দুর্বল, তার উপর আমার অধিকারও অপ্রতুল। তা ছাড়া সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকেরও অন্ত নেই। জীবন শব্দটার সঠিক সংজ্ঞা বহুব্যবহারে বহুতর ব্যভিচারে হারিয়ে গেছে, কখন সে পূর্ণ আর কখন সে অপূর্ণ সে সম্পর্কেও আমাদের নিরুদ্বিগ্ন উদাসীনতার অন্ত নেই। একদা একটা লোক নিজের নগণ্য জীবনকে পূর্ণ মনে করেছিল, এই কথাটা যদি আজ নিতান্তই হিং-টিং-ছটের নামান্তর বলে মনে হয় তবে তার জন্যে কার দোষ ধরব? দোষ আমাদের সভ্যতার, দোষ আমাদের শিক্ষার, এবং সর্বোপরি দোষ আমাদের নিজেদের। কিন্তু কেউ বুঝবে না বলে আজ যদি অজ্ঞাত শক্তির সেই করুণার কথা অব্যক্ত রাখি তবে তা কৃতঘ্নতা হবে। সেই অপরাধে আজ আর অন্তত নিজেকে সঙ্কীর্ণতর, অধিকতর অপূর্ণ করব না।

পর্বতের শিখরদেশ থেকে বিমুগ্ধ দৃষ্টি ক্রমে গভীর অরণ্যানী অতিক্রম করে নীচের দিকে নামতে থাকল। নীচে, বহু নীচে অতি সূক্ষ্ম একটি গৈরিক বক্ররেখার মত পায়ে-হাঁটা পথ গঙ্গার অপর পার ধরে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে। তারও নীচে ত্বরিতগতি উচ্ছল সফেন গঙ্গা।

উপরের ন্যায় তলাকার দৃশ্যের সৌন্দর্য উদার নয়, কিন্তু অতি তীক্ষ্ণ অতি নিবিষ্ট। শিখরসৌন্দর্যের পর দৃষ্টি যেমন স্বভাবতই বিশালতর আকাশের দিকে প্রসারিত হয়; গঙ্গা আর ওই নিরীহ পথ তেমনই মন ও দৃষ্টিকে নিজেদের মধ্যে নিবদ্ধ করে রাখে। একবার তাকিয়ে কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির সাধ্য তন্মুহূর্তে নজর ফেরায়! অন্তর্নিহিত বাধ্যবাধকতায় সেইদিকে কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকবার পর আমার পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষায় বিকৃত মন দেখি ওই আকর্ষণের একটি পাশ্চাত্ত্য-যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে ব্যর্থ হচ্ছে। কিন্তু আজও হলফ করে বলতে পারি যে, ওই গঙ্গাস্রোতের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতায় আমি সেদিন আকৃষ্ট হই নি; আর ওই পায়ে-হাঁটা পথ যে আমায় আকর্ষণ করেছিল তার কারণও এই নয় যে আমাদের এই বাস-পথটা ধাতব ও অধিকতর সুগম।

এই দ্বিতীয় কারণের বিপরীতটাই বরং সত্য। ওই সঙ্কীর্ণ, বিপদ-সঙ্কুল, অধুনা-অবহেলিত পথটির দিকে তাকালে মন গর্বে স্ফিত হয় না; বরং অপরাধবোধে চুপসে যায়। আর ওই পথে ওই যে ছোট ছোট এক-একটি চলমান বিন্দুর মত নিঃস্ব যাত্রীদল চলেছে, ওদের দেখলে মন একই সঙ্গে ঈর্ষায় ও প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। সশ্রদ্ধ বেদনায় চেতনা স্তব্ধ হয়ে যায়। ঈর্ষা হয় এইজন্য যে, ওঁরা আমাদের মত পাশ্চাত্ত্যের ভিক্ষা সম্বল করে নিজেদের প্রবঞ্চনা করছে না। লক্ষ্যে পৌঁছে ওঁদের আমাদের উপরে এইটুকু অন্তত বেশী সান্ত্বনা থাকবে যে, ঈশ্বরের পাওনা ওঁরা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করতে করতে এসেছে। দেবঋণের বোঝা নিয়ে তীর্থে এসে পৌঁছায় নি। ওঁরা যে আমাদের মত ফাঁকিবাজ ও স্নব নয় এবং ওঁরা যে এখনও লুপ্ত হয়ে যায় নি—প্রশান্তির কারণও এইটেই। ওঁরা আমাদের অতীত গৌরবের স্মারক; বর্তমান দৈন্যের তিরস্কার। আমাদের বিকৃত চেতনার বিক্ষুব্ধ আকাশে ওঁরা শাশ্বতকালের অচঞ্চল ধ্রুবতারা। পার্বত্য আবহাওয়ার প্রকৃতিগত শুষ্কতার কোন অপরাধ নেই, ক্ষণকাল তাকিয়ে থাকতে চক্ষু আপনা থেকেই সজল হয়ে এল।

অপর দিকে গঙ্গার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণেরও যে কারণটা তখন আমার চোখে পড়েছিল সেটা কোন বিচারেই বৈজ্ঞানিক নয়। গঙ্গার চঞ্চল স্রোতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তখন হঠাৎ মনে হয়েছিল—আর এক মুহূর্ত, তারপরই নিশ্চয় ওই ধারা থেকে সেই সমস্যাটির

সমাধান আত্মপ্রকাশ করবে, যার পরে আর কোন সমস্যাই কোন কালে মানুষের শ্বাসরোধ করবে না। আর একটু—একটুকুর জন্যে শুধু আবরণটা আটকে আছে, একটু পরেই সমস্ত অন্ধকার ঘুচে বিশ্ব-চরাচর আলোময় হয়ে যাবে। আলোর সেই উৎস থেকে মুহূর্তের জন্য চোখ ফিরায় এমন মূঢ়, এমন পাপী দুনিয়ায় কি সম্ভব ?

জীবনের প্রতি, নিয়তির প্রতি, প্রকৃতির প্রতি—এক কথায় ঈশ্বর বলে যদি কেউ থেকে থাকেন তবে তাঁর প্রতি আমি কোনকালে তেমন কৃতজ্ঞ বোধ করি নি। বরং স্বসমাজের রীতি অনুযায়ী তাঁর প্রতি আমার একটা দুর্জয় অভিমান, একটা ক্ষমাহীন অভিযোগ, একটা নিঃসঙ্কোচ নিরুৎকণ্ঠা ছিল। আপন জন্মের জন্য পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করবার কথাও আমার মনে হয় নি কোনদিন। নিজের অভিশপ্ত জীবন ও সেই জীবনের যিনি বা যাঁরা প্রযোজক ও পরিচালক তাঁকে বা তাঁদের অস্বীকার করতে, এমন কি ঘৃণা করতে আমি অভ্যস্ত ছিলাম। কিন্তু সেদিন সেই মুহূর্তে আমার সমস্ত মূঢ় দম্ভ ধূলোয় লুটিয়ে পড়েছিল। যদিও এর জন্য ধন্যবাদটা যে কার প্রাপ্য তা আজও জানি না। এমন পরাজয়ের গৌরব বুঝিয়ে বলার চেষ্টা কেবল অর্থহীন নয়, হাস্যকরও। সে চেষ্টার চাইতে বরং মূঢ়ের মতো বিমুগ্ধ হয়ে থাকা ভালো। সব চাইতে ভালো নিজেকে নিঃশেষে নিমজ্জিত করে দেওয়া।

ব্যাসী চটিতে এসে বাস থামল। চটি তো নয়, টার্মিনাস। আরও অজস্র বাস দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রীরা প্রাতঃকৃত্যে ও চা-পানে ব্যস্ত। চা-পানের পর আবার যখন বাসে উঠলাম ততক্ষণে নীলমণি আমার ডান ধারের লোভনীয় আসনটি দখল করে বসেছে। বিবাদ করবার আর উৎসাহ ছিল না, বিনাপ্রতিবাদে বামদিকের একটি আসন গ্রহণ করলাম। নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম এই বলে যে, এতক্ষণ বাহির দেখেছি, এইবার আমি ঘর দেখব।

কিন্তু এ তো ঘর নয়, এ যে হাট; শুধু হাটও নয়, আন্তর্জাতিক হাট। একমাত্র আসাম ও উড়িষ্যা ব্যতিরেকে ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশের প্রতিনিধি উপস্থিত রয়েছে। বিহারী আছে, মাদ্রাজী আছে,

পাঞ্জাবী আছে, মহারাষ্ট্রী আছে সর্বোপরি আছে সর্বাধিক সংখ্যক বাঙালী —অথচ, কি আশ্চর্য, সবারই যাত্রার উদ্দেশ্য এক, সবাই এক পথের পথিক। ভারতীয় একতা কথাটা তা হলে নিছক রাজনীতিজ্ঞের সৃষ্টি নয়।

কিন্তু কোন বাঘা স্বদেশীও এই বাসে উপস্থিত থাকলে, ভারতীয় একতার এই জীবন্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে আটখানা হতে পারতেন বলে মনে হল না। কেন না, যে উদার বিশ্বাসের সূত্রে এদের একতা, সে সম্পর্কে সচেতন থেকে, সে বিশ্বাসে নির্ভর করে এরা একত্রিত হয়েছে এমন অনুমানের কোন সুদূরাগত কারণ এদের আচরণে নেই। মহিলারা তো আবক্ষ ঘোমটা টেনে বসে আছেন—এই দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে তীর্থস্থাপনের গূঢ়তর উদ্দেশ্যটা জানবার সামান্যতম পরিসরটুকুও তাঁরা উন্মুক্ত রাখেন নি। আর যাঁদের ঘোমটা টানবার উপায় নেই, সেই পুরুষসিংহরা মাঝে মাঝে যন্ত্রের মত জয়ধ্বনি করছেন বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও মাঝে মাঝে নিদ্রায় ঢুলে পড়ছেন। মাদ্রাজীরা প্রায় সবাই রোগগ্রস্ত—ওদের এই যাত্রাও, অন্যতর যাত্রার অনুরূপ, একান্তই পার্থিব কারণে। আর বাঙালীরা, যেমন আমি, যেমন কোণের সেই ভদ্রলোক, সবাই আত্মচিন্তায় ক্লিষ্ট। আমার কেবলই মনে হতে লাগল যে, ভারতীয় একতা নামে কোন সোনার-পাথরবাটি যদি ভূ-ভারতে থেকেও থাকে তবে তা কোন অদ্বৈত বিশ্বাসের গৌরবে সুপ্রতিষ্ঠিত নয়; ভারতের দ্বৈত নয়, বহুতর দুর্বলতার অভিশাপই সেই একতার অনিশ্চিত ভিত্তি।

উপরি-উক্ত সামান্যীকরণের যিনি একমাত্র ব্যতিক্রম, বাসের দূরতম কোণে বসে যিনি অনর্গল আপন সাথীর সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছিলেন ও মাঝে মাঝে অট্টহাস্যে সবাইকে চমকে দিচ্ছিলেন, তাঁর সপ্রতিভ প্রাণোচ্ছলতায়ও ওই বিমর্ষকর চিন্তাধারা কণামাত্র ব্যাহত হ'ল না। উনি স্পষ্টতই উত্তর-ভারতীয়া, এবং স্বভাব প্রগল্ভা। তাঁর ওই অনাবিল আনন্দের সঙ্গে যদি সামান্য শ্রদ্ধার নম্রতা মিশ্রিত থাকত তবে আমার বিক্ষুব্ধ মন হয়তো কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হত। তাঁর হাসির অগভীরতায় আমার বিক্ষোভ বাড়ল। বাইরের দিকে চোখ ফিরাতে দেখি, হিমালয় দৃষ্টিপথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে আছে।

এই তথাকথিত সুগম বাস-পথের এক-ধারে মৃত্যু-গভীর খাদ, অপর

ধারে কারা-প্রাচীরের মতো অতি-সন্নিকটস্থ পর্বত-গাত্রের রূঢ় রুদ্ধতা।— সামনে দু-হাত এগিয়েই পথ নিঃশেষে নিরুদ্দিষ্ট! এমন পথাতিক্রমণে অমন কৃত্রিমতা ছাড়া আর কি সহায় হবে দুর্বল মানুষের!

এক সময় বাসটা হঠাৎ মোড় ফিরতে দূরে দেবপ্রয়াগ চোখে পড়ল— যাদুকর যেমন অকস্মাৎ টুপি থেকে জীবন্ত খরগোশ বের করে দর্শকদের বিমোহিত করে দেয় অনেকটা সেই রকম। পর্বতের বিশাল পটভূমিকায় ছোট ছোট কতকগুলো দুতলা, তিনতলা বাড়ি উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় প্রস্ফুটিত ফুলের মত ঝকঝক করছে। শান্ত কিন্তু সমাহিত নয়; আনন্দময় কিন্তু অনুচ্ছল— চিত্রার্পিতবৎ তীর্থ দেবপ্রয়াগ। দেখেই মনে হল, দেবলোকের মানচিত্রে এর খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। আর এইটে নিশ্চয়ই সেখানকার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নগরী। কেন না, ভাগীরথী ও অলকানন্দা মারফৎ স্বর্গলোকের সঙ্গে এর সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে।

বাস থেকে নেমে অলকানন্দার সঙ্কীর্ণ ঝুলা পেরিয়ে দেবপ্রয়াগের প্রবেশ পথ। ঝুলা থেকে পথটা ডান দিকে সোজা সঙ্গমে চলে গেছে। একেই বাম দিকের বাড়িগুলো পিছনের পাহাড়ের চাপে পথের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, তায় আবার পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং তদুপরি পথে যাত্রীর এবং তাঁদের ব্যস্ততার অন্ত নেই। অথচ ডান দিকেই অবাধ অলকানন্দার গভীরতা। ভীতি গোপন করবার চেষ্টা মাত্র না করে ধীরে ধীরে পথের নিরাপদ বাম দিকটা ধরে এগুতে লাগলাম। একটু এগিয়েই পথটা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে একটা উঠে গেছে উপরে রঘুনাথের মন্দিরের দিকে, অপরটা নেমে গেছে নীচে সঙ্গমে। একটু নেমেই নজরে পড়ল, বাম দিকে ভাগীরথী ও ডান দিকে অলকানন্দা পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ। যেন দুই বাল্যসখী শ্বশ্রূগৃহে দীর্ঘ প্রবাসের পর পুনর্মিলিত হয়ে কলোচ্ছ্বাসে একে অপরের গায় ঢলে পড়ছে। যেন স্বামী-সোহাগিনী দুজনেই আপন আপন দাম্পত্য-কাহিনী বর্ণনে ব্যস্ত—অপরা শুনছে কি না তা খেয়াল করবার অবসর একজনেরও নেই। আনন্দে উভয়েই আত্মহারা। কিছুক্ষণ দেখলে দর্শকের মনও একটা অলৌকিক আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে; কিন্তু তিনিও যদি আত্মহারা হয়ে ওদের আলিঙ্গন করতে ব্যগ্র হন তবে—ঈশ্বর তাঁর সহায় হোন।

আমি কিন্তু দূর থেকেই কিছুক্ষণ ওদের বাক্যালাপ শুনলাম, তৎসহ পুণ্যার্থীদের স্নান ও তর্পণ দেখলাম। পূর্ব-পুরুষ ও ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে এই সঙ্গমে তর্পণের রীতি আছে। পথিপার্শ্বের এই উপরি পুণ্যটুকু, ঋণশোধের এই সহজ সুযোগ অনেকেই সাগ্রহে গ্রহণ করছে। পুণ্য-গৃধ্নুতার এসব বাতুল আতিশয্যে আমার হাসি পেল; যেচে ঋণ স্বীকার করে তা পরিশোধ করবার এমন হাস্যকর উদ্‌গ্রীবতায় হাসি শুকিয়ে গেল। নিজেকে কিছুক্ষণ বিশ্বাস করাবার চেষ্টা করলাম যে এই অনুষ্ঠানের পশ্চাতে কিছুটা অন্তত আন্তরিকতার আবেগ আছে; কিন্তু সত্তার অপরার্দ্ধ দূরত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে অনায়াসে ভ্রূ-কুঞ্চিত করে রইল! অথচ অমন অন্তর্দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও মনে একটু গ্লানি জমতে পেল না। হৃদয়-বৃত্তির দিগন্ত কখন যেন বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে গেছে। প্রয়াগের কল্লোলে মাদকতা আছে। ব্যাপ্তি আছে। অবশেষে খানিকটা বাম দিকে সরে ভাগীরথীর কূলে একটি প্রস্তরের উপর নির্জনে বসলাম, আধ ঘণ্টা বসে রইলাম নিশ্চুপ নিথর হয়ে। কিন্তু সেই আধঘণ্টা আমি সত্যি ওই পাথরটার উপরেই বসেছিলাম কি না আজ আর তা হলফ করে বলতে পারব না।

সামনেই ভীমগর্জনে ত্বরিতগতি গঙ্গা প্রবাহমানা। গঙ্গার অপর পারে পাহাড়ের গা বেয়ে পায়ে-হাঁটা পথ প্রয়াগে এসে পৌঁছেছে। ওই পথে এলে অদূরের ওই ঝুলাটা অতিক্রম করে প্রয়াগ-তীর্থে প্রবেশ করতে হয়; ঝুলাটার নাক লছমনঝুলার মত অত তীক্ষ্ণ নয়। হিমালয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নয়, মিতালী করেই ওর অস্তিত্ব।

এমন সময় পায়ে-হাঁটা পথ বেয়ে জন-দশেক যাত্রী প্রয়াগে এসে পৌঁছল। কোন উচ্ছ্বাস নেই, কোন প্রগল্‌ভতা নেই, কোন জয়ধ্বনি পর্যন্ত নেই—নির্বাক অচঞ্চল গতিতে ওরা ঝুলাটার দিকে এগিয়ে গেল। ওদের চলনের ও চাউনির সমাহিত ভাব দেখে আমার মন আবার ঈর্ষায় জ্বলে গেল, এবং ব্যগ্রভাবে কাকে যেন আমি সকাতরে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার জন্ম কেন ত্রিশ বছর আগে হল না? কবেকার কোন অপরাধে?

আমার এই অর্থহীন প্রশ্নের আপাত বাতুলতায় পাঠক হয়তো কিঞ্চিৎ করুণার্দ্র হবেন। কিন্তু আগেই তো বলেছি, আমি আদৌ ভাব-বিলাসিতার ঊর্ধ্বে নই। এর আগেও বুদ্ধদেবের জীবনীপাঠকালে আমার

মনে হয়েছে : আমি কেন তাঁর আমলে শ্রমণ হয়ে জন্মাই নি ? তারপরে মোগল-যুগের ইতিহাসপাঠকালেও মনে প্রশ্ন জেগেছে, ওমরাহ হয়ে জন্মাতে আমার বাধা কী ছিল ? অধ্যাপকের মুখে ইউরোপের মধ্য-যুগের কাহিনী শুনতে শুনতে অজস্রবার এই প্রশ্নটা শেষ মুহূর্তে চেপে গেছি যে, সেই আমলে কি আমি নাইট হয়ে জন্মাতে পারতাম না ? কিংবা যদি উনবিংশ শতকের বাংলায়ই আমার জন্ম হত, তা হলে মাইকেলের মত মহাকাব্য লিখতে যদি বা অক্ষম হতাম তবু হরিশ্চন্দ্রের মত দু-চারটে প্রবন্ধ তো লিখতে পারতাম নিশ্চয়ই। এর আগে যতবারই আমার মাথায় এ-সব উদ্ভট চিন্তা এসেছে অপরিচিত ভাগ্যবিধাতার উপর আমার অভিমান বেড়েছে ততই। কী করা যাবে, অভিমান মাত্রেই তো অন্ধ।—

কিন্তু আজ আমি বসেছিলাম চপলগতি ভাগীরথীর তীরে। চিন্তাটা তাই আজ আর বৃত্তাকারে ঘুরে আমায় অবসন্ন করবার অবকাশ পেল না। যাত্রীদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন দেখি আমিও যেন ওদের সহযাত্রী হয়ে ক্ষতবিক্ষত পায়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে প্রয়াগে এসে পৌঁছেছি। সে কি পথ—দুর্গম, সঙ্কীর্ণ, দীর্ঘ সেই পথের কথা স্মরণ করলে আপনা থেকে মন ঈশ্বরে সমর্পিত হয়। চড়াইয়ের আর শেষ নেই ; অন্তহীন উতরাই—অথচ আয়ত্তাতীত ঈশ্বরই একমাত্র ভরসা। পথ চলবার সময় ক্লান্তিতে, পায়ের ব্যথায় তাঁর উপর রাগ হয়, অভিমান হয়, এমন কি ঘৃণা হয়। দিনশেষে চটিতে পৌঁছলে তাঁর করুণায় মন প্রশান্তিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। শোকে-দুঃখে, আনন্দে-উৎসবে ঈশ্বরই একমাত্র সহচর ; সেই সাহচর্য থেকে যে বঞ্চিত হল তার জন্ম বৃথা, তার যাত্রা নিষ্ফল।

এই যে, এখানে বসে কী করছিলেন ?

না, এক্ষুনি উঠে পড়ব ভাবছিলাম। তারাদা আসতেই উঠে দাঁড়ালাম। ভাবলাম, কি আশ্চর্য, অতীতে জন্মাই নি বলেই যে অতীতকে হারাই নি এই সহজ কথাটা কেন এতদিন আমার খেয়াল হয়নি ! সময়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে জীবনটাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করে এতকাল সেই অবস্থাটিকেই সত্য বলে জেনেছি, অপরিবর্তনীয় বলে মেনেছি। অনুভূতিটাকে সামান্য জাগ্রত করে, সমবেদনাবোধকে একটু পরিব্যাপ্ত

করে কালের কুটিলতা জয়ের কথা মনেও হয় নি কোন দিন। জীবন যে সমবেদনার আশ্রয়ে, তার উপর কালের অধিকার আর কতটুকু! অথচ জন্মাবধি কী দুর্ভোগই না ভুগেছি আপন অজ্ঞতায়!

আপনি বড় দুর্ভাগা মশাই, দেবপ্রয়াগে এসে রঘুনাথজীর মন্দির দেখা আপনার হল না। আপনি এদিকে বসে রইলেন, ওদিকে মন্দির বন্ধ হয়ে গেল।

তারাদার এই অনুকম্পা অহেতুক জেনেও অবহেলা করবার মত যথেষ্ট পুরস্কার আমি সেদিন পেয়েছিলাম। তাই কপট শোকপ্রকাশ করে শুধু বললাম, আহা, তাই তো!

বিকেলের দিকে দেবপ্রয়াগ ত্যাগকালে বাস-রাস্তার উপর থেকে আবার একবার সফেন গঙ্গা ও সুনীল অলকানন্দার অনাদি অনন্ত চঞ্চল আলিঙ্গন নয়নভরে দেখে নিলাম। এই সান্ত্বনা নিয়ে শুধু বাসে উঠলাম যে, এ পথ দিয়েই আবার ফিরব। ফিরতে হবে।

বাসে এইবার আমাদের নিম্নশ্রেণীর টিকিট। বাসে উঠতেই নীলমণি বলল, কী আর করা যাবে, আপার ক্লাসের টিকিট সব কটাই একটি পাঞ্জাবী পরিবার কিনে নিয়েছে, লোকগুলো এসেছে একেবারে গোষ্ঠীগোত্তর নিয়ে।

কিন্তু পথে আমি আরও অনেক বেশী ক্লেশ প্রত্যাশা করেছিলাম, অতএব হৃষ্টচিত্তেই বাসের পিছন দিকের আসনে বসে পড়লাম। একটু পরেই সেই পাঞ্জাবী পরিবার সদলবলে এসে উপস্থিত হ'ল। পরিবারটি স্পষ্টতই অভিজাত শ্রেণীর, দলের সদস্যসংখ্যা ছয়—চারজন তার মধ্যে নারী, বাকী দুজন নরবেশী। প্রথমোক্তদের তিন জনেরই বয়স চল্লিশোর্ধ্বে হবে, অপরা ষোড়শী। এঁদের সকলেরই পরনে হাল-ফ্যাশানের পোষাক, সিল্ক কিংবা জর্জেটের শাড়ির উপর কোট কিংবা ওভারকোট। শেষোক্তের পরিধানে সাদা সালোয়ার, উজ্জ্বল ছিটের পাঞ্জাবি ও ফিকে রঙের দুপাট্টা—সর্বোপরি কাশ্মীরী কারুকার্যসমন্বিত একটি গরম কোট হেলাভরে দেহ-বেতসে ছড়ানো আছে। এঁর বর্ণ সঠিক নির্ণয় করা শক্ত, চোখ দুটো ভাবগ্রাহী, অবয়বে তীক্ষ্নতা আছে এবং বেশ কৃশাঙ্গী। কলকাতার দক্ষিণাঞ্চলে যে এক শ্রেণীর বায়ুভুক,

বায়ুনির্ভর, বায়বীয় জীব চোখে পড়ে, এঁকে দেখেই তাঁদের যোগ্যতম প্রতিনিধি বলে চিনতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হল না। আর যে দুজন নরবেশী এঁদের চলনদার, তাঁদের একজন স্পষ্টতই এঁদের ইহলৌকিক অভিভাবক। তাঁর পরনে বুশ শার্ট ও শর্টস, মুখে সিগারেট কাঁধে ক্যামেরা। অপরজন পারলৌকিক দিকটা দেখাশুনা করেন বলে মনে হল, তাই তাঁর পরিধানে গেরুয়া রঙের আলখাল্লা, লুঙ্গী ও টুপি। এঁদের চলনের আপাত-অবিন্যস্ততা ও বলনের কৃত্রিম চিক্কণ স্বর শুনে প্রথমটায় ঠোঁট উল্টে উপেক্ষা করবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তন্মধ্যেই দেখি নাগরিক হীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সেই পুরনো গ্লানিতে মনটা সম্পূর্ণ বিষাক্ত হয়ে গেছে।

নীলমণি একটা চিমটি কেটে বলল, চিনতে পারলেন ?

কি করে পারব ?

বা রে, এরা যে হৃষিকেশের ধর্মশালায় আমাদের পাশের কামরাতে ছিল, মনে নেই ?

ও, তাই নাকি !—আমার সেই অর্ধচেতনায় শ্রুত রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কথা মনে হল। তবে কি এদের মধ্যেই কেউ গেয়েছিল সেদিন, কিন্তু সে কি করে সম্ভব!

আপনাদের ওয়াটার-বটলে কি খাবার জল ?—জনৈকা চল্লিশোর্ধ্বা হঠাৎ পিছন ফিরে স্পষ্ট স্থললিত বঙ্গভাষায় জিজ্ঞেস করলেন।

আমাদের ননীবাবু সম্ভবত প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, ব্যগ্রভাবে জলের পাত্র এগিয়ে ধরলেন। আমি ভাবলাম, তবে তা'ও হবে, তবে এদের কথা আমি আর ভাবব না। অন্তত না ভাববার চেষ্টা করব। কেন না, যদিও এখনও জানি না যে আমি এ পথে কেন এসেছি, তবুও এইটুকু অন্তত জানি যে প্রাচ্য ও প্রাশ্চাত্যের জারজ ওই কৃত্রিমতার আকর্ষণে আসি নি। আর কে জানে, আমরা যে আমাদের অতীতকে, আমাদের অতীতের পাপ পুণ্য কামনা সাধনা কিছুই কখনও এবং কোথাও অস্বীকার করতে পারি নে, এ হয় তো সে সত্যেরই প্রত্যক্ষ অনস্বীকার্য সাক্ষ্য। কিন্তু সেই অতীতকে অস্বীকার করতে পারি আর না পারি, ভবিষ্যতে অন্তত তার পুনরাবৃত্তি হতে আমি দেব না, অন্তত না দেবার প্রয়াস পাব। সেই প্রয়াসেই, একটি বিকল্পের সন্ধানে যে আমার যাত্রা।

ইতিমধ্যে ধুলোয় আকাশ অন্ধকার করে একের পর এক বাসগুলো

শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে শুরু করেছে। অবশেষে আমাদের ড্রাইভার মহোদয়েরও টিকি চোখে পড়ল। এবারে ড্রাইভার বয়সে তরুণ, তার চেহারাতেও এমন একটা স্থূল আত্মপ্রত্যয়ের ভাব যাতে নিশ্চিন্ত নির্ভর সম্ভব নয়। তদুপরি মুখে আবার জলন্ত সিগারেট ধুমায়মান। সকালের ড্রাইভারটি ষ্টিয়ারিংএ মাথা ঠুকে, সকল দায়িত্ব অন্তর্নিহিত বিশ্বাসের পায়ে নিঃশেষে সমর্পণ করে গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছিল, এ সে সকল কুসংস্কারমুক্ত স্টার্ট দিল সিগারেটে টান মেরে। হিমালয় নামক ব্যাপারটির প্রতি এই প্রগল্ভ ছোকরার কৃত্রিম শ্রদ্ধাটুকুও নেই। এমনিতেই যাত্রীদের মনে স্বস্তির লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না, বাস ছাড়তে সবাই শবের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল। গান করে বা ধ্বনি দিয়ে সাহস সঞ্চারের সামর্থ্যও কারুর মধ্যে রইল না। কারও সাহস হল না যে ড্রাইভারকে ডেকে গাড়িটা একটু সাবধানে চালাতে বলে ; কে জানে তা হলে সেই পলকের অসাবধানতায়ই অনিবার্য দুর্ঘটনাটি ত্বরান্বিত হবে না !

এর পরে ভগবান উপত্যকায় পৌঁছে ড্রাইভারের প্রয়োজনে বাসটা যখন কিছুক্ষণের জন্য থামল, সবাই তখন ধড়ে প্রাণ ফিরে পেল। আমরাও বাস থেকে নেমে মাটি স্পর্শ করে অনুভবের প্রয়াস পেলাম যে সত্যি বেঁচে আছি। তারাদা যেন কপট একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আশঙ্কা ছিল দেবঋণের বোঝা নিয়েই বুঝি বা শেষ পর্যন্ত দেবলোকে পৌঁছতে হয়, তা হলে আর মুখ দেখাতে পারতাম না। এ ভালই হল যে, ঈশ্বর তাঁর পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিলেন।

আস্তে, দেনা শোধ হল ভেবে এখুনি হাঁফ ছাড়বেন না, এখনও অর্ধেক পথ বাকী। আমার তো ভয় হচ্ছে দেনার দায়ে ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত না বাস শুদ্ধ ক্রোক করে নেন!—বাস থেকে নেমে এসে সুশীল উপত্যকাটির আলোকচিত্র গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ছবি তুলে রাখবার যোগ্য উপত্যকা বটে, কিন্তু ছবিতে এর রমণীয়তার কতটুকু আসবে? খানিকটা সমতল পেয়ে অলকানন্দা এই স্থানে একটু বেঁকে বয়ে গেছে। নদী-শয্যার ঝকঝকে নুড়িগুলো স্পষ্ট চোখে পড়ে ; ঝোপঝাড়ের বিশেষ বালাই নেই, বেশ নিকানো পোছানো ভাব। সূর্য পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে কিন্তু তার প্রভায় উপত্যকার গভীরতম প্রদেশ

পর্যন্ত প্রোজ্জ্বল। সমস্ত কিছু শান্ত, স্নিগ্ধ, সুন্দর—মনে হয় কোন অভিসারিকা বুঝি প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় ক্লান্ত হয়ে মুহূর্তের জন্য ঘুমিয়ে পড়ে থাকবে।

ড্রাইভারের প্রয়োজন ফুরতে আবার বাস ছাড়ল। আবার ভয়ঙ্কর মৃত্যুলোক অতিক্রম করে সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ কিরাতনগর এসে পৌঁছলাম। এখানে ঝুলা পার হয়ে আবার শ্রীনগরের বাস ধরতে হয়। কিন্তু বিধি বাম, আমাদের কুলি ঝুলা অতিক্রম করবার অনেক আগেই শ্রীনগরের বাস ছেড়ে গেল। অগত্যা পদব্রজেই এই তিন মাইল মাত্র পথ অতিক্রম করব স্থির করে অনতিবিলম্বে রওয়ানা হয়ে পড়লাম। পথে ধূলোয় অসুবিধে হয়েছিল কিন্তু তা নগণ্য; বহু দূরে দূরে পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গ্রামে আস্তে আস্তে জোনাকির মত মিটমিটে আলো জ্বলে উঠছিল একের পর এক; আর অন্ধকার আকাশে অজস্র তারকা।

রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ভূতপূর্ব গাড়োয়াল রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগরে পৌঁছতেই আমাদের এক দল চলে গেল পরদিনের বাসের টিকিটের সন্ধানে, অপর দল গে আশ্রয়ের খোঁজে। গোড়া থেকেই অনেক পরিশ্রম করে সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে আমি মানুষটা একটু অলস প্রকৃতির, এবং বৈষয়িক ব্যাপারে নিতান্তই অকর্মন্য। সেই সুনামটুকু এখন কাজে লাগল। ইহ চিন্তা নির্ভরযোগ্য সহযাত্রীদের স্কন্ধে অর্পণ করে একটা চায়ের দোকানের বারান্দায় দেহ এলিয়ে দিলাম। হিমালয়ের উপত্যকায় নদীর কূলে কূলে ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতায় তিন মাইল পথ পায়ে হেঁটে কেমন একটু নেশা ধরে গিয়েছিল, যেন মিষ্টি গজলের ক্লান্ত রেশ। অর্থাৎ অলস চিন্তার মাহেন্দ্রযোগ!

কিন্তু পাশের দোকান থেকে বেতারের গান ভেসে আসছিল। আর শুধু বেতার-সঙ্গীতই নয়; শ্রীনগরে ক্যাপস্টান সিগারেটও পাওয়া যায়; কেবল কোকা-কোলা এখনও এসে পৌঁছতে বাকী। ভূতপূর্ব রাজধানীর কলঙ্কময় স্মৃতি-চিহ্ন আজও ছড়িয়ে আছে শ্রীনগরের পথের খোয়ায়, দোকানের পণ্যে ও অধিবাসীর কুরুচিতে। এক গেলাস চায়ের নির্দেশ দিয়ে বিমর্ষ মনে বসে সিগেরেটে টান দিলাম।

দেশলাই আছে—তাকিয়ে দেখি সেই ভদ্রলোক, যার সঙ্গে এক বাসে

হৃষিকেশ থেকে দেবপ্রয়াগ এসেছিলাম, তিনি আমার পাশে দাওয়ায় বসছেন।

আছে।—আমি দেশলাই এগিয়ে ধরলাম।

আপনারা বুঝি দল বেঁধে এসেছেন?

না, দল বেঁধে আসি নি, তবে এর মধ্যেই জট পাকিয়ে ফেলেছি।

মানে?—সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। স্বল্পভাষিতায় ও অসামাজিকতায় যিনি আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তাঁর মধ্যে এমন সহৃদয় বাক্যোৎসাহ দেখে সামান্য বিস্মিত হলাম।

মানে আর কি, পুণ্য যদি বা কখনও পিছনে ফেলে আসা যায়, তবু পাপকে সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে বহন করতেই হয়। আমাদের দল যদিও বিচক্ষণ নির্বাচনের পর গঠিত হয় নি, তবু দেখছি দলটি আমার চরিত্রের বিশিষ্ট দোষগুলোর সুযোগ্য প্রতিনিধিদের নিয়েই গড়ে উঠেছে। আর আমার কোন সন্দেহই নেই যে, আমাদের দলের অন্যান্য সবাইও ব্যক্তিগতভাবে ঠিক এই কথাই ভাবছেন।

ভদ্রলোক মৃদু হেসে সমবেদনা জ্ঞাপন করলেন। এমন সময় চা এল। গ্লাসটা ওঁর দিকে এগিয়ে ধরে আর এক গ্লাস চায়ের নির্দেশ দিলাম।

আপনি বুঝি একা এসেছেন?

একাই তো এসেছিলাম, কিন্তু এখন আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আদৌ একা আসি নি।—সিগারেটটায় জোরে জোরে কয়েকটা টান দিলেন ভদ্রলোক—বস্তুত সেই রওয়ানা হয়ে থেকেই তো অতীতের কথা ভাবছি; আর সেই অতীত তো একবচন নয়—কত ঘটনা কত ব্যক্তি, কত গৌরব কত গ্লানি, কত প্রাপ্তি কত প্রার্থনা, অজস্র আশা, তার চাইতেও কত অধিকসংখ্যক হতাশা!

ভদ্রলোক মুহুর্মুহু সিগারেট টানতে লাগলেন। আমি ওঁর নিবিষ্টতা ভাঙলাম না, তাছাড়া আমার ভাববার ছিল। অবসন্ন চোখে দেখলাম একটি বারো-চৌদ্দ বছরের সম্পূর্ণ উলঙ্গ স্থানীয় বালক আমাদের দিকে আসছে। আসতে আসতে মাঝপথে হঠাৎ সে বসে পড়ছে, একটা গাল মাটিতে রেখে এক মুহূর্ত চুপ করে থাকছে, তারপরে মাথাটা ঘুরিয়ে অপর গাল আবার মাটিতে রাখছে। কিছুক্ষণ পরে খানিকটা এগিয়ে এসে

আবার। স্পষ্টতই বালকটি উন্মাদ। এমন সময় চা-ওয়ালা চা দিতে এসে আমাদের দৃষ্টি অনুসরণ করে বলল, পূর্বজন্মের পাপ বাবু। সমস্ত সাল এই রকম! কেউ কিছু দিলে খাবে, নয় তো ভুখা থাকবে। জামা কাপড় দিলে পরবে না, ছিঁড়ে ফেলবে। পূর্বজন্মে যে কী সাংঘাতিক পাপ করেছিল, তা ঈশ্বর জানেন। দোকানদার স্পষ্টতই পূর্বজন্ম, ঈশ্বর ইত্যাদি শব্দগুলো সম্পূর্ণ আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করছিল। সংযত হবার আগেই আমার ওষ্ঠ থেকে একটি বিদ্রূপ সূচক আনুনাসিক শব্দ নির্গত হল।

স্‌স্‌ করলেন যে, ওই পূর্বজন্ম শব্দটা শুনে বুঝি?

সেই কারণেও বটে।

কেন, আপনি জন্মান্তরবাদ বিশ্বাস করেন না?

আমি আর হাসি চাপতে পারলাম না। হেসেই বললাম, যেন আপনি করেন!

বাঃ, করি বইকি।—ভদ্রলোক না হেসেই বললেন, দিনের মধ্যে দশবার জন্মাচ্ছি, মরছি, আর জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করব না।

আমি শুধু কৌতূহলবিস্ফারিত নয়নে ভদ্রলোকের দিকে চাইলাম। তিনি বলতে লাগলেন—ভেবে দেখুন জ্ঞানোন্মেষের প্রথম দিনটি থেকে পাশে হাত দিয়ে দেখলুম—মা বিছানায় নেই, একবার মরলুম। তারপরে খেলায় হারলুম, আইসক্রীম কেনবার পয়সা পকেটে নেই, পরীক্ষার পর পরীক্ষা, চাকুরি নেই; কথা দিয়ে প্রেমিকা আসে না, অন্যের সামনে সে হাসে অন্যের কথায় কৌতুক বোধ করে, অজস্র মৃত্যু ছাড়া জীবনে আর আছে কী? আর সেই সব মৃত্যুতেই কি পূর্বজন্মগুলোর সমস্ত শেষ হয়ে যায়? না মশাই, জন্মান্তরবাদে যাঁরা অবিশ্বাসী আমি তাঁদের বলি, গতকালের আধুনিক। কথাগুলো যদি উনি হাস্যচ্ছলে বলতেন তবে ওঁকে চতুর বলে ধরে নেওয়া যেত; কিন্তু কথাগুলো তিনি যে স্বরে বললেন তাতে সন্দেহ রইল না যে, তিনি জিজ্ঞাসু। কিন্তু কী ওঁর প্রশ্ন? অধিকতর ভাববার সুযোগ না দিয়েই ভদ্রলোক ফস করে জিজ্ঞেস করে বসলেন, আচ্ছা, এ পথ তো আরামের পথ নয়, আপনি এ পথে কেন এসেছেন?

তা এখনও সঠিক জানি না।—ভদ্রলোকের প্রশ্নের ধরনে কিঞ্চিত

আহত হয়েছিলাম, তাই রূঢ় কণ্ঠেই প্রশ্নটা আবার তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিলাম—আপনি জানেন, আপনি কেন এসেছেন?

জানি বৈকি। কী পাব না-পাব তা না জেনে আমরা আবার আজকাল কোনও কাজে হাত দিই নাকি?

এমন সুস্পষ্ট জবাব পেয়ে বিস্ময়ে প্রায় হতবাক হয়ে গেলাম। কোন প্রকারে উচ্চারণ করলাম, শুনতে পারি কি আপনার যাত্রার উদ্দেশ্যটা কী?

ভদ্রলোক এইবার বিনয়ে বিগলিত হলেন—আজ্ঞে, মাপ করবেন, এক্ষুনি সেটা ঠিক গুছিয়ে বলে উঠতে পারব না। পরে যদি কখনও সুযোগ হয় তো—।

বেশ, তা নয় নাই বললেন, কিন্তু সেই উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হবে বলে বোধ হচ্ছে কি?

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভদ্রলোক। একটা সিগারেট ধরালেন। তার পরে বললেন, আজ সকালে দেবপ্রয়াগে ভাগীরথীর পাড়ে বসে অনেকক্ষণ জলধারাটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। অনেক সময়, প্রায় দেড় ঘণ্টা—বহির্জগতের অস্তিত্বই বিস্মৃত হয়ে ছিলাম। তারপর যে মুহূর্তে মনে হল—উত্তরটা এইবার পাব, অমনি নজরে পড়ল অদূরে আপনিও তন্ময় হয়ে বসে আছেন। সাধনা বিঘ্নিত হতে পলকের অনবধানতায় উত্তরটা পাবার আগেই হারিয়ে গেল। তবে আশা এখনও আছে বইকি, নয়তো দেবপ্রয়াগ থেকেই ফিরতাম।

আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য মার্জনা চাইবার আগেই উপরের ও নীচের পথ ছুটি ধরে যুগপৎ আমাদের দলের সবাই এসে হাজির হলেন। কাল সকালের প্রথম বাসেই রুদ্রপ্রয়াগের টিকিট পাওয়া গেছে। নীলমণি তার রিপোর্ট দাখিল করল। অপর দিকে তারাদা জানালেন, কোনখানেই তিলধারণের স্থান নেই। কালী-কমলী-ওয়ালার ধর্মশালার একটি চাতালে রাত্রি যাপন করা চলবে, ভোজনং হোটেলে।

আগামী কাল রুদ্রপ্রয়াগ। হোটেলের উদ্দেশ্যে আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম। সেই ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে এলেন না। সেখানেই বসে রইলেন। একা।

তিন

পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াসে প্রাণীমাত্রেই আপন প্রকৃতিতে কতকগুলো প্রতিরোধ-ব্যবস্থার সৃষ্টি করে থাকে—বহুরূপী যেমন ঋতুতে ঋতুতে আপন দেহের বর্ণান্তর ঘটায়, তেমনই মেরুপ্রদেশের ভালুকের দেহবর্ণ শ্বেত। তার পর কালক্রমে জীব এই প্রতিকূল অবস্থা ও প্রতিরোধ-ব্যবস্থা উভয়ের কথাই সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়। তখন সে ভাবে, যা আছে তাই ছিল—এইটিই স্বাভাবিক। এর পর তাকে প্রমাণ করে বোঝাতে হয় যে, আপন অক্ষপথে পৃথিবীর নিয়ত ঘূর্ণনের ফলে অবশ্যম্ভাবীরূপেই একটি প্রচণ্ড শব্দ অবিরত উঠছে। আর কেউ যদি বলে যে, আমি সেই শব্দ শুনতে পাচ্ছি, তখন তাঁকে বিনাদ্বিধায় আমরা উন্মাদ বলে সাব্যস্ত করি।

আমরা কলকাতার অধিবাসীরাও আমাদের শ্রুতিশক্তি কথঞ্চিৎ খাট করে নিয়েছি ট্রাম-বাসের শব্দের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াসে; দৃষ্টিশক্তিকে হ্রস্ব করেছি, কারণ নচেৎ বানপ্রস্থ গ্রহণ করতে হয়; চিন্তাশক্তিকে কমিয়ে প্রায় লুপ্ত করেছি, নতুবা পাগল হয়ে যেতে হয়। এত সবের পরেও আমরা এমন ভাবনায় অভ্যস্ত যে আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক আছি। সবই ওই সোপেনহাওয়ার-কথিত বাঁচবার জৈবিক ঈপ্সার কারণে। কিন্তু যাঁরা আমাদের মত সর্ববিষয়েই রামাশ্যামা নন, তাঁরা এই ক্লীব ভাবনাকে মুহূর্তের জন্যেও প্রশ্রয় দেন না। বোধশক্তির পুনঃসম্প্রসারণ-প্রয়াসে তখন গগাঁ বোর্স-এর সফলতায় পদাঘাত করে দারিদ্র্য বরণ করেন, নীটশে উন্মাদ হন, মোপাসাঁ যৌন-ব্যাধির বীজাণু আহরণ করেন, আর গগ্ ক্ষুর দিয়ে কেবল

নিজের কান কেটেই ক্ষান্ত হতে পারেন না, নিজের উদরে গুলি ছোড়েন। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিকট মুখব্যাদানে সমস্ত বিশ্ব-সংসার যখন কালো কুৎসিত অভিশপ্ত হয়ে ব্যক্তির শ্বাসরুদ্ধ করে ধরে হাক্সলি তখন 'মেস্কালীন' গ্রহণ করেন ও সামান্য একটি গোলাপফুলে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ করেন। 'মেস্কালীন' সেবনের বিকল্পে হাক্সলি হিমালয়েও আসতে পারতেন। আমি তো অন্তত, যে নাকি এর আগে দশ-বিশটা ছিন্নবিচ্ছিন্ন অশ্লীল কবন্ধ নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্নতায় অতিক্রম করে গেছি, সেই হৃষিকেশে এসে পৌঁছনো থেকেই দেখছি যে, পথের নুড়িটিকে, গাছের পাতাটিকে বা ঝরণার জলধারাকে কিছুতেই আর নগণ্য এক-একটি প্রাকৃতিক ঘটনা বলে উপেক্ষা রতে পারছি নে। কেবলই মনে হচ্ছে, এদের প্রত্যেকের পিছনে কোন একটা গূঢ় সত্য লুকানো আছে, যার আভাস পাচ্ছি, পরিচয় জানছি না। প্রতিটি বস্তু প্রতিটি ঘটনা শুধু বোধের দুয়ারেই ঘন ঘন কড়া নাড়ছে না, যেন চিন্তার দিগন্তও সুদূর-প্রসারিত করে ধরছে। আর কেবল মাত্র বোধশক্তি বা চিন্তাশক্তিই নয়, দৃষ্টিশক্তিও যেন আরোপিত স্থূলতা পরিহার করে অনেকগুণ প্রখরতর হয়ে গেছে। কতটুকু সময়ই বা আমি দেবপ্রয়াগে ছিলাম! যতটুকু ছিলাম তারও অধিকাংশটুকুই কেটেছে ভাগীরথীর নির্জন তীরে আত্মচিন্তায়; কিন্তু তারই অবসরে কখন নিজের অজান্তেই পাণ্ডা ও যাত্রীকেন্দ্রিক দেবপ্রয়াগের কর্মজীবনের আগাপাশতলা দেখা হয়ে গেছে।

তাই বিনিদ্র রজনী পোহাতে না পোহাতেই যখন আমাদের শ্রীনগর ত্যাগের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল তখন মুহূর্তের জন্য শুধু একবার এ-কথা ভেবে বিমর্ষ হলাম যে, ঐতিহাসিক শ্রীনগর তো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা হল না। কিন্তু তারপরই আবার মনে হল, কীই বা দেখবার বাকী রইল? ইতিহাসের কলুষস্পর্শে বিশাল হিমালয়ের নগণ্য একটি বিন্দু বিবর্ণ হয়ে গেছে, এই না! আমি তো সমগ্র ভারতকে বিবর্ণ হয়ে যেতে দেখেছি, শ্রীনগরে তা আর নতুন করে কী দেখব? এখানেও তো সেই হিন্দী ছবির গান, সেই যন্ত্রপ্রসূত অশ্লীল পণ্যসামগ্রী আর লুপ্ত রাজধানীর কুৎসিত সব ক্ষত! এ বরং ভালই হল, রাত্রির অন্ধকারে হিমালয়ের লজ্জা অপ্রকাশিত রইল। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে শ্রীনগর ত্যাগ করলাম। বেলা তখন সাড়ে পাঁচটা।

বাস ছাড়তে মৃত্যুভয়টা এসে আবার জুটবার আগেই পর্বতে সূর্যোদয়ের নয়নাভিরাম দৃশ্যে চোখ জুড়োল। প্রথমটায় চতুর্দিক শুধু উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, অনেকটা রামকৃষ্ণদেবের হাসির মত, অনেকটা দ্বিজেন ঠাকুরের ললাটের মত। তারপর পাহাড়ের চূড়াগুলো অকস্মাৎ চকচক করে উঠল—যেন সত্যের হিরণ্ময় আবরণ উদ্ঘাটিত হল, .অবশেষে সব শুধু আলোময়। একমাত্র বাসের অভ্যন্তর ভাগটা ব্যতীত,—সেখানে তখন মৃত্যুভয়ের করাল ছায়া নেমেছে।

সবাই তাড়াতাড়ি যে যার আশ্রয় অবলম্বন করল। কেউ আসনটাকেই চেপে ধরে বসল, কেউ গান ধরল, কেউ বিড়ি ধরাল। মহিলারা কেউ কেউ ঘোমটার আড়ালে আত্মগোপন করলেন, কেউ বা সরাসরি পড়শীর গায়ে বমন শুরু করলেন। তবে মহিলাদের মধ্যে একজনই সবিশেষ কাতর হয়ে ছিলেন। যদিও তিনি বমন করেন নি তখনও। ভয়ে তাঁর চেহারা এমনই বিকৃত হয়ে গেছে যে, প্রথমটায় তাকে চিনতেই পারি নি। তিনি ট্রেনে আমাদের সহযাত্রিণী ছিলেন। ট্রেনে তিনি যখন বলেছিলেন—সব বাবা-কেদারনাথের ইচ্ছা, তখন তাঁর চেহারায় বিশ্বাসের যে বলিষ্ঠতা পরিস্ফুট দেখেছিলাম এখন আর তার কণামাত্রও অবশিষ্ট নেই। মৃত্যুভয়ে তিনি যতটা বিকৃত হয়ে গেছেন, স্বয়ং মৃত্যুও বোধ হয় ততটা সংসাধন করতে সক্ষম হত না। দেখতে দেখতে তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন অবোধ শিশুর মত। আমি চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে তাঁর সেই কালো মোটা মহিষদেহী স্বামীটিকে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু তিনি বাসে উপস্থিত ছিলেন না। অক্ষম উৎকণ্ঠায় মহিলার দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময় এতক্ষণ ধূমপানে নিবিষ্ট আমার পার্শ্বোপবিষ্ট ভদ্রলোক হঠাৎ খ্যাঁক করে উঠলেন—বাজে চেঁচাস নে কালুর মা, তোকে তো আগেই বলেছিলুম—আসিস নে, আসিস নে। এখন কাঁদলে কি আর বাস ফিরে শ্রীনগর যাবে? কথা ক'টি বলেই ভদ্রলোক আবার নিমীলিত চক্ষে ধূমপান শুরু করলেন! কয়েকটি ঘোমটাও দেখলাম ঈষৎ আন্দোলিত হয়ে ভদ্রলোকের কথায় সমর্থন জানাল। কিন্তু মহিলার ক্রন্দন তাতে থামল না, চেহারা অধিকতর বিকৃত হল। আমি তখন ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, ওঁর স্বামী ভদ্রলোকটি কোথায়?

অভিভাবকত্বটুকু ফলিয়েই ভদ্রলোক তন্মধ্যে ঝিমোতে শুরু করেছিলেন। প্রশ্নটা শুনেই আবার ছ্যাঁৎ করে উঠলেন—আরে সেই হাড় হাভাতের জন্যই তো মাগী কাঁদছে। আমরা কত বললাম, কালুর বাপ, অত খেয়ো না, খেয়ো না, পথে পেটে জায়গা রেখে খেতে হয়। না, বিকেলে শ্রীনগরে পৌঁছেই বাবু এক থালা ছাতু আর চিঁড়ে সাঁটলেন। আর যায় কোথায়! রাত্রিতে দাস্তবমি শুরু হল। তখন একে ধর রে—ওকে ধর রে, হাসপাতালে ভর্তি কর—কাল সমস্ত রাত্রি চোখের পাতা দুটো এক করতে পারি নি মশাই! ভদ্রলোক নির্বাপিত বিড়িটা আবার ধরাতে লাগলেন।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, স্বামীর অমন অবস্থা তো এঁকে আনতে গেলেন কেন?

কে এনেছে মশাই! কত করে বুঝিয়ে বললুম, স্বামীকে ছেড়ে থাকতে পারবি নে, মরণাপন্ন স্বামীকে ছেড়ে কেদারনাথে গেলেও তোর তীর্থ হবে না, কিন্তু কে কার কথা শোনে। গোঁ ধরে চুপ করে রইল, রা'টি করল না, শেষ পর্যন্ত বাসে এসে উঠল। ওর টাকায় ও আসবে, ওর স্বামীকে ও ছেড়ে আসবে তো তারপরে আর আমাদের কি করার থাকে বলুন! বিড়িটা আবার নিবে গিয়েছিল। সেটাতে বৃথাই জোরে জোরে দুটো টান দিয়ে ভদ্রলোক বিরক্তিভরে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, এসেই যখন পড়েছিস, চল্ তো রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত, সেখান থেকে না হয় ফিরতি বাসে ঘুরে আসবি শ্রীনগর।

ট্রেনে এই দারিদ্র্যে ক্লিষ্ট, রোগে শীর্ণ অশিক্ষিতা মহিলাকে দেখেছিলাম আপন বিশ্বাসে নির্ভর করে নিজের সমস্ত দীনতা অতিক্রম করতে। তারও পরে তিনি আবার আপনার চেয়েও প্রিয় যে স্বামী তাঁকে ত্যাগ করেছেন। কিসের আকর্ষণে, কার আকর্ষণে এই সর্বস্ব ত্যাগ? সে কি এতই দুষ্প্রাপ্য, এতই অপরিহার্য? তাঁর কথা অনুমান করবারও বুদ্ধি বা বিশ্বাস আমার নেই। আমি শুধু জিজ্ঞাসু নেত্রে হিমালয়ের দিকে তাকালাম।

হিমালয়ের এক দিকে যেমন সুষুপ্ত মুমূর্ষু মনকে পুনরুজ্জীবিত, পুনর্জাগ্রত করবার অসীম ক্ষমতা, অপর দিকে তেমনই চিন্তাজর্জরিত অপরাধবোধে ক্লান্ত মনকে প্রশান্তি দানেও তার জুড়ি নেই।

জানলাপথে বাইরের দিকে চাইতেই আবার সবকিছু প্রভাতের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। উপরে হিমালয় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে; নীচে অলকানন্দা তর তর বেগে বয়ে যাচ্ছে, এ তো অত্যন্ত সহজ সরল, একান্তই নিষ্কলুষ, পবিত্র। কুৎসিত মৃত্যু এখানে কোথায় ঠাঁই পাবে, এখানে তার মাথা গোঁজবার স্থান কোথায়? এত কান্নার মধ্যেও আমার তখন প্রায় হাসি আসছিল।

একজন সাধু আর তার হাসি চাপতে পারলেন না। বাসে নিজের কোণটিতে বসে থেকেই প্রাণখোলা অট্ট হাসিতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন—কেয়া, মৌতকো ডরতে হ্যায় আপ লোক? কারও কাছ থেকে প্রশ্নটির কোন জবাবের প্রতীক্ষা না করেই তিনি খল খল করে হেসে উঠলেন। যেন এত বড় হাস্যকর ঘটনা জীবনে আর কখনও দেখেন নি। কাঠগড়ার অপরাধীর মত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সবাই সাধুর দিকে চোখ ফেরাল। সাধু তখন জানলা দিয়ে মুখটা বের করে অলকানন্দার দিকে চাইলেন। তারপর যেন ভয়ানক ভয় পেয়েছেন এমনই ভাবে চোখ দুটোকে বড় বড় করে অবোধ শিশুদের ভোলাবার জন্যে হিন্দীতেই বলতে লাগলেন—তাই তো, এত উপরে উঠে এসেছি! এখন যদি পড়ে যাই তবে তো একেবারে মরে যাব—চ্‌চ্‌। ওষ্ঠ দিয়ে কপট হতাশাসূচক দুটো আনুনাসিক শব্দ করে সাধু অধিকতর ভীতিগ্রস্থতার ভান করলেন। তারপর চেহারাটাকে চট করে গুছিয়ে নিয়ে আবার বললেন—মগর, বেনারসে ঘাটের উপরেই হোঁচট খেয়ে পড়ে আমি একজনকে মরতে দেখেছিলাম। আউর, সেও একেবারে মরেছিল। যখন মরল, তখন আর না নড়ল চড়ল, না কাউকে ডেকে বলল যে, আমি মরে গেছি। দু ঘণ্টা তিন ঘণ্টা ওই ঘাটের ওপরেই পড়ে রইল। এমন মরাই মরেছিল যে, তখন আর সেদিকেও তার খেয়াল নেই। সাধুর কথায় সকলেরই মনে সুড়সুড়ি লাগছিল। আপন পেশার কথা স্মরণ করেই হয়তো সাধু এইবার রসিকতা ছেড়ে গম্ভীর কণ্ঠে মৃত্যু সম্পর্কে একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করলেন—মৃত্যুভয়টা সম্পূর্ণ অর্থহীন। কেন না, মৃত্যু নাকি যখন আসবার ঠিক তখনই আসে। এক মুহূর্তও আগে বা পরে আসে না। লোহার ঘরেও সাপ ঢুকে কামড়ে মানুষ

যায়, আবার সাপুড়ের ছেলেও বেঁচে থেকে বড় হয়ে ওঠে। তবে মৃত্যুকে ভয় পেয়ে কি লাভ? তা ছাড়া মৃত্যু তো খারাপ কিছু নয়; মৃত্যু না হলে তাঁর সঙ্গে এক হব কেমন করে? এই কুৎসিত দেহ নিয়ে কি তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়া যায়? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

দেখলাম সবাই নিবিষ্ট চিত্তে সাধুর কথা শুনছে। মৃত্যুভয়ের ছায়াটাও নেমে গেছে অনেকের মুখ থেকে। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, সাধুর একটি কথাও লজিকের ধোপে টিকবে না, কিন্তু তবু সাধুর কথার প্রতিবাদ করলে তা অধিকতর অশোভন অশ্লীল হবে বুঝে অগত্যা চুপ করে শুনে যাচ্ছিলাম। তার পরে কখন দেখি, সাধুর কথাগুলো আর অর্থহীন যুক্তিহীন বলে মনে হচ্ছে না। দেখি, হিমালয়ের সঙ্গে অলকানন্দার সঙ্গে ওঁর কথাগুলো ঠিক সুরে সুরে মিলে যাচ্ছে। আমার মনে হল, সব সত্য সর্বত্র সত্য নয়। আমাদের সমতলে যা নিছক ছেলেমানুষি বলে মনে হবে এখানে তাই পরম সত্য বলে প্রতিভাত হয়। এখানে সব সময় দুয়ে দুয়ে চার হয় না।

বেলা আটটায় বাস রুদ্রপ্রয়াগে গিয়ে পৌঁছল। রুদ্রপ্রয়াগ আজও রুদ্রপ্রয়াগ নামেই খ্যাত, তবে অদূর-ভবিষ্যতে রুদ্র-টার্মিনাস নামে আখ্যাত হলে আদৌ বিস্মিত হব না। মন্দাকিনীধারা এই স্থানে অলকানন্দাধারায় মিলিত হয়েছে, কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা, বাসরুট এখান থেকে পিপুলকোটি পর্যন্ত চলে গেছে। কঠিন কেদার শিকায় তুলে অনেক যাত্রী এখান থেকে বাসে সোজা পিপুলকোটি পর্যন্ত চলে যায়, অপেক্ষাকৃত সহজতীর্থ বদ্রীনাথের উদ্দেশ্যে। তুঙ্গনাথের কুখ্যাত চড়াই পরিহার করে কেদারনাথ থেকেও অনেক যাত্রী আবার রুদ্রপ্রয়াগে ফিরে এসে বাস ধরে বদ্রীনাথ যায়। রুদ্রপ্রয়াগের যে অংশটা অলকানন্দার এই পাড়ে, বাসই তার কর্মজীবনের কেন্দ্র। বাস থেকে অবতরণ করে দেখি, রুদ্রপ্রয়াগের ব্যস্ততার অন্ত নেই। তারপর আমাদের চা পান শেষ হতে হতে বাসগুলো যখন আবার পিপুলকোটির পথে রওয়ানা হয়ে গেল তখন দেখি রুদ্রপ্রয়াগ হিমালয়ের গায়ে একটি সুন্দর শান্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ বসতি মাত্র।

সামান্য একটু উৎরাই নেমে অতিনম্র একটি ঝুলা পেরিয়ে অলকানন্দা অতিক্রম করতে হয়, অলকানন্দার ভীমগর্জনের তলায় বাস-

টার্মিনাসের কুৎসিত কোলাহল তলিয়ে গেল। ঝুলার নীচে অলকানন্দার তীর ঘেঁষে পাহাড়ের বিলম্বিত ছায়ায় বসে এক পাল পাহাড়ী ভেড়া আপন মনে জাবর কাটছে। অকস্মাৎ সমস্ত কিছু শান্ত স্নিগ্ধ সুসমঞ্জস। সামান্য একটা ঝুলা পেরিয়ে মুহূর্তমধ্যে এক সভ্যতা থেকে ভিন্ন সভ্যতায় স্থানান্তরিত হলাম। নূতন তীরে পা দিয়েই বুঝলাম, এখানে আজও টায়ারের দাগ পড়ে নি। পেট্রোলের বিষাক্তগন্ধে বায়ু কলুষিত হয় নি।

ঝুলা পেরিয়ে বাঁদিকে সঙ্গমে যাবার চড়াই-পথ উঠে গেছে। ঝুলা থেকেই সঙ্গমের দেবমন্দির ও তার আশেপাশের ছোট ছোট চটিগুলো চোখে পড়ে। পংক্তি বেঁধে পায়ে পায়ে সবাই চড়াই উঠতে শুরু করলাম। পথের শেষ পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই চটিওয়ালারা এসে অভ্যর্থনা জানাল, সেই অভ্যর্থনা প্রাণান্তকর। দলের অন্য সবাইকে ব্যূহমধ্যে ছেড়ে পাশ কাটিয়ে আমি তড়তড় বেগে উঠে সঙ্গমের সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়ালাম। সামনেই অজস্র সিঁড়ি নেমে গেছে সঙ্গমের মুখে। রুদ্রপ্রয়াগ দেখবার ওইটেই প্রকৃষ্ট স্থান।

রুদ্রপ্রয়াগের অবয়বে রুদ্রভাবের অভাব নেই। আশেপাশের পর্বতগুলো বৃক্ষপাদপবিরল, রুক্ষ, পাঁশুটেবর্ণ, দূর পাহাড়ের হরিদাভাসের পটভূমিতে যেন আরও বেশী রুক্ষ বলে মনে হয়। রৌদ্রকিরণে শিলাময় পর্বতগুলো তন্মধ্যেই তেতে উঠেছে। দেখতে দেখতে মনে হল, আজ থেকে অনেক কাল আগে, অলকানন্দার অপর পারে যখন পর্যন্ত বাস এসে পৌঁছয় নি, যাত্রীর সংখ্যা যখন ছিল নগণ্য, তখন স্থানটা সত্যি সত্যি রুদ্রপ্রয়াগই ছিল। শিবের যোগ্য শ্মশান, শিবের যোগ্য পটভূমিকা, সেই নিথর নিঃশব্দ রুক্ষতায় মহাকালও নিশ্চয়ই অকস্মাৎ থমকে দাঁড়াতেন।

কিন্তু আজকের ব্যস্ত রুদ্রপ্রয়াগে আমার মতো ভাববিলাসীর পক্ষেও অধিক কাল দাঁড়িয়ে প্রকৃতির এই কঠোর সৌন্দর্য উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। প্রয়াগে স্নানের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই যাত্রীরা সঙ্গমে নামতে শুরু করেছেন। আমিও তাঁদের অনুসরণ করলাম। সূর্যতাপে তপ্ত সিঁড়িগুলো থেকে যেন আগুন বেরুচ্ছে, মনে হল পা বুঝি পুড়ে যাবে। ওদিকে সিঁড়িও যেন অশেষ; সেও আবার এতই খাড়াই যে তাড়াতাড়ি নামে কার সাধ্য! কী আর করব, পায়ের মায়া ছেড়ে

রেলিং ধরে আস্তে আস্তেই নামতে থাকলাম। অথচ যে উত্তাপে আমি পা রাখতে পারছিলাম না, সেই উত্তপ্ত সিঁড়ির উপরই বসে বসে বিশ্রাম নিয়ে বুড়ি যাত্রীরা ধীরে ধীরে নেমে আসছে। একেই বোধ হয় আগেকার দিনে অগ্নিপরীক্ষা বলত। কিন্তু সে পরীক্ষায়ও ফাঁকি দিয়ে অবশেষে যখন সঙ্গমে এসে অলকানন্দার হিমশীতল ধারাটিতে পা ডুবিয়ে দিলাম তখন মুহূর্তের জন্যে মনে হল, সেই পরীক্ষার সুফল থেকে তো বঞ্চিত হই নি আদৌ।

রুদ্রের বাম দিক থেকে শুভ্রবসনা অলকানন্দা ও ডান দিক থেকে নীলাম্বরী মন্দাকিনী এসে সামনেই পরস্পরকে আঁকড়ে ধরছে। প্রথমা যেন কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠা, যৌবন ভারে নতা। দ্বিতীয়া যেন কিশোরী, তন্বীদেহে নৃত্যরতা। দুজনেই যেন স্বামী-সোহাগিনী দুই সতীন। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যেন যতটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ততটা সৌহার্দ্য। উভয়ের রোষ-রাগসঞ্জাত তর্জনে গর্জনে চতুর্দিক মুখর, সে মুখরতা আমাকে সমুদ্রগর্জনের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। সমুদ্রগর্জনের প্রসার এতে নেই, কিন্তু তার গভীরতা আছে পুরোমাত্রায়; আর তা ছাড়া খুব কান খাড়া করলে শোনা যায়, আছে একটা অব্যক্ত কুলুকুলুধ্বনি, কোরাসের মাঝে যেন নিম্নতম গ্রামে সোলো সেতার বাজছে। দেবপ্রয়াগে আমি দর্শন নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম, প্রয়াগ আর দেখা হয় নি। এখন মুগ্ধচেতনায় রুদ্রপ্রয়াগের শেষতম সিঁড়িটিতে বসে সব কয়টা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সঙ্গম দেখবার প্রয়াস পেলাম। প্রয়াগের ভাষা বুঝবার চেষ্টা করলাম।

পার্বত্য প্রয়াগ দেখবার সৌভাগ্য যাঁদের আজও হয় নি, প্রয়াগ বললেই যাঁদের মনের চোখের সামনে খাল ও বিলের সংযোগস্থল বা ঐ ধরণের কোন চিত্র ভেসে ওঠে, তাঁরা হয়তো প্রয়াগের 'পরে আমার ব্যক্তিত্বারোপের, এমন কি তাঁর সর্বনামের উপরও চন্দ্র বিন্দু বসাবার আতিশয্য দেখে ওষ্টকোণ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করবেন। তাঁদের সংশয় নিরসন করবার সাধ্য আমার নেই। বাসনাও সামান্য। ভাবগ্রাহী মনে প্রয়াগ কি প্রচণ্ড মিশ্র আবেগের সঞ্চার করে তার সজীব বিশদ রসাল বিবরণ দেবার ভাষাও নেই আমার। প্রয়াগের প্রতিনিধিত্ব করবার সামর্থ্য ভাবারও আছে

কিনা সন্দেহ। তা ছাড়া প্রয়াগের ভাষা আজ পর্যন্ত কেউ পুরোপুরি বুঝতে পেরেছে কি? আর যদি কেউ বুঝতে পেরেও থাকে তবে তার পরে কি তিনি সে কথা প্রতিবেদনের প্রয়োজন বোধ করেছেন? এই প্রয়াগ সম্পূর্ণ একক, অতুলনীয়, অবর্ণনীয়। এর ভাষা এর সুর, এর নিজেরই ভাষা নিজেরই সুর। সে ভাষা শুনতে হলে তার পায়ে বসেই শুনতে হবে, পাশে বসেই বুঝতে হবে। সমগ্র চেতনা, সর্বস্ব সমর্পণ না করলে তার সুরের সামগ্রিক উপলব্ধি সম্ভবই নয়। সর্বস্ব বলতে যার আছে কেবল নিঃস্বতা সেই দীনের অমন চেষ্টা না করাই ভাল। যে কথা আমি অর্ধেক শুনেছি, তার চাইতেও কম বুঝেছি, সে সুরের অস্থায়ীটুকু অনুসরণ করবার সাধ্যও আমার ছিল না। কিন্তু তাতেই, ওই অনর্জিত ক্ষুদকুড়োটুকুতেই আমার দীন পাত্র পূর্ণ হয়ে গেছে, শোভাযাত্রায় সেই পূর্ণতার প্রদর্শন সম্ভব নয় জেনেও কোন অনুশোচনা নেই। আর আমার ওই ব্যক্তিত্বারোপ, তাও অনভিজ্ঞ পাঠকের জন্য প্রয়াগ-বটিকা নয়, তা একান্তই স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের অনভিপ্রেত আত্মপ্রকাশ। সদা-চঞ্চল, সদা-উজ্জ্বল, কল্লোলময়ী নদী যে নির্জীব একটি প্রাকৃতিক বস্তুমাত্র, প্রয়াগের সামনে সে ভৌগোলিক সত্য স্মরণ রাখতে হলে নিজেকে জড় হতে হয়।

আর সেই প্রয়াগের কি অদমনীয়, অপ্রতিরোধ্য ও অনতিক্রম্য স্রোত! প্রয়াগে অবগাহনের কথা চিন্তা করাই বাতুলতা। যাত্রীরা কেউ তাই পাড়ে বসেই লোটা করে জল তুলে স্নান সারছে; কেউ বা অধিকতর পুণ্যের আশায় পাড়ে বাঁধা শিকল ধরেই পাথরের আড়ালের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে কাকস্নান করে নিচ্ছে। মানুষ যে স্বভাবতই কত অসহায় কত ক্ষুদ্র কত নগণ্য ও কত দীন, প্রয়াগের স্নানার্থীদের দেখলে তা বুঝতে বাকী থাকে না। আমি, অতঃপর, একটি সিগারেট ধরালাম। একবার হাই তুললাম।

কি, ধ্যান ভাঙল? পেছন থেকে শ্রীনগরের সেই নিঃসঙ্গ ভদ্রলোক নেমে এলেন।

ধ্যান! ধ্যানে বসলুম কখন যে ভাঙবে? আর অত পুণ্যই বা কোথায় যে ধ্যানে বসব?

তবে অতক্ষণ বসে বসে ভাবছিলেন কী?

প্রথমে আমি অনির্দিষ্ট দৃষ্টিতে একবার পাদপহীন পর্বত ও প্রয়াগের দিকে তাকালাম। তারপর বললাম, ভাবছিলাম কি প্রচণ্ড স্রোত এই প্রয়াগের। সঙ্গমের মধ্যেকার ওই স্থাণু প্রস্তরগুলোর দিকে তাকালেই সে গতিবেগ কতকটা অনুমান করা যায়। বোঝা যায় যে মানুষ আসলে কত স্থিতিশীল, তার প্রগতি কি শ্লথ!

আপনার চাইতে একটু উপরে বসে আপনি যা লক্ষ্য করছিলেন আমি ঠিক তার উল্টো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছিলাম। আমি লক্ষ্য করছিলাম এই দ্রুতগতি স্রোতের মাঝে পাথরগুলো কেমন স্থির হয়ে আছে। কি বিস্ময়কর অনড়তা! অথচ মানুষ প্রতি মুহূর্তে মরছে।

এমনই হয়। বস্তুকে বস্তু ভাবে দেখবার ক্ষমতা আছে কার? আমরা অক্ষমরা তাই আমাদের কল্পনার ক্ষুদ্র পরিসরে বস্তুকে সংক্ষিপ্ত করে তবেই তা দেখি। বস্তুর মহিমা এতে লঘু হয়, আমাদের আত্ম-কেন্দ্রিকতার হিরণ্ময় আবরণ এতে ঘোচে না। একই জগতে এই কারণেই এত অজস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ জগৎ। নীরবে কিছুক্ষণ সিগারেট টানলাম। কিন্তু দ্বিতীয় কারও উপস্থিতিতে চিন্তা সচ্ছন্দগতিতে বইতে পারে না, তাই আবার জিজ্ঞেস করলাম, আপনার যাত্রার গূঢ় কারণটা এইবার ব্যক্ত করা সম্ভব হবে কি?

ভদ্রলোক দৃশ্যতই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন, না না, সে কারণে তো গূঢ় কিছু নেই! সে কথা আপনাকে কে বলল? শ্রীনগরে কাল আমি আপনাকে মনের কথাটা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারি নি। বোঝেন তো কৃত্রিম কথা সাজিয়ে গুছিয়ে সুন্দর সুশ্রাব্য করে বলতে বিশেষ অসুবিধা নেই, কিন্তু মনের কথাটি বলতে গেলেই সমস্ত যেন জট পাকিয়ে যায়। দ্বিতীয় কেউ তো দূরের কথা, নিজের কথা তখন নিজেই সঠিক বুঝে উঠতে পারি না। সমগোত্রীয় ছাড়া অন্য কেউ তখন সে কথা শুনে ভুল বোঝে, রাগ করে, বিরক্ত হয়।—নির্বাপিতপ্রায় সিগারেটে ভদ্রলোক পর পর কয়েকটা টান দিলেন।

প্রয়াগের প্রভাবে আমি এমনিতেই বিনম্র বোধ করছিলাম। তার উপর নাকে অভ্যস্ত পোড়া পেট্রোলের গন্ধ নেই, কানে চিরসাথী যন্ত্রের আর্তনাদ নেই, চোখের সামনে শুধু বিরাট বিরাট শিলাময় ন্যাড়া পর্বত। ভদ্রলোকের অসহায়তা আমার অন্তর স্পর্শ করল। ভাবাবেগ

গোপনের চেষ্টামাত্র না করে বললাম, না না, আমাকেও ওই অন্ত কেউর দলে ফেলবেন না। আপনিও আমাকে ভুল বুঝবেন না। আসলে আমরা—। আপনি বরং আপনার উদ্দেশ্যের কথাই বলুন।

বলব তো, কিন্তু বুঝিয়ে বলতে পারব কি? উদ্দেশ্যটা কি বাক্যগ্রাহ্য হবে? তবে আমি চেষ্টা করব বোঝাতে; আপনাকে আপনার সমবেদনা দিয়ে বুঝে নিতে হবে।

আমিও চেষ্টা করব।

ভদ্রলোক তখন পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে আমাকে একটা দিলেন ও নিজে একটা ধরালেন। তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, উদ্দেশ্যটা বোঝাতে হলে অনেক আগে থেকে শুরু করতে হয়, সেই প্রথম জ্ঞানোন্মেষের কাল থেকে, বস্তুমাত্রেরই অনিত্যতা যেদিন থেকে চোখে পড়ল সেদিন থেকে। কিন্তু অত সময়ও হাতে নেই, আর তা ছাড়া সেই দীর্ঘ কাহিনী শোনাও আপনার ধৈর্যে কুলোবে না, এবং সেই কাহিনীর খুঁটিনাটি আজ আমার স্মরণও নেই পুরোপুরি। অতএব যদি সংক্ষেপে বলি যে, আমি এসেছিলাম এমন একটা কিছুর সন্ধানে যা অজরামর। যার ক্ষয় নেই লয় নেই, শুরু নেই শেষ নেই, সৃষ্টি নেই বিনাশ নেই; যা অক্ষয় অমর, যা কালেরও উর্ধ্বে। সূর্যমুখীর মত সূর্যই যার একমাত্র লক্ষ্য, কিন্তু সূর্যাস্তে যে ঝরে পড়ে না; ব্যক্তির মত কাল ফুরোলে যে ভস্মীভূত হয় না; আদর্শের মত হুজুগ ফুরোলে যার গায়ে কালি পড়ে না। আমার জিজ্ঞাসা ছিল, এমন কিছু কি আছে? আমার অনুসন্ধিৎসা ছিল, সে কি মানুষের লভ্য? এই প্রশ্ন দুটোর জন্যেই হরিদ্বার থেকে আমি আর কলকাতায় ফিরে যেতে পারি নি; এ পথে চলে এসেছি।

আমি নিঃশব্দে বসে রইলাম। এই পার্বত্য পথে বাস-ভ্রমণের আগে পর্যন্ত মৃত্যুর কথা আমি কখনও ভাবি নি। এখনও পর্যন্ত মৃত্যু অপেক্ষা জন্মই আমার আরও অনেক কাছে। কিন্তু তবুও ভদ্রলোকের প্রশ্নের গুরুত্ব অস্বীকার করতে পারলাম না। হতবাক্ হয়ে বসে রইলাম।

ওই প্রস্তর দুটোকে দেখলেই মনে হয় ওরা অজরামর। দেখছেন না এমন উচ্ছলতার মধ্যেও কেমন অটল থেকে অনায়াসে জলধারাকে পাশ কাটিয়ে দিচ্ছে! কিন্তু এমন একটা সূত্র কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না

যা অবলম্বন করে ওদের সঙ্গে নিজেকে এক বলে ভাবতে পারি। কে জানে, হয়তো আরও উপরে উঠলে পারব।

এর পরে আর কিছু যোগ করবার থাকে না। সতীর্থতার ঐখানেই ইতি, বাক্য এর পরেই নির্বাক। চুপ করে রইলাম। হঠাৎ মনে হল, কলকাতায় নেমে ভদ্রলোককে যদি উপরি-উক্ত কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায় তা হ'লে তিনি তখন এই বর্তমান অবস্থাটিকে কী নামে অভিহিত করবেন? তন্ময়তা, না, উন্মত্ততা? আমি অন্তত প্রয়াগের পারে প্রথমকেই সমর্থন করতাম, হাওড়ায় দ্বিতীয়কে। আগেই কি বলি নি যে, স্থানভেদে সত্যও মিথ্যা হয় এবং মিথ্যাও সত্য হয়!

কথায় কথায় ভদ্রলোক আমাকে অত্যন্ত গভীর জলে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। জন্ম-মৃত্যু, গতি-স্থিতি—কোনটিই আর রবিবাসরীয় বিতর্ক সভার নিরীহ বিষয়মাত্র নয়—প্রত্যেকটিই সাক্ষাৎ সমস্যা; যে সকল সমস্যার সমাধান ব্যতিরেকে জীবন ধারণই অর্থহীন, বেঁচে থাকাই বাতুলতা! সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি বোধ করছিলাম। অন্ধকার প্রান্তর মধ্যে একক যাত্রীর মত নিঃসঙ্গ, অসহায়। অকস্মাৎ নীলমণি আবির্ভূত হল ধূমকেতুর মত।—

আরে, আসুন মশাই, আসুন! বসে বসে খুব তো সিগারেট ফুঁকছেন, অথচ কী জিনিষ যে হারাচ্ছেন তা নিজেই জানেন না। আসুন, তাড়াতাড়ি আসুন!—নীলমণি পিছন থেকে হাত ধরে টান মারল।

নিষ্ক্রমণের একটি ছিদ্র পেয়ে আমিও আর মুহূর্তমাত্র দ্বিধা করলাম না, সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, কী এমন মহামূল্য জিনিষ হারিয়েছি যে তার স্বরূপই জানি না?

হায়, ভাষায় কি আর ও-জিনিষের বর্ণনা সম্ভব! আসুন এসে একবার দেখুন, ওই পোড়া চোখ দুটো সার্থক হয়ে যাবে।

তবে তো উঠতেই হচ্ছে! অসহায় চোখে একবার ভদ্রলোকের দিকে চাইলাম, নীলমণি হিড়হিড় করে আমায় টেনে নিয়ে চলল।

টানতে টানতে অলকানন্দা থেকে একেবারে মন্দাকিনীর পারে নিয়ে এল। সামনের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে বলল, দেখুন।

দেখলাম। যাত্রীরা স্নান করছে। তবে অলকানন্দা অপেক্ষা মন্দাকিনীর গতিবেগ অপেক্ষাকৃত নম্র বলে যাত্রী অপেক্ষা এখানে যাত্রিণীর সংখ্যাই বেশী। এঁদের মধ্যে আবার যাঁরা বয়সে একটু তন্বী, তাঁদের যেন আর আনন্দের অন্ত নেই। কেউ বা ঘটিতে করে, কেউ বা গামছা ভিজিয়ে নিজের গায়ে একটু করে হিমশীতল জল ঢালছে, "আর খলখল করে হেসে উঠছে শীতে ও খুশিতে। গাত্রাবরণ যথাযথ আছে কি না বা কেউ কোথা থেকে কিছু দেখছে কি না সে দিকে নজর দেবার অবকাশ নেই কারও। কিন্তু এই দৃশ্যের উদার আনন্দ দেখবার জন্যে নীলমণি আমায় সাধ করে ডেকে আনে নি। অঙ্গুলি নির্দেশ করে ও আমায় বিশেষভাবে এক অর্ধ-অনাবৃত যুবতীকে দেখিয়ে দিল। দেখেই চিনলাম যে, এ সেই প্রগল্‌ভা, যে আমাদের সঙ্গে এক বাসে হৃষিকেশ থেকে দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত এসেছিল, এবং ওই পলকেই বুঝলাম যে মহিলা তাঁর নগ্নতা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করছেন। দেখবার এবং ডেকে দেখাবার উপযুক্ত দৃশ্য এবং সময়ই বটে! ঘৃণায় এবং গ্লানিতে আমার সমস্ত শরীর রি-রি করে উঠল। কিন্তু তবু নীলমণির গূঢ় উদ্দেশ্যটা যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারি নি এমনি নির্বোধের মত একটু বিস্ময়ের ভান করে বললাম, বারে এতে আবার ডেকে দেখাবার কী আছে! সব তীর্থেই তো এমন দৃশ্য ভুরি ভুরি দেখা যায়—পুরীর সমুদ্র বা কাশীর গঙ্গায় দেখেন নি? তীর্থে লজ্জা ঘৃণা রাখতে নেই।

নির্লিপ্তভাবে আবার সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে লাগলাম। আমার উদ্ধত ঔদাসীন্যে নীলমণিও একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। আমাকে অনুসরণ করতে করতে অগোছালভাবে বলল, তা নয় রাখতে নেই, লজ্জা-সরম না হয় শিকেয়ই তোলা রইল, কিন্তু তাই বলে কি একটু ভব্যতাও থাকবে না? আপনি যাই বলুন, মেয়েটি আসলে বেহায়া।

হ্যাঁ, ওইটে যেমন বেহায়াপনা হতে পারে, তেমনি সরলতাও হতে পারে। হঠাৎ এত উপরে উঠে হয়তো মহিলার নিজের

লজ্জা-ঘৃণায়-ঘেরা সঙ্কীর্ণ জগৎটা চুরমার হয়ে গেছে।—কিন্তু অত সহজে যেন গ্লানি কাটছিল না, মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে তাই আবার বললাম, আমাদের সে আশঙ্কা নেই, কি বলেন!

বলা বাহুল্য, শেষ বাক্যটা নীলমণির সাগ্রহ সমর্থনের প্রত্যাশায় বলা হয় নি। নীলমণি তা করলও না। ও আর কোন কথাই বলল না, বোধ হয় নিজের কথা ভাবতে লাগল। আমিও ওর কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম যে, কী বিস্ময়কর প্রতিরোধক্ষমতা! ভাবছিলাম নাগরিক সভ্যতার কী গভীর বিষক্রিয়া, আর তা কী সাংঘাতিক অস্খালনীয়! স্বয়ং হিমালয় তার উপর সামান্যতম দাগটুকু কাটতে সক্ষম হল না; হিমালয়ের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব কেমন নির্বিঘ্নে পাশ কাটিয়ে গেল! সমুদ্রতল থেকে দু হাজার ফুট উপরে উঠেও, প্রায় এক শত মাইল পুণ্যাত্মাদের পূত পথ অতিক্রমের পরেও সেই ধোঁয়া, সেই কালি, সেই নোংরামি! এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টা তা হলে অবিনশ্বর, কার মাথা বেশী উঁচু—হিমালয়ের, না, হাওড়ার মিলের চিমনির।

এই বিমর্ষকর চিন্তা নিয়েই চটিতে গিয়ে পৌঁছলাম। সেইখানে ইতিমধ্যে তারাদা ও ননী শুধু মালপত্র খুলে বিছানা পেতে দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি তৎপরতার সঙ্গে তুমুল ঝগড়াও বাধিয়ে দিয়েছে। মুহূর্তকালের মধ্যেই বুঝলাম যে, বিবাদের বিষয় সামান্য এক টুকরো সাবান। কে দোষী ও কে নির্দোষ তা তদন্ত করবার ভার নীলমণির উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজের গামছাখানা নিয়ে সোজা প্রয়াগে চলে গেলাম স্নান করতে। স্নান সেরে আসতে চটিওয়ালা পূর্বনির্দেশ মত ডাল ভাত আলুর তরকারি ও আলুভাজা পরিবেশন করে গেল। খাওয়া-দাওয়ার পর আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। আপাদ-মস্তকই ঢেকে শুতে হল, কেন না, প্রথমত বিরক্তিকর মাছির উৎপাত, আর দ্বিতীয়ত বিভ্রান্তিকর মানুষের অত্যাচার।

কিন্তু চোখের পাতা দুটো একত্র হবার আগেই একটা চিন্তায় চোখ বিস্ফারিত হল। আচ্ছা, অতটা উৎসাহের সঙ্গে ডেকে আমাকে ওই দৃশ্য দেখাবার হীন ঔদ্ধত্য নীলমণির হল কেমন করে! আমার চোখে কি এখনও সেই পুরনো প্রলুব্ধ দৃষ্টিটা আছে, আমার আচরণে কি এখনও

সেই উঞ্ছবৃত্তি প্রকট ? ও এই কথা ভাবতে পারল কেমন করে যে, আমাদের দলের মধ্যে একমাত্র আমিই ওই দৃশ্যটা সোৎসাহে উপভোগ করব ! তখন একবার নিজের কথা ভাল করে ভেবে দেখা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ল। ভেবে দেখি গত কয়েক দিন কোন প্রকার অশ্লীল চিন্তা মনে আসে নি বটে, কিন্তু তাই বলে ভিতরকার সঞ্চিত অশ্লীলতা একটুও কমে নি। গত কয়েক দিন মাঝে মাঝে উচ্চতর স্তরে হয়তো বিচরণ করেছি কিন্তু কলকাতা থেকে যে আমি রওয়ানা হয়েছিলাম, রুদ্রপ্রয়াগেও সেই আমিই এসে পৌঁছেছি। এই আবিষ্কারের পর যখন অবশ্যম্ভাবী-রূপে হতাশায় নিমজ্জিত হতে যাব তখন হঠাৎ আবার অপর একটা চিন্তা খেলে গেল। ওই ভদ্রলোকও তো তাঁর মনের দরজা আমি বই অন্য কারও কাছে উন্মুক্ত করেন নি ! তিনিও নিশ্চয় ভেবে থাকবেন যে, তাঁর ঐশী অতৃপ্তিতে আমিই তাঁর সতীর্থ। এই দ্বিতীয় চিন্তাটির পর একটু নিদ্রাবেশ এল। ঘুমিয়ে পড়বার পূর্ব-মুহূর্তে একবার শুধু একটি প্রশ্ন মনে জাগল, তা হলে এই আমি কে এবং কী ? আমার ঠিক সেই মুহূর্তের জবাব সম্ভবত ছিল শুধু নাসিকাগর্জন।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম স্মরণ নেই, হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা বিস্ফোরণে হিমালয় কেঁপে উঠল। আমি চমকে উঠে বসলাম, কিন্তু প্রথমটায় বুঝে উঠতে পারলাম না যে, কী ঘটেছে ! কাউকে প্রশ্ন করবার আগেই আবার একটা বিস্ফোরণ ঘটল। ঠিক এমন সময় সুশীল তাঁর রুদ্রপ্রয়াগের পুণ্য পকেটস্থ করে, মানে রুদ্রপ্রয়াগের আলোকচিত্র গ্রহণ সম্পন্ন করে ঘামতে ঘামতে এসে ঘরে ঢুকল। ওর চেহারায় কেমন যেন একটা বিজয়গর্বের ছটা। আমার বিস্মিত দৃষ্টি খেয়াল করেই হয়তো ও বলল, কি, বুঝতে পেরেছেন কিসের শব্দ ?

সে না পেরে আর রেহাই কোথায় ; কিন্তু এখানে হঠাৎ এত ডিটোনেটর ফাটাবার কারণ কী ? হিমালয় ভেঙে পাথর নিয়ে কি সমতলের রাস্তা তৈরী হবে নাকি ? কিন্তু তাতে তো ট্রান্সপোর্ট কষ্ট অনেক বেশী পড়ে যাবে। পরতায় পোষাবে না।

আরে, না মশাই, পথ তৈরী হচ্ছে হিমালয়েরই। আর দু বছরের মধ্যে এখান থেকে গুপ্তকাশী পর্যন্ত বাস পথ হয়ে যাবে। হৃষিকেশ থেকে তখন টেনে গুপ্তকাশী পর্যন্ত চলে যাও—তারপর দু দিনে মেরে দাও

কঠিন কেদারনাথ। কোন ঝঞ্ঝাটই আর থাকবে না তখন।

সুশীলের কথা শুনে মনে হল পথকষ্টের ভবিষ্যৎ নিষ্কৃতিটা ও এখনই অগ্রিম উপভোগ করে নিল।

দুশ্চিন্তার কথাই বটে।

দুশ্চিন্তা, বলেন কী! ভেবে দেখুন তো, এই রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত যদি আমাদের হেঁটে আসতে হত তবে কি আর এখন প্রাণ থাকত কারও শরীরে? এমন ভাবে হাসতে হাসতে কি কথা বলা যেত? বাবাঃ, গায়ে জ্বর আসে আগেকার পথকষ্টের কথা ভাবলে!

সুশীলের এই স্থূল আশঙ্কা ও স্থূলতর আনন্দের কোন জবাব নেই। আমি বিমর্ষ হয়ে বসে রইলাম। যেই বস্তুকেন্দ্রিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিজয়-হুঙ্কারে রুদ্রপ্রয়াগের নিথর নিস্তব্ধতা আজ ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছে, সেই সভ্যতায় সুশীলের কোন দান নেই। বরং অজস্র সুশীলের মৃতদেহ অতিক্রম করেই সে সর্বগ্রাসী সভ্যতা আজ এতদূর এসে পৌঁছেছে! তবু কেন সুশীল এত উৎফুল্ল হয়? হয়তো হতে হয় বলেই। তাছাড়া অপরাপর যুক্তিরও অভাব নেই। সত্যিই তো, পথ অধিকতর সুগম হলে এই পুণ্যতীর্থ আপামর সকলের পক্ষেই দর্শন করা সম্ভব হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকতর সাচ্ছন্দ্য—অমন সম্ভাবনায় বিমর্ষতার অবকাশ কোথায়! জানি, সব যুক্তি জানি, কিন্তু যুক্তিতে কবে কোন ব্যথার নিরসন হয়েছে! আমি অথর্ব হয়ে বসে রইলাম।

আমার সেই কলকাতার বন্ধুটির কথা মনে পড়ল যে বলেছিল, আচ্ছা এমন দুর্গম স্থানে তীর্থ স্থাপন কি সম্পূর্ণ অর্থহীন নয়? মিছিমিছি নিরীহ ভক্তদের কষ্ট দিয়ে কী লাভ? লাভ যে সঠিক কী তা আগেও যেমন জানতাম না, সেদিনও তেমনি তা অজানা ছিল। কিন্তু পূর্বেও এবং সেদিনও আমার এই বিশ্বাসটা কেন জানি অক্ষুণ্ণ রইল যে, পথকষ্ট এই তীর্থের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই পথকষ্ট কমে গেলে তাতে শুধু তীর্থের মাহাত্ম্যই কমবে না, ভক্তের পুরস্কারও শীর্ণ হবে।

ওদিকে বিস্ফোরণ অবিরত চলতেই থাকল, প্রতি দু-তিন মিনিট অন্তর একটা করে প্রচণ্ড শব্দ হয়, আর হিমালয় থরথর করে কেঁপে ওঠে। মনে হয় যন্ত্রের দৌরাত্ম্যে বুঝি বা হিমালয়ই ভেঙে পড়ে! শুনতে শুনতে এবং কাঁপতে কাঁপতে অকস্মাৎ নিজেকে ভয়ানক অসহায় মনে হল। মনে

হল স্পষ্ট দেখতে পেলাম যে বাইরে থেকে কে এসে যেন আমার পায়ের তলার মাটি সরিয়ে নিচ্ছে, মাথার উপরের আকাশ ফুটো করে দিচ্ছে। আরও বুঝলাম, এই হন্তারককে আমিই পরোক্ষ সমর্থনে উৎসাহিত করে চলেছি। কী আর করব, আমি যে হতচকিত!

যাক, ঘুম ভেঙেছে তা হলে আপনার! বাবাঃ, কি ঘুমই ঘুমিয়ে ছিলেন মশাই! বলুন তো আমি কী নিয়ে এলুম?—ঘর্মাক্ত কলেবরে ঘরে ঢুকেই তারাদা তাঁর চিরাচরিত প্রথায় আমার দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। সাত রাজার ধন কোন্ মানিকটি যে তিনি আহরণ করে নিয়ে এলেন তা আমি জানতাম না, তা অনুমান করবারও সামান্যতম কৌতূহল আমার ছিল না। শুধু বিরক্তিটুকু গোপন করে স্রেফ সাদা চোখে তাঁর দিকে চাইলুম। দয়াপরবশ হয়ে তিনি তখন বেচারাকে কৃতার্থ করলেন; পকেট থেকে ছোট একটি শিশি বের করে আমাকে দেখিয়ে বললেন, প্রয়াগের জল নিয়ে এলাম।

তারাদার চোখে তখন যে পরিতৃপ্তি দেখেছিলাম অমন পরিতৃপ্তি আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত কিন্তু আয়ত্তাতীত। ক্ষণিক ঈর্ষার পরে আমার মনে হল, তারাদা নিশ্চয়ই ভাবছেন যে ওই জলটুকুতে তিনি রুদ্রপ্রয়াগকে বন্দী করে ফেলেছেন, সঙ্গে করে সমতলেও নিয়ে যেতে পারবেন। ওই জলের সাক্ষ্যেই রুদ্রপ্রয়াগে তাঁর আজকের উপস্থিতিটুকু অক্ষয় হয়ে থাকবে। কী অবোধ! রুদ্রপ্রয়াগের রুদ্রত্ব, সঙ্গমের গর্জন, প্রথমের স্থিতি ও দ্বিতীয়ের গতি এবং পরিবেশের এই উদার নিথর নৈঃশব্দ্য—শিশির ভিতরের ওই নির্জীব জলটুকুতে এসবের কতটুকু পরিচয় আছে? আর এসব বাদ দিলে তো রুদ্রপ্রয়াগ একটি নগণ্য স্থান মাত্র। যার উল্লেখ কোন ভূগোলের পাতাতেই থাকে না।

কিন্তু তবু, আবার সমতলে ফিরে গেলে আমার আজকের সব গগন-স্পর্শী বিদেহী অনুভূতি নিশ্চয়ই পথের ধূলোর সঙ্গে নিঃশেষে মিশে যাবে; একদিন যে ধরণীতল থেকে সামান্য একটু উপরে উঠেছিলাম তার কোন স্মৃতিও অবশিষ্ট থাকবে না। কিন্তু সেদিন ওই হাস্যকর সামান্য মৃত ঘোলাটে জলটুকুই, বিবর্ণ আলোকচিত্রটিই হয়তো স্বর্গের কথা ওদের স্মরণ করিয়ে দেবে। আর কে জানে জন্মান্তরের স্মৃতির মত হয়তো একটু অনুভূতিও!

চার

কুলি ও ছড়িদারকে আগেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। খৃষ্টীয় উনিশ শো পঞ্চান্ন সনের পনেরোই মে রবিবার বেলা চারটের সময় আমরা অবশেষে পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো পরনে শার্ট ও ট্রাউজারস, মাথায় বিলিতী ফেল্টের টুপি ও হাতে ছড়ি নিয়ে পশ্চাতে অলকানন্দা এবং বাঁয়ে সঙ্গম ছেড়ে পর্বতের বিলম্বিত ছায়ায় ঢাকা পথে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে আমাদের পদব্রজন শুরু করলাম। তখন আমাদের দেখতে নিশ্চয়ই যাত্রীর মত হয় নি, হয়তো পরিব্রাজকের মতও নয়; অবনী ঠাকুরের আঁকা যক্ষের ছবি কোনদিন দেখি নি, অতএব অনেকটা সেই রকম দেখতে হয়ে থাকা বিচিত্র নয়। তবে তখন আর নিজের দিকে তাকাবার বিশেষ অবকাশ ছিল না। নীচে—আমাদের পথ থেকে দু শো ফুট প্রায় নীচে অচ্ছোদ মন্দাকিনী তখন তরতর বেগে উজান বেয়ে চলেছে।

কেদারনাথের দূরত্ব, আগে যা পড়েছিলাম, রুদ্রপ্রয়াগ থেকে আশী মাইলের উপর নয়, মাত্র আটচল্লিশ মাইল। তার মধ্যে, রুদ্রপ্রয়াগের চটিওয়ালা প্রবোধ দিয়েছিল, প্রথম আঠার মাইল নাকি 'একদম সিধা'। কথাটা যখন শুনেছিলাম তখন সংশয় সত্ত্বেও বিশ্বাস করবার চেষ্টা করেছিলাম। এখন পথে নামতে সংশয়টুকু সম্পূর্ণ কেটে গেল। পথ সত্যি বিস্ময়কর রকম সিধা। শুধু সিধা নয়, প্রশস্তও। কোলকাতার পথের সঙ্গে পার্থক্য কেবল এইটুকু যে শকটের ভিড় নেই, পেট্রোলের গন্ধ নেই। তবে সেটুকুও আর থাকবে না বেশী দিন, শীঘ্রই এ পথে বাস চলবে। আসলে এইটে মহাপ্রস্থানের পথ নয়, পরিকল্পিত বাস-পথ। মানে, আমরা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সর্বগ্রাসী থাবার বাইরে হয়তো এসে

থাকব, কিন্তু এখনও আয়ত্তের অতীতে পৌঁছতে পারি নি আর অভ্যাসের এমনই দোষ যে, ঘাতককেও প্রতিহারী বলে মনে হয়। আমরা বেশ নিশ্চিন্তে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে গল্প করতে করতে পথ অতিক্রম করতে থাকলাম, হাতের যষ্টিটিকেও ছড়ি বলে ভ্রম হল। যাত্রা'বটে আমাদের, যাত্রী বটে আমরা!

অবশ্য অন্য কিছু ঘটবার সুযোগই বা কোথায়? চিরটা কাল, সেই জন্ম থেকেই তো আমার ভাগ্যগুণে কপাল মন্দ। নির্মম কোন অভিজ্ঞতা, নির্দয় কোন আঘাত, দুঃসহ কোন বেদনা, দুর্জয় কোন ব্যাধি, সমাধানের অতীত কোন সমস্যা যা ব্যক্তিকে জীবনের মুখোমুখি এনে দাঁড় করায়, বোঝাপড়া করতে বাধ্য করে, ব্যক্তি যখন আর নিজেকে ব্যক্ত না করে পারে না—সে সব চিরকালই আমাকে সযত্নে এড়িয়ে গেছে। আমি মধ্যবিত্ত আমার ভাগ্যও তাই। শামুকের মত ক্রমাগত লালা নির্গত করে আমিও আমার মনের চতুর্দিকে একটা অলঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করেছি; সে লালায় মুক্তো সৃষ্টি হয় নি, আবদ্ধতায় মনটা শুধু মরে গেছে। গ্যালভানীর তারস্পর্শে সে আজ শুধু একটু নড়ে চড়ে; ঝিনুকে করে ছাড়া সমুদ্রের স্বাদ গ্রহণ করবার ক্ষমতা তার নেই। জীবন আমার কাছে একটা শব্দ মাত্র, পরিণতি একটা অলীক কল্পনা। আমি অব্যক্ত, কেননা ব্যক্ত করার কিছু নেই আমার। চিরকালই এমন হয়ে আসছে, আজকেই আমার ইচ্ছেয় সে নিয়মের ব্যতিক্রম হতে যাবে কেন! তাই প্রবোধ সান্যালের বইতে যে-পথের বিবরণ পড়ে আশঙ্কার ও আশার অন্ত ছিল না, সেই পথেও আজ পা বাড়িয়ে দেখি, পথ 'একদম সিধা'। এবারেও জীবন হয়তো আমায় পাশ কাটিয়ে গেল!

নীলমণি দ্রুত হেঁটে অনেক দূর এগিয়ে গেছে, আর চোখে পড়ে না। সুশীল মোটা মানুষ, এত পিছিয়ে পড়েছে যে ওকে দেখা যায় না। তারাদা ও ননী আমার একটু সামনে হাঁটছে। তারাদা মহাভারতের গল্প নিবিষ্ট মনে বলে চলেছেন, ননী অভিনিবেশ সহকারে তাই শুনছে। প্রথমের বাচনভঙ্গীর অতি স্পষ্ট অধরা ভাবটি দেখে বুঝতে একটুও কষ্ট হয় না যে, তাঁর অনেক দিনের কাম্য আজ নিশ্চিতরূপে অধিগত হয়েছে; আর দ্বিতীয়ের অতিব্যগ্র অবিরত মস্তিষ্কহেলনে তার মানসিক পরিতুষ্টির নির্ভুল সাক্ষ্য আছে। এই তুষ্টি এই তৃপ্তি অগভীর হতে পারে

কিন্তু অনান্তরিক নয়। ওঁদের দুজনের পেছন পেছন আমি চলেছি আপন মনে। মাঝে মাঝে হিমালয়ের আগ্রাসী উদারতা আমার স্বভাবকোপনতা ধুইয়ে দিচ্ছে, আবার তার পরেই মনে হচ্ছে, যে নৈরাশ্যে আমার যাত্রা শুরু হল সে নৈরাশ্যেই যাত্রা শেষ হবে না তো? পথ চলার আনন্দটাকেও অস্বীকার করতে পারছি নে, আবার জন্মলব্ধ সংশয়টাকেও মুছে ফেলতে পারছি নে। একটা বিচিত্র রকমের বিমিশ্র ভাব, কিন্তু বিমিশ্র ভাবের মত অত বিশ্রী নয়।

এমন সময় পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরতে কেদার-প্রত্যাগত এক যাত্রীদলের মুখোমুখি পড়ে গেলাম। দলের সবাই নারী এবং প্রৌঢ়া, একজন ছাড়া আর সবাই বিধবা। পথটা ওঁদের দিক থেকে সামান্য উতরাই বলে সবাই বেশ ছুটতে ছুটতে আসছিলেন। আমাদের কৌতুহলী দৃষ্টি দেখে ওঁদের গতি রুদ্ধ হতে তারাদা জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কি কেদারনাথ থেকে ফিরছেন বুঝি?

হ্যাঁ, বাবা।—হাঁপাতে হাঁপাতে সবাই সমস্বরে মাথা হেলালেন। কণ্ঠে উৎকণ্ঠার ভাব আনবার চেষ্টা করে আমি তখন তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সাগ্রহে প্রশ্ন করলাম, পথে কি খুব কষ্ট?

উঃ বাবা, আর বল কেন, যা শীত!—দলের সবাই আবার সমবেত কণ্ঠে প্রত্যুত্তর করল। তার পর দলের মধ্যে যিনি সব চাইতে ক্লান্ত ও অবসন্ন তিনি এগিয়ে এলেন: তার ওপর আবার গুপ্তকাশীর পর থেকে ক্রমাগত বৃষ্টি—শিলাবৃষ্টি। শিলা পড়ে পড়ে দেখ না হাতে কেমন ফোস্কা পড়ে গেছে! আর চড়াই ভেঙে ভেঙে পায়ে যা ব্যথা, বাবা কেদারনাথই জানেন কবে সে ব্যথা সারবে!

প্রায় সকলেরই দেখলাম হাতে ও মুখে পোড়া ঘায়ের মত লালচে ও কালচে দগদগে ক্ষত।

এইবার আবার তারাদাকে এগিয়ে আসতে হল: তা আপনারা যে আবার এই পথেই নেমে এলেন, তুঙ্গনাথ গেলেন না, বদ্রীনাথ যাবেন না?

না বাবা, তুঙ্গনাথ আর এই যাত্রায় হল না। গৌরীকুণ্ডের চড়াই ভাঙতেই পা অচল হয়ে গেল, তুঙ্গনাথের কথা আর ভাবি কী করে, শুনেছি সে পথে পুরো আঠারো মাইল চড়াই।

তারাদা বোধ হয় নিজের অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নটার রূঢ়তা এইবার বুঝতে পারলেন। তাড়াতাড়ি তিনি তাই নিজেকে সংশোধন করে বললেন, আপনাদের তো তবু কেদারনাথ হয়েছে, আপনারা নমস্যা। আমাদের কতদূর যাওয়া হয় দেখি।

মহিলারা স্পষ্টতই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন: না না, সে কী! সবই বাবার ইচ্ছা। তোমাদের যাওয়া হবে বইকি বাবা, কেদারনাথ তুঙ্গনাথ বদ্রীনাথ—তোমাদের সব হবে, সব হবে।

যদি হয়, আপনাদের আশীর্বাদেই হবে।

না না, বাবার টানেই হবে। তিনি যাকে টানেন তাকে কি আর ছাড়েন?

ননী এতক্ষণ আড়ালে ছিল। সোৎসুক গবেষক বিজ্ঞানীর মতো এইবার অকস্মাৎ এগিয়ে এসে উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, এখান থেকে কেদারনাথ ক' মাইল দূরে?

শেষের দিকটায় এমনিতেই অপ্রতিভ বোধ করছিলাম, ভাবাবেগপূর্ণ কোন কথা শুনলেই যেমন অপ্রস্তুত বোধ করে থাকি। ননীর বাহুল্য প্রশ্নের পর আমি আর মুখ সোজা করতে পারলাম না। ওর ছেলেমানুষীর জন্য যেন আমিই দায়ী এবং ভর্ৎসিত, চোরের মত তাড়াতাড়ি সবার পাশ কাটিয়ে আবার পথ ধরলাম।

কিন্তু এই অপরাধবোধটাও যেন আর যথেষ্ট তীক্ষ্ণ মনে হল না। মনে হল, আমার চেতনাশক্তি কী যেন একটা আবরণের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। কোন অনুভূতিই যেন আর আমার আমিকে স্পর্শ করতে পারছে না, বাইরে থেকে শুধু কড়া নাড়ছে, বৃথা। আগেও, এই যাত্রার আগেও আমার মাঝে মাঝে এমন হয়েছে, চেতনা ক্লান্ত হয়ে পড়লে পূর্বেও আমি পারিপার্শ্বিকের এই দূরত্ব অনুভব করেছি, পারিপার্শ্বিক থেকে নিজের দূরত্ব উপলব্ধি করেছি। এর আগে তযবারই এমন হয়েছে ততবারই এই ভেবে ভয়ে কণ্টকিত হয়েছি যে, এইবার শেষের শুরু! যে চেতনাটুকু আমার সজীবতার একমাত্র অন্তর-গ্রাহ্য সাক্ষ্য, এইবার বুঝি তার ক্ষয় শুরু হল। কিন্তু আজকে একা একা মন্দাকিনীর তীর ধরে, হিমালয়ের গা বেয়ে, হিমাচলের ছায়ায় পথ চলতে চলতে ওই ভয়টাকেও আর তেমন মর্মান্তিক বলে মনে হল না।

ভয়টাও যেন বিগত জন্মের ভয়, স্বপ্নে দেখা ভয়—শুধু কড়া নাড়ছে, স্পর্শ করতে বা কামড়ে ধরতে পেরে উঠছে না।

কিছুদূর এগোতে ছতোলী চটির খানিকটা আগে একটা চায়ের দোকান মিলল। ছোট্ট একটা ছাপড়া, দোকানদার নিশ্চিন্ত মনে বসে আছে। পাশের উনুনটার জল আপন মনে ফুটে চলেছে; সামনে একটা মাচার উপর কয়েকটা পেতলের গ্লাস নির্বিবাদে উপুড় করা। বাইরে দুটো ডাল পুঁতে ও তার উপর একটা ডাল আড় করে পেতে ক্রেতাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা হয়েছে। সব মিলিয়ে শান্ত সরল নিরুদ্বিগ্ন একটা পরিবেশ। সর্বাংশে এমন হিমালয়-সুলভ পরিবেশ বুঝি একমাত্র হিমালয়েই পাওয়া যায়! মোটেই ক্লান্ত ছিলাম না, তবু কিছুক্ষণের জন্য না বসে পারলাম না।

বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিতে হিমালয়কে একটা একঘেয়ে ব্যাপার বলে মনে হওয়া আদৌ বিচিত্র নয়। সত্যিই তো, নতুন আর কী দেখছি! হৃষিকেশ থেকে সেই যে শুরু হয়েছে, তার পর থেকে সেই তো পাহাড় পাহাড় আর পাহাড়। বিশেষ কোন ব্যতিক্রম তো চোখে পড়ে না! তবু যখনই যেদিকেই চোখ ফেরাই সম্পূর্ণ অভিনব কিছু একটা অপেক্ষা করে আছে। একটু পরে আবার সেদিকেই তাকাই, তখনও নূতনতর কিছু চোখে পড়বেই। আর এই অভিনবত্ব যেন অন্তহীন। অনেকটা রামায়ণ-মহাভারতের মত। সেই শিশুকাল থেকেই তো ওই মহাকাব্য দুটি পড়ে আসছি অথচ এখনও পড়বার সময় প্রতিবারই মনে হয় নতুন কোন ইঙ্গিত পেলাম, পড়বার পরে প্রতিবারই দেখি নূতনতর এক আলোয় চেতনার চেতনাতীত দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। হিমালয় ভারতের তৃতীয় মহাকাব্য এবং মহত্তম কাব্য।

চা ও সিগারেট পানের পর আবার পথ ধরলাম।

পর্বত তো সব দেশেই আছে, দেশের আপেক্ষিক বিচারে মধ্য-য়ুরোপের আল্পস, পূর্ব-য়ুরোপের উরল, তা ছাড়া আমেরিকায় বা আফ্রিকাতেও হিমালয়সদৃশ পর্বতের তো অভাব নেই। অথচ হিমালয় ছাড়া আর কোনটাই কেন মহাকাব্য হয়ে উঠতে পারল না? হিমালয়ের মত এদেরও আনাচে কানাচে কেন এত কথা ও কাহিনী, এত সুর-সঙ্গীত, এত শ্রুতি ও স্মৃতি জমে উঠতে পারল না? ঐতিহাসিক

এই প্রশ্নের কী জবাব দেবেন আমি তা জানি, অর্থনীতিবিশারদের মতামতটাও আমার অজানা নয়; এবং আমি সব চাইতে বেশী জানি এ দুজনের একজনের উত্তরও সঠিক তো নয়ই, সন্তোষজনকও নয়। কেননা তা হলে হিমালয়কে হিমালয় না বলে মাজিনো-লাইন বা ঐ জাতীয় কিছু বলাই যুক্তিসঙ্গত হত। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য যে, হিমালয়ে যাঁরা মহাকাব্যত্ব আরোপ করেছিলেন, তাঁরা আজকালকার বিশেষজ্ঞদের মত সবিশেষ অজ্ঞ ছিলেন না। বস্তুতঃ হিমালয়-মহাকাব্য যাঁদের রচনা তাঁদের প্রতিভার পরিধি আজকের এই সঙ্কীর্ণ যুগে অনুমান করাই অসম্ভব। মূলত হিমালয় কী ছিল?—অন্য যে কোন পর্বতের মত একটি পর্বত মাত্র, একটি বিস্মৃত ভৌগোলিক বিপর্যয়ের নির্জীব সাক্ষ্য, পৃথিবীর বৃহত্তম কুব্জ। কল্পনার কত প্রসার, কী উত্তুঙ্গ সৌন্দর্যবোধের দ্যোতনায় যে সেই প্রাকৃতিক ঘটনাটি মহাকাব্য হয়ে উঠল তা কল্পনা করবার সাধ্য আর যাঁরই থাক্, আমি সবিনয়ে আমার অক্ষমতা কবুল করব। বিগত চার দিন ধরে তো হিমালয়ের ক্রোড়েই আছি, অথচ কল্পনায় হিমালয় এখনও ভারতের মানচিত্রের উত্তর-দিগন্তের সেই বিসর্পিল পর্বত-চিহ্নই রয়ে গেছে; মাঝে মাঝে বড় জোর একটা অনির্দেশ্য ধোঁয়াটে বিরাটত্ব মনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বাস্। আর সেই হিমালয়কেই কিনা অতীতের মহাজনরা সামগ্রিক ভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আপন প্রাণের সৌন্দর্যে সুন্দর করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। কত সহজে কত অজস্র প্রিয় নামে অভিহিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন—হৃষিকেশ, দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর নীলকণ্ঠ, রুদ্রপ্রয়াগ। নামগুলো শুধু স্মরণ করলেই আজও মন ভরে ওঠে, মন বিবাগী হয়ে যায়। কল্পনার সঞ্জীবনী স্পর্শে এমন অটল, অনড়, জড় একটা স্তূপ সজীব হয়ে উঠেছে। শুধু সজীব নয়, সতেজও। এঁদের পিতৃত্ব অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছি বটে, কিন্তু সেদিন এঁদের সন্তান বলে গর্ব অনুভব না করে পারি নি।

বিচিত্র এক বিমুগ্ধাবস্থায় তন্ময় হয়ে পথ অতিক্রম করছিলাম। ছত্তৌলি চটি পেরিয়ে আমাদের আজকের গন্তব্য চটি রামপুরের পথ চলে গেছে। ছত্তৌলি চটি যাত্রীর ভিড়ে মৌচাকের মত গুঞ্জনরত।

চটির বারান্দায় চায়ের দোকানে পথের ধারে ক্লান্ত যাত্রীরা বিশ্রাম করছে। সকলেরই চোখে কেমন একটা নির্বিকার উদাস দৃষ্টি। অকস্মাৎ কি একটা বিপর্যয় ঘটে গেল। মনে হল যেন স্পষ্ট অনুভব করলাম যে, ছতৌলি চটিতে যাত্রীদের আজকের সায়াহ্নবেলার এই বিশ্রাম, এ তো উনিশ শো পঞ্চান্ন সনের পনরোই মে রবিবার সন্ধ্যার একটি বিশেষ বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয়। এ তো চিরকাল হয়ে আসছে, চিরকাল হয়ে আসবে; এ তো অনন্তের সুরের একটি অশেষ মীড়। আর এই যে আমার পথ চলা, এও তো সাময়িক একটা ব্যাপার নয়, এরও কি ছাই আদি-অন্ত আছে!

একটু পরেই সেদিন যখন ওই অনুভূতিটা সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলাম, তখন মনে করেছিলাম এর কথা কোনদিন কাউকে বলব না, বলে নিজেকে হাস্যাস্পদ ও অনুভূতিটাকে বিকৃত করব না। আজকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগে এর কথা কে বুঝবে! নিরালম্ব, আত্মসর্বস্ব ব্যক্তির পক্ষে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ইতিহাসে স্থাপন করে, সম্পূর্ণ ইতিহাসটাকে আপন উপলব্ধির মধ্যে গ্রহণ করবার যে বিস্ময়কর চেতনা, তার অস্তিত্ব স্বীকার করাই অসম্ভব। আমিও সেই দলভুক্ত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এক মুহূর্তের জন্য সেই দলচ্যুত। এই সৌভাগ্যের কথাটা দশজনের কাছ থেকে গোপন করবার নয়।

আমার মনে হল, সেই যুগাতিযুগ অতীত থেকে আমি—আমি নিজে এই ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি সৃষ্টি করে আসছি, হিমালয়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে আসছি। কোন্ অনাদিকালে এই সাধনার শুরু হয়েছে তা বিস্মৃত হয়েছি, আজও সেই সাধনা অশেষ, কবে শেষ হবে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ কৌতূহলমুক্ত ও উৎকণ্ঠাহীন। মাঝে মাঝে ক্লান্তি বোধ করছি বটে, কিন্তু তারপরেই গৌরবে সেই ক্লান্তি আবৃত হয়ে যাচ্ছে। আমি কেবল বিকারগ্রস্থ প্রাশ্চাত্ত্য সভ্যতার গর্ভস্রাব নই, আমি অমৃতেরও পুত্র।

এমনই হয়, কেন না, প্রতিভারও রকমফের আছে। এক ধরনের প্রতিভা, যা রবীন্দ্রনাথের ছিল—তার চমক বড় বেশী উজ্জ্বল। অমন প্রতিভার সামনে দাঁড়ালে হতভম্ভ হয়ে থাকতে হয়। আর অপর এক ধরনের প্রতিভা আছে, যা বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল—যা উৎসাহিত করে, অনুপ্রাণিত করে, যা পাঠককে বা দর্শককে শুধু ভোগের রোমাঞ্চ নয়,

সৃষ্টির আনন্দ দেয়। হিমালয়-মহাকাব্য যেই প্রতিভাপ্রসূত, তা এই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিভা। তাই আমার মত অধমও এই সৃষ্টির আনন্দ থেকে বঞ্চিত হলাম না। আমি কৃতার্থ।

আপনারা কি আজ রামপুর চটিতেই রাত কাটাবেন স্থির করেছেন ? —লোকটি পথিপার্শ্বে বসে বিশ্রাম করছিল। উঠে পড়ে আমার সঙ্গ নিল। আমিও হিন্দীতেই জবাব দিলাম—হ্যাঁ, সেই রকমই তো ব্যবস্থা।

আপনাদের দলের অন্যান্য সবাই বুঝি এগিয়ে গেছে ?

এইবার লোকটির দিকে ভাল করে চাইতে হল। সে বোধ হয় বুঝতে পারল আমার অবস্থাটা, তাই উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে তাড়াতাড়ি বলল, আপনার বোধ হয় আমাকে স্মরণ নেই। আমি কর্ণেল রিহির বেয়ারা।

রিহি ?

ও, তাঁকেও ভুলে গেছেন ? ওই যে সেদিন দেবপ্রয়াগ থেকে শ্রীনগরের বাসে আপার ক্লাসে যাঁরা এসেছিলেন, আমি তাঁদের। বেয়ারা।

ও।—আমার স্মরণ হল, কিন্তু কৌতূহলের অভাবে আর কথা বাড়ালাম না। নীরবে হাঁটতে থাকলাম। লোকটি আমার পাশে পাশেই আসছিল ; ও-ই আবার নীরবতা ভঙ্গ করল—আমাকে আগে পাঠিয়ে দিয়েছে, রামপুরে আগে থাকতে গিয়ে চটি দখল করবার জন্যে কিন্তু আজ বোধ হয় ওদের ছতৌলি চটিতেই থেকে যেতে হবে, সন্ধ্যা হয়ে গেল যে।

তবে কি তুমি আবার ছতৌলি ফিরে যাবে নাকি ?—আমি উদ্বিগ্নই বোধ করলাম। কিন্তু লোকটি নিরুদ্বিগ্ন, প্রায় নিশ্চিন্ত কণ্ঠে বলল, পাগল নাকি, এই সন্ধ্যায় ছতৌলি ফিরে যাব ? ওরা না এলে বরং ভালই হয়, একটা রাত স্বস্তিতে ঘুমনো যায়।

আমি মৃদু একটু হাসলাম। ওই হাসির অর্থ অন্তরঙ্গতম বন্ধু ছাড়া আর কারও বোঝবার নয়, কিন্তু লোকটি আমার হাসির সমবেদনায় কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে চাইল। এই পথে পরিচয় অন্তরঙ্গ হতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না।

কেন খুব হুকুম করে বুঝি ?

শুধু হুকুম হলে তো তবু রক্ষা ছিল ; পণ্টনের লোক, হুকুম তামিল করতে বিশেষ অসুবিধে হয় না। কিন্তু মেম-সাহেব বড় খিটখিটে। মেজাজ বোঝা দায়।

কিন্তু এরা এই পথে আসতে গেল কেন ?—অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও অবশেষে প্রথম সুযোগেই আমি আর প্রশ্নটা উচ্চারণ না করে পারলাম না। যতই অসুবিধে হোক এদের সঙ্গে আমার আত্মিয়তা তো অস্বীকার করবার উপায় নেই। এরাও যে সেই একই বিতৃষ্ণ বীতশ্রদ্ধ নাগরিক, —একই কৃত্রিমতার কয়েদী। সমবেদনা না থাকতে পারে কিন্তু এদের সম্পর্কে কৌতুহল জয় করি কি করে। সব যে একই অভিশাপে অভিশপ্ত, একই পাপে পাপী, একই সর্বনাশা পথের যাত্রী ! কিন্তু লোকটির মুখে আমার প্রশ্নের উত্তর শুনে আপন মূঢ়তায় আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আসলে এদের অবস্থা আমার চাইতেও মর্মান্তিক, এদের তুলনায় আমি প্রায় সুস্থ !

লোকটি বলল, কে জানে বাবা কেদারনাথের কী ইচ্ছে ! তবে এই পথে ওদের এনেছে ওই সাধু-বাবা—গুরুজী। আমীর আদমি, সব সময়ই খেয়ালমাফিক চলে। বিশ সাল তো নৌকরি করছি, অনেক কিছুই দেখলাম। প্রথম যখন কর্ণেল সাহেব বাংলা মুলুক থেকে বিয়ে করে মেম সাহেবকে নিয়ে এলেন তখন কত পার্টি, সরাবের যেন বান ডাকল—

লোকটির কথা সাজিয়ে বললে দাঁড়ায় এই রকম :

মহোৎসার সরে যেতে দেখা গেল, কর্ণেল সাহেব ও মেম-সাহেব নিয়ত বিবদমান। তারপর মেম-সাহেব প্রজাপতির মত আজ এর হাত ধরে, কাল ওর স্কন্ধলগ্না হয়ে কিছুকাল ঘুরে বেড়ালেন। অবশেষে ওই সাধুজীকে এনে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করে ব্রহ্মচারিণী হয়ে উঠলেন। মেম-সাহেবের মেজাজ খিটখিটে হয়েছে ওই গুরুজীর আগমনের পর, আর তার কারণ, ওই লোকটির মতে, কর্ণেল সাহেব ও তদীয় কন্যার সাধুজীর শিষ্যত্ব গ্রহণে অনিচ্ছা। গুরুজীর পরামর্শে মেম-সাহেবের খেয়াল হল, কেদারনাথ দর্শন করবেন; প্রতিরক্ষার জন্য স্বামীকেও তাই সঙ্গ নিতে হল। আর মেয়েটি ঘরে একা কার কাছে থাকবে ?

সেই পুরনো গল্প। প্রেমোচ্ছ্বাসের সেই একঘেয়ে উপসংহার। স্বধর্ম থেকে নির্বাসনের সেই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। কলকাতার নাগরিক জীবনে এই ধরনের একাধিক পারিবারিক ট্র্যাজেডি আমি দেখেছি। এখানেও একটি দীর্ঘশ্বাস শুধু চেপে একটা সিগারেট ধরানো ছাড়া আর কিছু করতে পারলাম না; আর কিছু করবার ছিলও না।

লোকটি কিন্তু কর্ণেল-কাহিনী সমাপ্ত করেই তাড়াতাড়ি যোগ করল: তবে বুঝলেন তো সবই।বাবা কেদারনাথের মর্জি। এমন যোগাযোগ তিনি ঘটালেন যে, আমাকে এ পথেই আসতে হল, গত জন্মের পুণ্য তো আর ব্যর্থ হবার নয়।

মানে সেই—"পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি।" কিন্তু পথ আর রথও আসলে দেবতা নয় তো। সিগারেটটা একটু মৌজ করে টানবার জন্য পথিপার্শ্বের একটি পাথরে উপবেশন করলাম। লোকটি পথ ধরে সোজা বেরিয়ে গেল। এই পথে স্বাগত-জ্ঞাপন যেমন বাহুল্য, বিদায়-গ্রহণও তেমনই নিষ্প্রয়োজন। দুই-ই সহজ সরল, স্বাভাবিক।

সেদিন অবশেষে রামপুর চটিতে যখন গড়াতে গড়াতে গিয়ে পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা আটটা। পথের একটু নীচে বাম দিকে রামপুর চটির উপর পাহাড়ের ছায়া তখন গাঢ় হয়ে জমেছে। আমাদের নীলমণি আগে থাকতে এসে নৈশ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে চটির প্রবেশদ্বারের চায়ের দোকানটায় বসে চা পান করছিল। আমি ওর পাশে বসে পড়লাম। ক্রমে পাহাড়গুলো নিদ্রার আয়োজন করল অন্ধকারের চাদর মুড়ি দিয়ে। নীচে মন্দাকিনী গুনগুন করে অবিরত ঘুমপাড়ানী গান গাইতে থাকল। মুহূর্ত মাত্র আগে যে চটিতে ব্যস্ততার সোরগোলের অন্ত ছিল না, এরই মধ্যে তা স্তব্ধ, সুপ্ত। সন্ধ্যা তখন সাড়ে আটটা। আমি আর নীলমণি তখনও চায়ের দোকানে নির্বাক হয়ে বসে আছি। আর যাত্রীদের পথ দেখাবার জন্য আলো জেলে বসে আছে চা-ওয়ালা, আশ্রয়দানের জন্য চটিওয়ালা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ননী তারাদা ও অবশেষে সুশীল এসে পৌছল। কিন্তু কুলি ও ছড়িদার তখনও নিখোঁজ। চাওয়ালা প্রবোধ জানিয়ে বলল, রাত বারোটাই বাজুক আর একটাই বাজুক ওরা আসবেই। কিন্তু আমরা সমতলের লোক, আসবেই জেনে নিশ্চিন্ত থাকবার লোক নই। আমি ও নীলমণি অগত্যা আবার ওদের খুঁজতে পথে বেরোলাম। তারাদা গেলেন নৈশাহারের ব্যবস্থা করতে। রাত তখন সাড়ে ন'টা।

অমাবস্যার সূচীভেদ্য অন্ধকার রাত্রি। সঙ্কীর্ণ পার্বত্য পথ—ইতস্তত খোয়া বিক্ষিপ্ত, বন্ধুর। নিকষ কালো পাহাড়গুলো ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে যেন আগ্রাসী স্ফিংক্স। মন্দাকিনী আপন মনে অবোধ্য ভাষায় ক্রমাগত কী যেন বলে চলেছে। একটা চাপা উদ্বেগে, একটা স্তব্ধ বিক্ষোভে মন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। নীলমণি বারে বারে টর্চ জ্বেলে পথ দেখাবার প্রয়াস পেতে থাকল।

আচ্ছা, ওরা তো পরামর্শ করে পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারে!

না, তা হবার নয়। আমি ভাবছি পড়ে গেল না তো! যা পথ, এক জায়গায় পথটা কেমন ভাঙা ছিল মনে আছে?—আবার নির্বাক পিছিয়ে চলা। দুজনেরই বলার যা কিছু ছিল যেন ওই কথাতেই বলা হয়ে গেল। দুজনেরই মনে যে কথা ছিল তা উচ্চারণ করবার সাহস একজনেরও ছিল না। যদি সত্যি পড়ে গিয়ে বা পালিয়ে গিয়ে থাকে, তবে? তা হলে কি এখানেই যাত্রার ইতি হবে, না কি ওই অবশ্য-প্রয়োজনীয় পোশাক কয়টা পরিহার করেই এগিয়ে যাব? এই প্রশ্নের নেতিবাচক জবাব দিতে কারও মনই সায় দিচ্ছিল না, সে-যে বড়ো লজ্জাকর বড়োই গ্লানি কর! ইতিবাচক জবাব দিতে কেউই সাহসী হলাম না। সেই উদ্ধত বিশ্বাস কোথায়! অতএব প্রশ্নটাকেই নিরুক্ত রেখে নিঃশব্দে পথ অতিক্রম করতে থাকলাম। এক ফার্লঙ দু ফার্লঙ করে গুনে গুনে দেড় মাইল।

নাঃ, চলুন রামপুরেই ফিরে যাই। যা হবার হয়েছে, কী করা না করা তা বরং কাল ঠিক করা যাবে।

অন্ধের মত আমি নীলমণিকেই অনুসরণ করলাম, নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন খড়কুটো চেপে ধরে। আমিও সেদিন ভীতিপ্রদ নিঃসঙ্গতায়ই

নিমজ্জিত হচ্ছিলাম। নিমজ্জিত হচ্ছিলাম আমার এতকালের অত সাধের আত্ম-নির্ভরশীলতার চোরাবালীতে!

ফিরে যেতে দেখি ততক্ষণে চটির প্রবেশপথের চাওয়ালা দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করেছে। চটিওয়ালার দোকান-ঘরটিতেও আলো নেই। রামপুর চটি অন্ধকারে মিশে পর্বতগাত্রে লীন হয়ে গেছে। শুধু আমাদের ঘরটা থেকেই মৃদু একটু অশ্লীল আলোর রেখা বাইরে এসে পড়েছে। আমার মনে হল, আর সবাই যখন আত্মসমর্পণ করে নিশ্চিন্ত, আমরা তখন আমাদের মনের সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে চঞ্চল, উদ্বিগ্ন। আর সবাই যখন আপন আপন কম্বল সম্বল করে নির্বিঘ্নে নিদ্রামগ্ন, আমরা তখন আমাদের অবিশ্বাসের কণ্টকশয্যায় ক্রমাগত এপাশ-ওপাশ করছি। এ পথে আদৌ না এলেই বোধ হয় ছিল ভাল। এ পথ আমাদের পথ নয়।

নীলমণি কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল। আমি অতি সন্তর্পণে পা ফেলে আস্তে আস্তে এগুচ্ছিলাম। আমাদের ঘরটা চটির দূরতম কোণে, মাঝখানে যাত্রীরা মাছপাতড়ির মত পরস্পরের গায়ে গায়ে লেগে ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু আমার সমস্ত সন্তর্পণতা সত্ত্বেও অন্ধকারে একজন যাত্রীর গায়ে পা পড়ে গেল। নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে তিনি খেঁকিয়ে উঠলেন: আহা-হাঃ, একটু দেখেও কি পা ফেলতে পার না গা; কানা নাকি, যে টাঁই করে লাথি মেরে দিলে?

আমি আর কোন প্রত্যুত্তর না করে তাড়াতাড়ি নিজেদের ঘরে এসে ঢুকলাম। মনে হল, কে যেন আমার দু গালে দুটো চড় বসিয়ে দিয়েছে। এ তো সেই মহিলারই কণ্ঠ, শ্রীনগরে যিনি মুমূর্ষু স্বামীকে ত্যাগ করে এসেছেন। তিনি তো তা হলে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে ফিরে যান নি! আর আমরা কয়েকটা মাত্র জামা-কাপড়ের মায়ায় রামপুর থেকে ফিরে যাব কি না ভাবছি? আমরা কী? আমরা কি এঁদের মত হিন্দু, না ভারতীয়? কথাটা যতই মনের মধ্যে পাঁক খেতে লাগল চেতনা ততই আত্মধিক্কারে সঙ্কুচিত হয়ে এতটুকু হয়ে গেল। জারজত্বের গ্লানি যে কী দুঃসহ, বর্ণসঙ্কর হয়ে জন্মাবার অভিশাপ যে কী মর্মান্তিক, অনাথের মত পরের ঘরে মানুষ হওয়া যে কতখানি অবমাননাকর তা সেদিন প্রথম বুঝলাম। সেদিন যদি

তখন ঘরে আর দ্বিতীয় কেউ না থাকত তবে ফুঁপিয়ে কাঁদতাম, হয়তো নিজের দেহ থেকে ময়ূরপুচ্ছগুলো ছিঁড়ে ফেলে দিতাম। ক্লীব আমি শুধু সেদিন সকলের কাছ থেকে, এমন কি নিজের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বাইরের অন্ধকারে আত্মগোপন করে রইলাম।

কতক্ষণ পরে ঠিক স্মরণ নেই, বাইরে থেকে কুলি ও ছড়িদারের সাড়া পাওয়া গেল। ছড়িদার জিতরামের হাঁক পর্বতে প্রতিধ্বনিত হবার আগেই ঘরের সবাই যে যার টর্চ নিয়ে হুড়মুড় করে ওদের আপ্যায়ন করতে ছুটলেন। স্বয়ং ঈশ্বর এসে কড়া নাড়লেও বোধ হয় এর চাইতে বেশী অভ্যর্থনা জুটত না। কিন্তু ওই ক্ষণিক আশ্বস্তির পরমুহূর্তেই আমার আবার নিজেকে প্রবঞ্চিত বলে মনে হল। এই সামান্য ব্যাপারটুকুতেও পরীক্ষিত হবার অবকাশ আমার ঘটল না। মালপত্র নিয়ে কুলি যদি সত্যিই উধাও হয়ে যেত তাহলে হয়তো নিজের অবশিষ্ট-টুকুর পরিমাপ করে দেখবার একটা সুযোগ মিলত। চূড়ান্তরূপে একবার জানতে পারতাম যে আজও কতটুকু বেঁচে আছি। কিন্তু সে-জানা অমন সহজে জানব তেমন বরাতই করিনি তাই কুলিকে এমন কি হাতের ওই ছোট্ট ব্যাগটা পর্যন্ত অক্ষত অবস্থায় এনে হাজির করতেই হল!

চোখের নিমেষে বিছানা-পত্র সমস্ত খোলা হয়ে গিয়েছিল। তারাদা আগেই আহার্য, মানে আলুর ঝোল ও ভাত, প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। আর কালক্ষেপ না করে বাগবাজারের সুশীলবাবু এইবার যুগপৎ আক্ষেপ ও জেরা শুরু করলেন: না বাপু, অমন বাবুর মত যদি তোমরা হাঁট তবে তো তোমাদের নিয়ে আমাদের চলবে না; এমন গজকচ্ছপের মত হাঁটলে আগামী সালের আগে তো কেদারনাথ পৌঁছবার সম্ভাবনা দেখি না। দু ঘণ্টা আগে রওনা হয়ে তোমরা কিনা এসে পৌঁছলে রাত সাড়ে দশটায়? হ্যাঁ র‍্যা, সব চুপ করে আছিস যে বোবার মত? বল্ না, আমাদের সঙ্গে জানে সাকোগে, কি নাহি সাকোগে?

বিলম্বের যে কারণ ওরা এর পর ওদের গাড়োয়ালী ভাষায় নিবেদন করল তা শুনে সেদিন গলায় ভাত আটকে গিয়েছিল। সেই কথা স্মরণ করলে আজও গা শিউরে ওঠে; মানুষের অসংশোধনীয় ক্রূরতায় মন বিতৃষ্ণ হয়ে যায়।—কিছুদিন আগে এক যাত্রীদল রুদ্রপ্রয়াগ থেকে এই

পথে যাত্রা করেছিল। দলে ছিল দুজন সমর্থ মানুষ, দুজন প্রৌঢ়া নারী ও একজন অশীতিপর বৃদ্ধা। দলটি চন্দ্রাপুরী পর্যন্ত ঠিকমতই পৌঁছেছিল। তারপরেও, কেউ কেউ বলে, গুপ্তকাশীর চড়াইতে দলটির সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। আগে আগে প্রৌঢ়া দুজন সমেত একজন পুরুষ যাচ্ছিল, আর অপরজন বৃদ্ধাকে নিয়ে অনেক পিছে পিছে আসছিল। তারপর সন্ধ্যা নাগাদ গুপ্তকাশীতে পৌঁছে প্রৌঢ়া দুজনকে রেখে তাদের লোকটি চটি ত্যাগ করে, সেই থেকে দুজন লোকই নিরুদ্দেশ। পরদিন বৃদ্ধার দেহ আবিষ্কৃত হল মন্দাকিনীতটে, পথ থেকে অনেক—অনেক নীচে। প্রৌঢ়াদের সঙ্গে নিরুদ্দিষ্টদের কোন আত্মীয়তা ছিল না, অন্তত তা'রা সে রকম কথাই বলে; এবং পুলিসও সন্দেহের কোন কারণ না পেয়ে তাদের রেহাই দিতে দুজনে মিলে তা'রা কেদারনাথের পথে উঠে গেছে। নিরুদ্দিষ্টরা এখনও নিখোঁজ; এবং পুলিস যাকে হাতের কাছে পাচ্ছে। তাকেই ধরে নিয়ে গিয়ে নিজেদের কর্তব্য সম্পন্ন করে ছেড়ে দিচ্ছে। আমাদের কুলি ও ছড়িদারের বিলম্বের কারণ, ওদের উপর পুলিসের কর্তব্যপরায়ণতার কোপদৃষ্টি পড়েছিল।

পুলিস নরলোকেও পুলিস, দেবলোকেও পুলিস।—বলে একটু হাসলাম। তারপরই মনে হল, মানুষও কি দেবলোকে সেই মানুষই নয়? তারপর যা, তা অধিকতর অভাবনীয়।—খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ করে আমরা অনায়াসে শুয়ে পড়লাম! নির্বাপিত মোমবাতিটা থেকে ধোঁয়া নির্গত হতে থাকল। ক্লান্তি সত্ত্বেও সেদিন নিশ্ছিদ্র নিদ্রা হয় নি। আমরা তো আর কণ্টকশায়ী ভারতীয় নই যে, কতকগুলো জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়সূচক চিহ্নের উপরও নিশ্চিন্তে ঘুমুতে পারব।

মন্দাকিনী কিন্তু তখনও নিরুপদ্রবে আপন সঙ্গীত অব্যাহত গেয়ে চলেছে।

পাঁচ

প্রভাত সূর্যের প্রথম রশ্মি গগনস্পর্শী হিমালয়ের চূড়া স্পর্শ করবার আগেই চটি-মৌচাকে যেন অকস্মাৎ ঢিল পড়ল। এক মুহূর্ত আগেও কোন সাড়াশব্দ ছিল না, রামপুর চটি হিমালয়েরই মত নিথর নিস্তব্ধ সমাধিস্থ ছিল। হঠাৎ যেন কার যাদুস্পর্শে একসঙ্গে সকল যাত্রীর ঘুম ভেঙে গেল। কলস্বরে চটি মুখরিত হয়ে উঠল।

মিনিট পোনেরোর মধ্যে বিছানাপত্র বেঁধে যখন চটি থেকে বেরিয়ে এলাম, তখনও পর্যন্ত হিমালয়ের আনন থেকে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন পুরো-পুরি ঘোচে নি। স্বচ্ছ এক কুয়াশা, যেন কুয়াশা নয়, প্রভা, হিমালয়কে বেষ্টন করে আছে। যেন হিমালয়ের ধ্যান ভেঙেছে, কিন্তু এখনও তন্ময়তা কাটে নি! মন্দাকিনীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে, জয় বাবা কেদারনাথ, জয় বদরিবিশাললাল ধ্বনি তুলে যাত্রীরা দলে দলে পথে নেমে পড়তে লাগল। উত্তাপের ও উৎসাহের জন্য ওই ধ্বনি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, চায়ের প্রয়োজন ছিল। চা ও সিগারেট পানাস্তে আমরা রওয়ানা হলাম সর্বশেষে। তখন আর ধ্বনি দেবার মত কেউ ছিল না;—রিক্ততাবোধটা কাটাবার জন্য মনে মনে একবার উচ্চারণ করবার প্রয়াস পেলাম জয় কেদারনাথ-কি, কিন্তু শেষ করবার আগেই জড়তায় জিভ আটকে গেল। অবিশ্বাস ও অনান্তরিকতার জন্য নিরুক্ত ধ্বনিটাও কেমন যেন বিসদৃশ শোনাল।

মাত্রাতিরিক্ত ভাবাতিশয্যের মাঝে মাঝে আপন অবিশ্বস্ততার এমন উৎকট স্বীকারোক্তি থেকে সুধী পাঠক যদি স্থির করে থাকেন যে, লেখক শুধু চতুর নন, বাতুলও, তাই অমন বার বার শাক দিয়ে মাছ

ঢাকবার চেষ্টা,—আসলে যদিও থালায় শাকও নেই, মাছও নেই!—তবে তার প্রতিবাদে অভিযোগটা শুধু অস্বীকার করা ছাড়া আমার আর কিছু বলবার নেই। কেন না, সত্য কথাটা হচ্ছে, কথাটা সত্য এবং তাও নিছক পার্বত্য সত্য নয়। সমতলেও যদিচ আমার খৃষ্টধর্মকে কোন কালেই কোন বিষয়েই আকর্ষণীয় বলে মনে হয় নি, সে ধর্মের গভীরতায় যদিও চিরকালই বিস্মিত হয়েছি, অসহিষ্ণুতায় বিরক্ত বোধ করেছি এবং তার ব্যাপক প্রসারে স্রেফ হতবুদ্ধি হয়েছি, তবুও ট্রামে বাসে যীশুখৃষ্টের নামে খেলো বিজ্ঞাপন দেখে আমি ব্যথা পেয়েছি। খৃষ্টের অপমানে আমার মতো ধর্ম-নিরপেক্ষ ব্যক্তির এই অহেতুক বেদনাবোধ যতই মূঢ় এবং হাস্যকর হোক কপটতা ব্যতিরেকে তার সত্যতা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই। কীর্তন সঙ্গীতকেও কান্তুতত্ত্বের দিক থেকে চিরকালই একটা নিছক বিরক্তিকর একঘেয়েমি বলে আমার মনে হয়েছে, তবু কোনদিন কীর্তন শুনে পরমুহূর্তেই তা ভুলে যেতে পারিনি। আমি জানি যে, এর মধ্যে পরস্পর-বিরোধিতা অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু ওই দু'য়ের মধ্যে একটাও যে মিথ্যে নয় তাও তো সত্য। ঈশ্বরে বিশ্বাস করবার ক্ষমতা বা সমবেদনা আমার নেই, অবিশ্বাস করবারও সাহসের অভাব। কিন্তু নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব কখনই এতটা দুঃসহ মনে হয় নি; মাঝে মাঝে বরং পক্ষ পরিবর্তন করে একটু আধটু রোমাঞ্চ অনুভব করা গেছে মুখ পালটে নেওয়া গেছে। কিন্তু এই হিমালয়ে পদার্পণের সেই প্রথম মুহূর্ত থেকে সব কিছুরই এমন পরিমাণগত স্ফীতি ঘটেছে যে, অন্তর্দ্বন্দ্বের বিবদমান অংশ দুটোর আর এক অন্তরে স্থান-সংকুলান হচ্ছে না। ঈশ্বর এইখানে শীতল বিতর্কের ধরে-নেওয়া একটা সোপানমাত্র নয়; পাহাড়ের চূড়া থেকে মন্দাকিনীর গভীরতায় একবার দৃষ্টিপাত করলে তার সজীবতায় আর কোন সন্দেহ থাকে না। তাঁর আগ্রাসী অপ্রতিরোধ্য প্রভাবে মন পূর্ণ হয়ে যায়। সহজাত সংশয়বাদ হাঁপিয়ে ওঠে। অপর দিকে আবাল্য যে বস্তুতান্ত্রিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার দাসত্ব করে আসছি, যার কাছ থেকে আজীবন সাগ্রহে শিক্ষা গ্রহণ করে আসছি, তার প্রভাবও কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছি নে, পশ্চিমী নেশাও চোখ থেকে কিছুতেই কাটছে না। আগেই বলেছি যে, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব আমার

আজকের ব্যাধি নয়ঃ এমনও নয় যে এর যন্ত্রণা আজকে প্রথমই অনুভূত হল, তবে এতকাল ব্যাধিটাকে অনারোগ্য জেনে দু নৌকোতেই পা রেখে কোনক্রমে তাল সামলে টেনে-হিঁচড়ে চলছিলাম। কিন্তু দিগ্বলয়ে আজ আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস অত্যন্ত মর্মান্তিকরূপে স্পষ্ট। মতি স্থির করে আজ আমাকে একটা নৌকো থেকে পা তুলে নিতেই হবে। কাকে ত্যাগ করব—অর্ধ-অনুভূত হিমালয়ের ব্যঞ্জনা, অর্ধ-শ্রুত মন্দাকিনীর মূর্ছনা, না কি আমার আজন্মের আশ্রয় বহু-পরিচিত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা। সঙ্কীর্ণ হলেও যা সুনিশ্চিত।

পথ এখন আর আগেকার মত সমতল নেই, যদিও এ পথও মহাপ্রস্থানের পথ নয়—নির্মীয়মাণ বাস-পথ। মাঝে মাঝে একটু চড়াই উঠতে ও উৎরাই নামতে হচ্ছে। হাঁটুর ব্যথা যদিও এখনও নগণ্য, তবে দম ফুরিয়ে যাওয়ার কারণে কিছুক্ষণ পর পর কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। সবাই হয় এগিয়ে গেছে নয় পিছিয়ে পড়েছে। কাউকে অতিক্রম করে এসেছি, কাউকে এখনও ধরতেই পারি নি। আমি একা হাঁটছিলাম।

আচ্ছা, এমন কি হতে পারে যে, এই সমস্যাটার সমাধানের, এই দ্বন্দ্বটার নিষ্পত্তির প্রয়াসই বক্ষ্যমান যাত্রার গূঢ়তর উদ্দেশ্য! এই প্রশ্নই কি আমাকে ঘরের বার করেছে যে, প্রাচ্য—যার কথা কোনদিন বিবেচ্য বলেও মনে করি নি, অথচ শয়নে-জাগরণে যার স্মৃতি মুহূর্তের জন্যও উপেক্ষা বা অস্বীকার করতে পারি নি—সেই প্রাচ্যে সত্যই নির্ভরযোগ্য কিছু আছে কি না? পশ্চিমী-মাসীমার আশ্রয়ের চাইতে প্রাচ্য-মা শ্রেয় কি না? জন্মান্তরের ঐতিহ্য সম্বল করে কি আজন্মের শিক্ষা বিস্মৃত হওয়া সম্ভব বা সমীচীন? আমার চেতনার অন্তরালে কোনদিন উপরি-উক্ত প্রশ্নটা ছিল কি না, তা স্মরণ করবার কোন প্রয়োজন তখন আর অনুভব করলাম না। মনে হল, প্রশ্নটার গুরুত্ব অনস্বীকার্য এবং এর উত্তরের খোঁজে দুর্গম গিরিলঙ্ঘনও আদৌ অতিরিক্ত নয়। উদ্দেশ্যটা আবিষ্কার করতে কিছু বিলম্ব হয়ে থাকতে পারে, তাতে কি ক্ষতি? আমাকে চোখ মেলে দেখতে হবে যে, প্রাচ্য ঐতিহ্যের নামে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে যে ধোঁয়াটে একটা স্মৃতি জেগে ওঠে, যে অনির্দেশ্য একটা

আদর্শ—তার অন্তরালে সজীব, চিরন্তন, নির্ভরযোগ্য কিছু সত্য আছে কি না। আমি পক্ষপাতশূন্য থাকব। হিমালয়কে ভাল লাগলে পশ্চিমী সংশয়ের দ্বারা খুঁচিয়ে সেই সৌন্দর্যকে কুৎসিত করব না। অপর দিকে আমার মন যদি সংশয়ী বস্তুবাদেই আচ্ছন্ন থাকে তবে তাকেও মন্দাকিনীর জলে ধুয়ে ফেলবার সামান্যতম চেষ্টাও করব না। এইবারে 'হেড' হলেও আমার জিৎ; 'টেল' হলেও আমারই জিৎ। অগস্ত্যমুনি চটিতে পৌঁছে এক গ্লাস চায়ের নির্দেশ দিলাম।

চা-ওয়ালা কিন্তু নির্দেশমাত্র চা-পরিবেশনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল না। আমার দিকে আড়চোখে একবার চেয়ে, মানে আমি যে তার নজর এড়াই নি সেটুকু বুঝিয়ে, সে আপন মনে পেতল-বাঁধান হুঁকোয় টান মারতে থাকল। সজ্ঞানুযায়ী এমন ঔদাসীন্য শুধু বিরক্তিকর নয়, অবমাননাকরও। কিন্তু বিরক্ত হবার বা অপমান বোধ করবার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হল না। আমিও দোকানের সামনেকার বেঞ্চিটাতে দোকানদারেরই মত নিশ্চুপ নিথর হয়ে বসে পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

একের পর এক যাত্রী সারি বেঁধে পথ ধরে চলেছে, কেউবা দলের সঙ্গে, কেউ একা। লাঠিতে ভর দিয়ে চলেছে কেউ ধীর ক্লান্ত পদে; লাঠিটাকে কাঁধে ফেলে তার অগ্রভাগে চাদর বেঁধে কেউ হাঁটছে ধীর নিশ্চিত পদে। পথ সামনে প্রসারিত—অজটিল বন্ধুর সোজা পথ। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মন বিধুর হয়ে যায়; মনে প্রশ্ন জাগে, পারে যাওয়া কি একান্তই চাই?

কেয়া শেঠজী, দেখতে হ্যায় কেয়া?—চায়ের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে চা-ওয়ালা হঠাৎ প্রশ্ন করল। কোন জবাব খুঁজে না পেয়ে আমিও ওর প্রশ্নটারই পুনরুক্তি করলাম, আপলোগ ভি কেয়া কুছ দেখতেই রহতে থে?

হাঁ বাবু, হাম তো হরবখত দেখতেই রহতে হ্যায়। দেখনে দেখনে মে জীবনহি বীত গয়া, দিন ভি চলা যাতা।

ক্যাইসে, দেখনেকো এতনা কেয়া হ্যায়, যো দেখনে সে জীবন ভি বীত যাতা? প্রশ্নটির অর্থহীনতা আমার অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু আমার কৌতূহল তখন আর কোন বিধি-নিষেধ মানতে রাজি নয়।

প্রশ্নটা উচ্চারণের পরেও সম্পূর্ণ সপ্রতিভ রইলাম।

আমার প্রশ্নে চা-ওয়ালা একটুও অপ্রতিভ হল না। মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে কল্কের আগুনে আবার ফুঁ দিতে শুরু করল। মনে হল, আমার প্রশ্নের জবাব পেয়েছি। আবার পথের দিকে চোখ ফিরিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। যাত্রীরা চলছেই চলছে। কেউ খুঁড়িয়ে, কেউ সোজা হয়ে। কারও দৃষ্টি অনুসন্ধিৎসু, কারও বা প্রশান্ত, কারও বা ক্লান্ত।

জীবন কেয়া বাবু, এক জনমমে কেয়া সব কুছ দেখনে কা সময় মিলতা? হামারা ইয়ে জীবন তো স্রেফ যাত্রী লোগোঁকে পায়ের দেখতে হি বীত গয়া। আউর কেয়া, উয় পায়েরহি পুরা পছন সাকা? যুহুঁ, আজ তকভি কভি কভি ঠক যাতা। কোই শঠলোগকে সন্ত সমঝতা, আউর কোই সন্তলোগকোভি শঠ সমঝকে পাপ বাড়াতে যাতা। পায়েরভি ঈশ্বরকা সৃষ্টি হায় না!

ওই চা-ওয়ালার কথা পুরোপুরি অনুধাবন করবার শ্রদ্ধাবোধ আমার নেই। অপর দিকে যে বিদ্যায় আমি বিদ্বান তাতে করে ওর কথার অসংলগ্নতা ও অস্পষ্টতাই কেবল আমার কানে বাজল। কিন্তু সেদিন সম্পূর্ণরূপে হিমালয়ের প্রভাবমুক্ত ছিলাম না বলেই হয়তো ওর কথা অবোধ্য ঠেকলেও, আদৌ অর্থহীন মনে হল না। মনে হল, সম্মোহনের মাঝে বিস্মৃত কোন কথা যেন একটু মনে পড়ছে—কথাটা বুঝে উঠতে পারছি নে বটে, তবু শব্দটা যেন পরিচিত। বহুদূর থেকে পরমাত্মীয়ের ক্ষীণ কণ্ঠ আমার প্রবাসী কানে এসে যেন বাজছে। একবার যেন ইচ্ছে হল, সাড়া দিই, কিন্তু নিজের কর্কশ কণ্ঠের কথা স্মরণ করে মূক হয়ে রইলাম।

কিতনে হাজারো কিসিম কা পায়েরকে চালহি দেখা! কোই পায়েরমে দম্ভ দেখা, তো কোই পায়েরমে দেখা দাস্য। কোই পায়েরমে শ্রদ্ধা হায়, তো কোই পায়েরমে হায় হাস্য। এই সা যাত্রীভি তো দেখা, যিসকে পায়েরকে চাল দেখনেসে মালুম হোতা কি ইয়ে হিমাচল উনকে বাপকে নৌকর হায়। আউর—

ওর মেরু থেকে ও কথা বলে যেতে লাগল। আমি অপর মেরুর লোক। এককালে যদিও আমরা দুজন একই মহাদেশে ছিলাম। এই

বিচ্ছেদ কবে কে ঘটাল তা নিয়ে গবেষণা নিরর্থক। তবে বিচ্ছেদ যে ঘটেছে তা অনস্বীকার্য। এর আগেও যেমন এর পরেও তেমনই এই ধরনের অজস্র গাড়োয়ালী দার্শনিকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। কিন্তু তাদের একজনের সঙ্গেও অন্তরঙ্গ হবার সৌভাগ্য আমার হয় নি। ওরা সবাই দূর থেকে, পুরো একটা সংস্কৃতির দূরত্ব থেকে কথা বলে। ওদের কথা শোনা যায় তো বোঝা যায় না, বোঝা যায় তো উপলব্ধি করা যায় না। অথচ ওদের কথা উপেক্ষা করাও অসম্ভব; ওদের কথা কানে অসম্বদ্ধ লাগে বটে, কিন্তু মনে আনে প্লাবন। ওরা শুধু হিমালয়জ নয়, ক্যাঙারু-শাবকের মত হিমালয়াশ্রয়ীও। ওরা বুদ্ধিমান নয়, চায়ের সঙ্গে দুধের পার্থক্য ওরা বোঝে না; ওরা বুদ্ধ, নাস্তিকে ও আস্তিকে প্রভেদ আছে শুনলে হেসে ওঠে। এম্পিরিক্যাল বিচারে ওদের সব কথাই বালসুলভ,—অযৌক্তিক এবং অসম্বদ্ধ। কিন্তু কোন সত্যান্বেষী ওদের কথা অবহেলা করুক তো! যখনই ওদের কথা শুনতে বা বুঝতে চেষ্টা করেছি, তখনই পূর্বোক্ত বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় মন জর্জরিত হয়েছে। এই বিচ্ছেদ কি ঘোচবার নয়, এই বিচ্ছেদ কি ঘুচবে কোনদিন? বিদ্রোহী সন্তান কি আবার পিতৃক্রোড়ে আশ্রয় পাবে, আশ্রয় নেবে?

চা-পান সমাধা হয়েছিল, সিগারেট টানতে টানতে পথের দিকে চেয়ে উদাস মনে ভাবছিলাম। পথ দিয়ে যাত্রীদল চলেছে—বহু নীচে মন্দাকিনী বইছে, হিমালয় সহস্রাক্ষে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সেই ভদ্রলোক অতিক্রম করে গেলেন, যিনি চিরন্তন অক্ষয় অজরামরকে চান। সেই বুড়ি পেরিয়ে গেল, যে স্বামীকেও পরিত্যাগ করে এসেছে। সেই কর্নেল-বেয়ারা মৃদু হেসে আপন পথে চলে গেল। দেখতে দেখতে হঠাৎ যাত্রীদের প্রতি বিরূপতায় মন তিক্ত হয়ে যায়! কি বিস্ময়কর নিরুদ্বিগ্নতা, কি বিরক্তিকর নিশ্চয়তা! এদের একজনও কি বলতে পারবে, কেন এই পথে এসেছে? এদের একজনও কি নিজেকে জিজ্ঞেস করেছে প্রশ্নটা? সেই গড্ডলিকা-প্রবাহ, যাহা নগরে তাহা পর্বতে! জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকে কেবল যুগাতিযুগের জন্ম-জন্মান্তরের অভ্যাসগুলো অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করে যাওয়া। অপিসে যাওয়া ও কেদারনাথে যাওয়া যেন একই ক্রিয়াপদ!

ক্রমে কর্ণেল-পত্নীর সেই পারলৌকিক অভিভাবক আমাদের অতিক্রম করে গেলেন। চা-ওয়ালার পরামর্শমত আমিও ততক্ষণে পদক্ষেপ-পর্যবেক্ষণের প্রয়াস পাচ্ছি। আমার মনে হল, সাধুজীর পদক্ষেপে আধিপত্য ভাবটাই প্রবল। একটু পরেই তাঁর ভক্ত কর্ণেল-স্ত্রী এগিয়ে এসে পেরিয়ে গেলেন, তাঁর চলন যেন ক্ষীণ অশ্লীলতার ছোঁয়াচ সত্ত্বেও আনুগত্যপ্রধান। তারপরে এলেন কর্ণেল-কন্যা, সেই ষোড়শী; এঁর চরণে বিষাদ ভাবটা লক্ষণীয়। অবশেষে স্বয়ং কর্ণেল, পরনে সেই বুশ সার্ট ও সর্টস, তবু মনে হল তাঁর হতাশা তাঁর ঔদ্ধত্যকে অতিক্রম করেছে। ওঁরা সবাই চলে যেতে আমি চা ওয়ালার কাছে আমার প্রথম পর্যবেক্ষণের বিবরণ পেশ করে জিজ্ঞেস করলাম, কেয়া বাবুজী, ঠিক বোলা কি নাহি?

জরুর সাচ বোলা শেঠজী; কোই কেয়া কভি ঝুট বলনে সাক্তা কি সাচ নাহি বোলেগা! আপনে তো বিলকুল সাচ বোলা।

মগর উও কাইসে কি ঝুট নাহি বোল সাক্তা? ঝুট তো হো জানেভি সাক্তা।

কাইসে ভুল হোনে সাক্তা; আপনে যো দেখা হুয়া হোগা, আপকে পাশ তো উওহি সাচ হ্যায়। আউর উও সাচভি হ্যায়।

তব কেয়া, হাম যব বলেগা কি ইয়ে হিমালয় নীচা সে ভি নীচা হ্যায়, তব ইয়ে হিমালয় সাচমুচ নীচা হো জায়গা?

তব আপনে কেয়া ইয়ে সোচা হ্যায় কি হিমালয় সব কো পাশ উচাসে ভি উচা হ্যায়?

আপকে ইয়ে প্রশ্নকো তো কোই উত্তর নাহি। মগর আপকে বাত হাম তো মাননে নাহি সাকেগা।

আমি লাঠি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

নাহি নাহি, হামারা বাত কিউ আপ মানেঙ্গে। মগর আপনা বাতকো অবিশ্বাস না করনা।

চা-ওয়ালার কাছ থেকে পাওনা খুচরো ফেরত নিয়ে আমি আবার পথ ধরলাম। খুচরোগুলো প্রায় সবই অচল, একেবারে সীসে। সেই হৃষিকেশ থেকেই দেখছি এখানে অচল পয়সার অত্যধিক প্রচলন। কা'দের ধর্মভাবাতিশয্যে এমনটা ঘটেছে তার গবেষণা করে লাভ নেই,

তবে অচল পয়সা এখানে বিনা প্রতিবাদে নেওয়া যায়, কেন না দেওয়াও যায় বিনা অসুবিধায়। আশ্চর্য দেশ! হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মনে হল এই অচল পয়সাগুলোর সঙ্গে ওই গাড়োয়ালী দার্শনিকের কোথায় যেন একটা অতি সূক্ষ্ম জ্ঞাতিত্ব আছে। তাই নয়?

চলতে চলতে কিছুক্ষণ পরেই বুঝতে পারলাম যে, অগস্ত্যমুনিতে আমার অতক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া সমীচীন হয় নি। হাঁটতে যেন এখন অনেক বেশি কষ্ট হচ্ছে; পায়ের ব্যথাটা দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। চড়াইগুলো যেন বড় বেশি খাড়া, উৎরাই অনেক বেশি ঢালু। ফার্লং দুয়েক অতিক্রম করেই একবার মনে হল, একটু বসি। কিন্তু সবাই যে হাঁটছে। আমিও হাঁটতে থাকলাম। পায়ের ব্যথা ভুলতে হিমালয়ের দিকে তাকালাম, মনের ব্যথা তাতে সহস্রগুণ বাড়ল। নীচে মন্দাকিনীর দিকে চাইলাম, মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। বেলা তখন এগারোটা, সর্বাঙ্গ দিয়ে টসটস করে ঘাম ঝরছে। পর-মুহূর্তেই যেই হিমালয়কে নির্দয় বলে স্থির করব ভাবছি, অমনি সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি—। কিন্তু ওই কি সেই, না কি চোখের ভ্রমে শুভ্র মেঘকে মনে হচ্ছে তুষার-শৈল বলে? মিনিট পাঁচেক, না কি এক যুগ?—কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। এতটা যেন আশা করি নি। এ যেন পাওনার চাইতেও সহস্র লক্ষ কোটি গুণ বেশী দিয়ে ঈশ্বর আমাকে পরান্মুখ হতে বাধ্য করছেন। আপন গ্রহণ-ক্ষমতার প্রথম পরীক্ষায় আমি সম্পূর্ণ হতভম্ব পর্যুদস্ত হয়ে অনাথ বালকের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম।

অথচ এমন নয় যে জীবনে আমি এই প্রথম তুষার-শৈল দেখছি। এর আগে দার্জিলিঙের অবজারভেটরির উপর দাঁড়িয়ে একের পর এক আদিগন্ত অজস্র তুষারশিখর দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। দার্জিলিঙেরই ম্যালে দাঁড়িয়ে সূর্যকিরণে দীপ্ত দৃপ্ত কাঞ্চনজঙ্ঘার ভুবন-মনোমোহন অব্যক্ত রূপেও মুগ্ধ হবার অভিজ্ঞতা আমার আছে। সূর্যোদয়ের সময় প্রতিমুহূর্তে তুষার-শিখর কেমন নিজেরই রূপ লঙ্ঘন করে অপরূপ থেকে অধিকতর অপরূপ হতে থাকে—প্রতি পর-মুহূর্তে কেমন করে অবর্ণনীয় আপন বর্ণসম্ভারকে আপনারই বর্ণসম্ভারে লজ্জিত করে, টাইগার হিলের শীর্ষে দাঁড়িয়ে আমি

তা-ও প্রত্যক্ষ করেছি। তা ছাড়া আমি যে কেবল চলচ্চিত্রে 'কনকোয়েস্ট অব এভারেস্ট'ই দেখেছি তাই নয়, কর্ণেল হাণ্টের সেই বিখ্যাত ক্ষুদ্র গ্রন্থ 'অ্যাসেণ্ট অব এভারেস্ট'ও আমার পড়া। অতএব তুষার-শিখর যদি আমার কাছে একান্ত পুরনো কাসুন্দি না-ও হয়ে থাকে, তবুও তার মধ্যে অভিনব কিছু না-পাওয়া ও না-আশা করাই আমার পক্ষে সমীচীন হত, এবং তুষার-শিখরের কাছে নতুন কিছু আমি আশা করিও নি।

কিন্তু সেদিন ষোলই মে অগস্ত্যমুনি থেকে চন্দ্রাপুরী চটির পথে ঘর্মাক্ত কলেবরে, অবসাদগ্রস্ত মনে, ক্লান্ত পদে চলতে চলতে সামনে তাকাতেই যে তুষারদিগন্ত চোখে পড়ল সে দৃশ্য এর আগে আর কখনও দেখেছি বলে তো মনে হল না—শিরা-উপশিরায় যে শিহরণ লাগল তা অননুভূতপূর্ব! কথাটা কী, ভাবটা কী? এমন কেন হল, এমন কেন লাগল?—এই প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলোও আর স্মরণ রইল না। হতভম্ব হয়ে মিনিট পাঁচেক, না কি এক যুগ, পথিমধ্যে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আবার হাঁটতে শুরু করলাম। কাঞ্চনজঙ্ঘার কথা মনে পড়ল—দার্জিলিঙের ম্যাল থেকে দেখা কাঞ্চনজঙ্ঘা। না, কাঞ্চনজঙ্ঘার সেই গলিত কাঁচা সোনার রঙের পাশে বক্ষ্যমান পর্বতের শুভ্রতা যে-কোন কান্ততত্ত্বের বিচারেই ম্লান নির্জীব প্রতিপাদিত হতে বাধ্য। কাঞ্চনজঙ্ঘার ঐশ্বর্যের তুলনায় কেদারনাথ নিতান্তই রিক্ত। কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে আমার উচ্ছ্বাসের অন্ত ছিল না—সেই অভিজ্ঞতার কথা সবাইকে ডেকে শুনিয়েছি—সেই অভিজ্ঞতার পর গর্ব অনুভব করেছি, নিজে নিজে আপন মনে গান গেয়েছি। বক্ষমাণ পর্বত দর্শনে আমার হতাশ হওয়াই সুসঙ্গত ছিল, এর কথা তো কাউকে ডেকে শোনাবার মত নয়। বরং হৃদয়টাকে যেন কিসের ভারে নত বলে মনে হল। কিন্তু সে ভার যেন হতাশার নয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা সুন্দর ছিল, এ যে শিব! এইবারে কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত হাঁটতে লাগলাম—যেন আবেশগ্রস্ত, যেন নেশাগ্রস্ত।

আমি পেচকপ্রকৃতির লোক, অত আলো কি আমার সয়! নিজেকে ভয়ানক নিঃসঙ্গ বোধ করলাম। সাধারণ কয়েকটা পরিচিত অভ্যস্ত—ক্ষুদ্র এবং আত্মকেন্দ্রিক—অনুভূতি নিয়েই আমার বিনীত মূক জীবন

যাপন। বড়ো কিছুর মহৎ কিছুর সাধনাও নেই, প্রত্যাশাও সামান্য। মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে নিতান্ত অবহেলায় আমি প্রজনিত। অপরাপর অভিশপ্ত মধ্যবিত্ত সন্তানদের মতোই অনাকাঙ্খিত। নাগরিক জীবনের গ্লানিকর ক্লান্তি সাময়িকভাবে বিস্মরণের ব্যর্থ চেষ্টার অশ্লীল এককণা স্মৃতি। উপেক্ষাভরে প্রতিপালিত, অযত্নে বর্দ্ধিত। আঁতুরঘর থেকে রওয়ানা হয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনক্রমে একবার কেওড়াতলা পৌছতে পারলেই জীবন নামধেয় অশ্লীল সমস্যাটির, অভিশপ্ত ঘটনাটির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। সেখানেই তামাম সুদ। চেতনার অন্তরীক্ষ চেতনোদয়ের আগে থেকেই মেঘাচ্ছন্ন ; সেখানে কোনদিন সূর্য হাসে নি; রামধনু পাখা বিস্তার করেনি। ক্বচিৎ কখনো দুটো-একটা কষ্টকল্পিত মূঢ় আদর্শ ফানুসের মতো পরাস্ত সন্ত্রস্ত ঔদ্ধত্যে হয়তো সেই অন্ধকার ভেদ করতে চেয়েছে, কিন্তু জীবনের সঞ্চিত বিষশ্বাসে সব প্রয়াস শুদ্ধ হয়ে গেছে অঙ্কুরেই। এমন জীবনকে নদীস্রোতের সঙ্গে তুলনা করা বাতুলতা, নদী পারাপারের সঙ্গেও এর কোন সম্পর্ক খুঁজতে যাওয়া সমান হাস্যকর। কর্দমাক্ত ধাতব পথে বাজারের ভীড় ঠেলতে ঠেলতে অকস্মাৎ একদিন কেওড়াতলায় পৌছানো; এহেন জীবনের অপর কোন নাম নেই, অন্য কোন উপমা নেই। যে জীবনে বিস্তারের সম্ভাবনা নেই, প্রসারের পরিসর নেই সে-জীবনকে অভ্যস্ত অনুভূতি ও পরিচিত পরীক্ষিত ঘটনা সমূহের সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ করে রাখাই সুবিবেচকের কাজ। আকাশে উড়ে পালাবার পাখায় যদি পক্ষাঘাতই হয়ে থাকে তাহলে সেই উদারতা থেকে দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত রেখে আত্ম-বিবরে নিদ্রিত থাকাই ভালো! অমন বিক্ষেপের জন্য একটি পতিব্রতা স্ত্রীই যথেষ্ট, তা-ও যদি বরাতে না জোটে তবে কফি-হাউস আছে, সাহিত্যালোচনা আছে, আন্তর্জাতিক রাজনীতি আছে। এ্যাস্পিরিনে যদি নিদ্রাবেশ না আসে তবে আছে সোনেরিল !

মোদ্দা কথা হচ্ছে—জীবনটা যে আসলে একটা অভিশপ্ত ঘটনার পর অপর একটা অভিশপ্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি বই অন্য কিছু নয় সে-কথা বুঝতে তখন, সেই অপরিণত বয়সের অনভিজ্ঞতায়ই আমার আর বিশেষ বাকী ছিল না। আমার সুনিশ্চিত ধারণা ছিল যে,

জীবন নামধেয় অশ্লীল ঘটনটার যথাযথ মূল্য আর আমার অজানা নেই। আদি-অন্ত-হীন কীটদষ্ট পুরানো গ্রন্থটি বহুবার পাঠ করা হয়ে গেছে,—এর কাহিনীতে নতুনত্বের লেশমাত্র নেই, এর পরিণাম অনিবার্য্যরূপে পূর্বস্থিরিকৃত। কণামাত্রও কৌতূহল নেই তবু জন্মান্তরের বাধ্যবাধকতায় একটির পর একটি পাতা উল্টে যেতে হবে, অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে গ্রন্থটি পাঠ করবার ভান করতে হবে। বয়সোচিত ঔদ্ধত্য সত্ত্বেও জীবনের কঠোরতর অনুশাসনের সম্মুখে আমি শির উন্নত রাখবার চেষ্টা করি নি, শির উন্নত রাখি নি; অভিনিবেশ সহকারে না হলেও অন্তত অভ্যাসবশে সুবোধ বালকের মতো দিনের পর দিন একটির পর একটি পাতা উল্টে গেছি। সকাল হলেই আপিস, সন্ধ্যাবেলায় পানাগার বা কফি-হাউস অথবা রাজনীতির কিম্বা সাহিত্যের আড্ডা হয়ে আবার আত্ম-বিবরে। আকাশে প্রতিদিন সেই একই পুরানো সূর্য্য উদিত হয়, অস্ত যায়। আশা নেই তাই হতাশ হই না। জন্মান্তরের বাধ্যবাধকতায় কেবল পঠিত পুস্তকের পাতা উল্টে যাওয়া। মাঝে মাঝে কেবল হিসেব ক'রে দেখা যে কেওড়াতলা আর কত দূরে। ক্ষুদ্র সসীম সঙ্কীর্ণ জীবন; নিজেকেই বারবার নেড়েচেড়ে দেখা, ফিরে ফিরে কেনা বেচা। তাইতেই অভ্যস্ত, তাইতেই তুষ্ট।

এমনি হিসেব করে করে সন্ত্রস্ত পদে পথ চলতে চলতে অকস্মাৎ কি পথ-বিভ্রম ঘটল, অগস্ত্যমুনি চটি ছাড়িয়ে সামান্য একটু পথাতিক্রমের পরেই সামনে তাকিয়ে দেখি—, যা-কে এতকাল দেখবার ঔদ্ধত্য হয়নি বলে যার অস্তিত্বেই এতকাল সংশয় প্রকাশ করে এসেছি। কিন্তু এতকাল পরেও তা'কে চিনতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হল না, সে-যে আমার আমিত্ব ছাড়িয়ে আরও বেশী নিকটের! আরও বেশী আমার। শুভ্র তুষার-পর্বতের আগ্রাসী উদারতায় পুঞ্জীভূত সঙ্কীর্ণতা, এমন কি আমার সেই সযত্নলালিত মহামূল্যবান আমিত্বটুকু পর্যন্ত নিঃশেষে ধুয়ে মুছে গেল। ত্র্যম্বকের যুগ-যুগ-সঞ্চিত অট্টহাস্যে আমার দুর্বল মনের ছিঁচকাঁদুনি মুহূর্তের মধ্যে ঢাকা পড়ে গেল। শুভ্র, কি আশ্চর্য শুভ্র! শিব, কি বিস্ময়কর শিব!

এখন মনে হচ্ছে এই ভ্রমণ-কাহিনী আদৌ লিখতে না বসলেই ছিল

ভাল। কেন না, যে যে ঘটনার কারণে কাহিনীটিকে মূলত উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়েছিল, এখন লিখতে বসে দেখছি সেই ঘটনাগুলোর প্রত্যেকটাই বর্ণনাতীত, একটিও শব্দগ্রাহ্য নয়, সবকটাই মূল্যবান একমাত্র অভিজ্ঞের অভিজ্ঞতায়। এই যে, এই মাত্র আমার প্রথম কেদারপর্বত দর্শনের অভিজ্ঞতা বিবৃত করবার প্রয়াস পেলাম, তাতে কি সেই অভিজ্ঞতার সহস্রাংশের একাংশও পরিস্ফুট হয়েছে? ছাই হয়েছে! এই বিবরণপাঠে অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ ভাবগ্রাহী পাঠকের মনেও যে ছবি ভেসে উঠবে তা আমি জানি,—একটি অসম্বদ্ধতার স্তূপমাত্র। বড় জোর একরাশ অবোধ্য ভাববিলাসিতা। এই জন্যেই বোধ হয় আমার পূর্বসূরীরা তাঁদের অব্যক্ত অভিজ্ঞতাগুলোর কোন বিবরণ দেবার প্রয়াস পান নি,—কেবলমাত্র ভ্রমণ-পথের ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন। আপন অক্ষমতা সত্ত্বেও আমি যে মহাজনদের পথ অনুসরণ করি নি, তার কারণ আলোচ্য বিষয়টি দেখবার কোন ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ আছে বলেই আমি বিশ্বাস করি নে। তা ছাড়া, বস্তুবাদী বলে প্রশংসিত হবার চাইতে ভাববাদী বলে নিন্দিত হওয়াকে আমি শ্রেয় মনে করি। আর সর্বোপরি যে দৃশ্যে আমি নিজে উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করেছি সে দৃশ্যের বিবরণপাঠে পাঠক যদি কিঞ্চিত বিভ্রান্ত বোধ করেন তবে তা সাঙ্ঘাতিক অযৌক্তিক হবে না। এইটে তো আর কাহিনী নয়; ভ্রমণ-কাহিনী। লেখকের অভিপ্রায় বা অভিরুচির সঙ্গে এর সম্পর্ক ন্যূনতম।

এইটে যদি কাহিনী হত তবে এর পরের ঘটনাটিরও আমি উল্লেখ করতাম না। কারণ আমি জানি যে, পূর্বোক্ত ঘটনাটির বিবরণ যদি নিছক ভাববিলাসিতা হয়ে থাকে তবে এর পরে যে ঘটনাটি বিবৃত করতে যাচ্ছি সেইটে হবে গতকালের ভাববিলাসিতা। কিন্তু অবিমিশ্র সত্য ও নির্ভেজাল মৌলিকতা যদি এই গ্রন্থে আমার আপোসহীন লক্ষ্য হত, তা হলে এই বই আদৌ লিখিতই হত না। অতএব এইটে ভ্রমণ-কাহিনী—সেই অজুহাত স্মরণ করে আমি এখনকার মত পাঠকের ওষ্ঠপ্রান্তের কুঞ্চনটুকু উপেক্ষা করব। যিনিই মনঃক্ষুন্ন হোন, ঈশ্বরের অমৌলিকতার জন্যে তো আমি দায়ী নই। তাছাড়া এমন একটা অভিনব এপিক রচনাই যে আমার কেদার-বদরি যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য

সে-কথা সম্ভবত বিধাতা-পুরুষের সঠিক জানা ছিল না। তা-ই এমন সব অনাসৃষ্টি ঘটনা।

যাই হোক, উদ্‌ভ্রান্তের মত পথ হাঁটছিলাম। দুই পাহাড়ের মাঝপথে বহুদূরে তুষার-সীমা দেখা যাচ্ছে, নীচে মন্দাকিনী আপন ছন্দে বয়ে চলেছে, গেয়ে চলেছে। মন্দাকিনীর অপর প্রান্তে পাহাড়ের গায়ে ছবির মত আঁকা ছোট ছোট গ্রাম—আপন সৌভাগ্যে নিজেকে বিস্মৃত হয়ে অনায়াসে দুর্গম চড়াই ভেঙে এগিয়ে চলেছি। পায়ের ব্যথা ভুলে গেছি, দেহের ক্লান্তি ভুলে গেছি, কেন চলেছি স্মরণ নেই, কোথায় চলেছি খেয়াল নেই—শুধু চলেছি। তখনকার মত ওইটুকুই যথেষ্ট ছিল।

অকস্মাৎ ছন্দপতন ঘটল। দেখি, অদূরে পথিপার্শ্বে পাহাড়ে হেলান দিয়ে একটি মেয়ে বিশ্রাম করছে। দেখলেও যেন খেয়াল করি নি এমনি ভান করে ওকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবার চেষ্টা করলাম।

আপনার ওতে কি জল আছে?

না থেকে উপায় ছিল না, অতএব ছিল। দু পা পিছিয়ে এসে জলের বোতলটা ওর হাতে দিয়ে বললাম, কিন্তু পথ চলতে চলতে জল খাওয়া উচিত নয়। আপনি কতক্ষণ বসেছেন? আমার প্রশ্ন শেষ হবার আগেই বোতল উপুড় করে মেয়েটি জলপান সুরু করে দিল। অগস্ত্যমুনির মত; যেন তৃষিত মরু। ইত্যবসরে ওকে ভাল করে দেখে নেবার সুযোগ ঘটল। বয়স্ ষোলই হবে কিংবা সতেরো। বর্ণ, বিয়ের বিজ্ঞাপনে গৌর বললে অনৃতভাষণ হবে না, আসলে উজ্জ্বল শ্যাম বলতে যে অনির্দেশ্য রঙটা বোঝায় অনেকটা সেই। প্রশস্ত ললাট; নাসিকা হ্রস্ব, তীক্ষ্ণ এবং তার অগ্রভাগটা যেন একটু তোবড়ানো। চিবুক সূক্ষ্ম; মাথার কেশ অনভিজাত রকম ঘন নয়, সামান্য কুঞ্চিত, প্রশস্ত ললাটের উপরে যা দেখে মনে হয় এর সমস্ত চিন্তা প্রসাধনেই ব্যস্ত নয়। দেহ তন্বী; অনেকটা বেতস লতার মত; অনেকটা যেন বায়ুর পটে বায়ু-রঙে আঁকা বায়বীয় এক উর্বশী-চিত্র। পরনে সালোয়ার, ফিকে নীল রঙের পাঞ্জাবী ও গলায় অনির্দিষ্ট ফিকে রঙের একটা দোপাট্টা। সব মিলিয়ে, মনে হল, পর্বতের পটভূমিতে মেয়েটি যদিও ঠিক খাপ খাচ্ছে না, তবু দেশী মেয়ের কবরীতে পরদেশী ফুলের মত বেশ মানিয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে মেয়েটির জলপানের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়েছিল। মেঘের আবরণ ভেদ করে মেয়েটি যুগপৎ তৃপ্ত ও প্রশান্ত হাসি হেসে বলল, তা বসেছি প্রায় দশ মিনিট।

জলের বোতলের জন্য আমি হাত বারালাম।

দাঁড়ান, আর একটু খেয়ে নি। উঃ, যা তৃষ্ণা পেয়েছিল। সেই ছত্তৌলির পর রামপুর চটিতে এক গেলাস চা খেয়েছিলাম। ব্যস। আমাদের ওয়াটার-বটলটা সাধুজীর কাঁধে ঝুলছে আর তিনি তো শ্বশুরবাড়ি চলেছেন, তাও সবার আগে আগে। আর সবাই বাঁচুক কি মরুক সে দিকে খেয়াল নেই। ধন্য ভগবানের সৃষ্টি! শেষ ক'টি কথা বেশ ঝাঁজের সঙ্গে বলে মেয়েটি আবার বোতল উপুড় করে জলপান করতে লাগল। এইবার ওর নিমীলিতপ্রায় চোখে কৃত্রিম সপ্রতিভতার কুহক ভেদ করে বহুদূরাগত কিন্তু অনপনেয় অবসাদের স্পষ্ট ছাপ যেন দেখতে পাওয়া গেল। মেয়েটির জন্যে এইবার একটু করুণা হল। সমস্ত বিশ্ব-চরাচর যেন একটু ঘনিষ্ট হয়ে এল।

আপনি কেন এই পথে আসতে গেলেন?

মুখ থেকে জলের বোতল নামিয়ে মেয়েটি আর এবার আমার দিকে চাইল না। নিজেকে ভুলে কিছুক্ষণ যেন মন্দাকিনীর সঙ্গীত শুনল। কিছুক্ষণ যেন চিরন্তন যাত্রীদের মৃদু পদধ্বনি ও তার প্রতিধ্বনি অনুসরণ করল। তারপর তুষার-সীমার দিকে তাকিয়ে যেন তুষার-সীমা অতিক্রম করে নিবিষ্ট চক্ষে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। পূর্ণ নৈঃশব্দ্যে পুরো পাঁচ মিনিট কাল গতিহারা নিথর হয়ে রইল।

কিন্তু নিস্তব্ধতা এখানে দুই বাক্যের মধ্যেকার দুরত্ব নয়, সেতু। পাঁচ মিনিট পরে উত্তর করল:

তা তো জানি নে; তবে এখানে আসতে আমাকে হতই। মেয়েটির স্বরের ক্ষীণতায় বাক্যের দৃঢ়তা ঢাকা পড়ল না। কাঁধে জলের বোতল ঝুলিয়ে, মেয়েটিকে পিছনে ফেলে আবার এগিয়ে পথ হাঁটতে থাকলাম।

এমন কেন? এ কেমন করে সম্ভব?—এ তো মিথ্যে নয়, কিন্তু এ কেমন করে সত্য হতে পারে? মেয়েটির মত নিশ্চিত পদক্ষেপে আমি তো আজ পর্যন্ত এক পা-ও এগোতে সক্ষম হলাম না। অথচ

এই পথপরিক্রমার সম্ভাব্য কারণ সম্পর্কে ও কি আমার অর্ধেকও গবেষণা করেছে? আমার চাইতে ও কম বিকৃত এমনও নয়, বরং পশ্চিমের প্রভাবে ও-ই বেশী প্রভাবান্বিত। তবু ওর ওই নিশ্চয়তার শতাংশের একাংশও তো আমি আজ পর্যন্ত সংগ্রহ করে উঠতে পারলাম না। আজও আমার পা প্রতি পদক্ষেপেই সংশয়ে কাঁপছে, জিজ্ঞাসায় দ্বিধান্বিত, অবিশ্বাসে পিছিয়ে পড়ছে কিন্তু এই কথাটাও তো স্বীকার করতে পারব না যে এ-পথে আমার চাইতে ওই কৃত্রিমতার প্রতিমূর্তিটির অধিকার বেশী। তবে, এ কেমন করে সম্ভব হল?

হিমালয় নীরব রইল, দূর দিগন্তে মেঘের অচ্ছোদ অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে তুষার-শিখর মৃদু হাসতে থাকল, নীচে মন্দাকিনী আপন খরবেগে বয়ে চলল। একবার মনে হল, আমি বোধ হয় বড় বেশী সাবধানী,—ফুল ছিঁড়ে আমি হয়তো ফুলের সৌন্দর্য খুঁজছি, তাই আমার জিজ্ঞাসা প্রতিবারই কেবল প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে যাচ্ছে, সাধনা প্রতিবারই ব্যর্থ হচ্ছে। কিন্তু নিজের জগৎ তো দূরে ফেলে এসেছি, তবুও কেন আজ বার বার নিজেরই চারিদিকে ঘুরে মরছি? এই গোলকধাঁধা থেকে কি নিষ্ক্রমণের পথ নেই? নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্যে ওপারের গ্রামগুলো ঘুমোতে থাকল, পায়ের তলা থেকে মন্দাকিনীর তটদেশ পর্যন্ত পাকা গমের সোনালী শীষ আপন ছন্দে হেলতে দুলতে থাকল। কিছুক্ষণ পরে, কখন দেখি আমার প্রশ্নটাই ভুলে গেছি, তার যে কোন জবাব পাওয়া যায় নি সে কথাটুকুও আর স্মরণ নেই।

কিছুদূর অগ্রসর হ'তে দেখি পথের পাশে ননী বসে আছে। একটা পাথরের উপর। যষ্টিখানা পাহাড়ের গায়ে হেলানো; তিক্ত অবসন্ন চেহারা। বীতশ্রদ্ধ দৃষ্টি, যেন সাক্ষাৎ মোহমুদ্গর! অধিকতর উৎসাহের প্রয়োজন ছিল না; দূর থেকেই বত্রিশ পাটি দাঁত প্রকটিত করে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে আমি একটু বসবার উপক্রম করলাম। প্ররোচনারও আর প্রয়োজন ছিল না।—আমি পুরোপুরি উপবেশন করবার আগেই ননী লাঠি হাতে সটান উঠে দাঁড়াল এবং মুহূর্তমধ্যে পার্বত্য-পথের নিকটতম বাঁকে নিশ্চিহ্নে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেল। একটা ক্ষণিক দুঃস্বপ্নের মতো। বিস্মিত হবার আগেই আমি অট্টহাস্যে ফেটে পড়লাম।

কিন্তু তারপর একটা সিগারেট ধরাতেই আর নিজের কাছ থেকে আত্মগোপন করা গেল না। অপরাধটা পুরোপুরি তলিয়ে দেখবার আগেই ঘৃণায় সমস্ত দেহ-মন শিহরিত হয়ে উঠল। অপরাধের সত্যতাটুকু প্রতিষ্ঠিত করাও যেন বাহুল্য! অধিকতর দোষনীয়, ততোধিক অপমানকর।

মুহূর্তমধ্যে সমগ্র বিশ্ব-চরাচর যেন বিপর্যস্ত হয়ে গেল। বিকৃত বিকট অপরিচিত অস্তিত্বহীন। বঞ্চিত জীবনের বিক্ষুব্ধ কোলাহলে মুহূর্তকাল আগেকার সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা নিঃশেষে হারিয়ে গেল। ওপারের গ্রামগুলো ওপারেই নির্বাসিত রইল। মন্দাকিনীর তটদেশ পর্যন্ত পাকা গমের সোনালী শীষ মাতালের মত অর্থহীন টলতে থাকল। কোথাও সুর নেই, সৌন্দর্য নেই, এমন কি সামান্যতম সমবেদনাও নেই। বিশ্ব-চরাচরে সব বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন বিরোধী। পথক্লেশকে মনে হ'ল পূর্বজন্মের পাপক্ষয় মাত্র। হিমালয় একটা নিছক ভৌগোলিক ঘটনা, আর কেদারনাথ যেন আপন বাতুল ভাববিলাসিতায় আপনিই বিমূঢ় হয়ে আছে। আপন অকিঞ্চিৎকরতায় আপনিই অপ্রতিভ।

নিজেকে ভুলিয়ে নিজের হাত থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ, যাত্রীদের প্রতি মনোনিবেশের প্রয়াস পেলাম; কিন্তু বৃথা প্রয়াস! কারো সঙ্গেই আর কণামাত্র অন্তরঙ্গতা নেই। যে-সকল চিন্তায় জীবনের অজস্র বিনিদ্র রজনীর শূণ্যতা বারম্বার পূর্ণ করেছি সেই সবও কেমন যেন ফ্যাকাসে মনে হল, গুরুত্বহীন অগভীর। অবশেষে আর আপন কঙ্কালটিকে আস্তিনের তলায় গোপন রাখা গেল না। ঘৃণায় ক্লেদে সমস্ত দেহমন শিহরিত হয়ে উঠল!

অপরাধ-স্খালনের আর কোন উপায় নেই জেনে এইবার—যেমন হয়—সুরু হল দ্বিগুণ আক্রোশে নিজের উপর নির্দয় আক্রমণ! অভিশপ্ত সত্তার নগ্ন বীভৎসতায় বিকৃত বঞ্চিত চেতনা বিমূঢ় হয়ে থাকল। আঘাতপ্রাপ্ত ক্ষত অশ্লীল নিষ্ঠুরতায় মুখব্যাদান করে রইল। সব মিথ্যা, আগাগোড়া আত্ম-প্রতারণা! এই কেদার-বদরিকার পথে পদক্ষেপ করবার প্রথম মুহূর্ত থেকে যতো মহৎ ভাবে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়াস পেয়েছি, যত নৈর্ব্যক্তিক চিন্তায় নিজেকে নিয়োগের চেষ্টা করেছি,—বিভক্ত ব্যক্তিত্ব, সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব, আত্ম-অনুসন্ধান,

প্রাচ্য-প্রতিচ্য!—সব সব সব কিছুই নিছক সস্তা চাতুরী, স্থূল কপটতা। অগস্ত্যমুনি চটির সেই নিবিষ্টতা, কেদার-পর্বত অবলোকন করে ভাবাবেগে অমন বিস্ময়-বিমূঢ় হওয়া—আসলে এই সবই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন! সবই কেবল নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার বাতুল প্রয়াস। সহজাত ব্যাধিটি অস্বীকার করবার মর্মান্তিক ছলনা। অতৃপ্ত রীরংসার অন্তর্দাহী দৃষ্টি এড়াবার অসহায় চেষ্টা! নইলে প্রথম সুযোগেই অত সহজে অমন অশ্লীল আত্মোদ্‌ঘাটন ঘটবে কেন? এক অজ্ঞাতকুলশীলার তৃষ্ণা-নিবারণে অমন উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠবার অন্য কি কারণ থাকতে পারে? নইলে অতগুলো অবান্তর কথা উচ্চারণ করলাম কি করে, শুনতে গেলাম কেন অত ধৈর্য ধরে!

জটিল সমস্যাটির চেহারা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হতে থাকল। একরাশ বঞ্চনা হতাশা এবং অতৃপ্তির বোঝা কাঁধে নিয়ে কেদার-বদরিকার পথে চলেছি কি-না অক্ষয় পুণ্যার্জন মানসে! ধুতরো গাছে পারিজাত ফোটাবার সাধনা! আর সেই সাধনার কি ঐকান্তিকতা, সামান্যতম অজুহাতে থলে থেকে সুর সুর করে বেড়াল বেরিয়ে এল! অথচ এর পরিবর্তে আর কি করবার ছিল।—পরিচিত ক্লীবত্বে ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হয়ে অবশেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া! নাগরিক জীবনের ক্রমবর্দ্ধমান বঞ্চনা ও অতৃপ্তির স্তূপের তলায় নিঃশেষে নিষ্পেষিত হওয়া।

কেদারনাথ মূঢ়ের মতো ভাবলেশহীন তাকিয়ে রইল। প্রগলভা মন্দাকিনী আপন মনে অর্থহীন বকবক করতে থাকল। ইতিমধ্যে আমি কখন উপর্যুপরি তৃতীয় সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ছিলাম। সেদিকে লক্ষ্যই ছিল না।

এমন সময় পর্বতের নিকটতম বাঁক ঘুরে অকস্মাৎ স্বয়ং কর্ণেল কন্যা অকুস্থলে সমুপস্থিত হলেন। এইবারে যে আমার পাত্রে আর এক ফোঁটাও জল নেই সে-কথা হয়তো তিনি বিশ্বাস করতেন না। হাতের সিগারেটটায় সুখ-টান না দিয়েই ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, এবং কোন দিকে দৃক্‌পাত না করে দুর্গম পথে দ্রুত পা চালিয়ে দিলাম। ক্লেশ সত্ত্বেও; ক্লেশকর বলেই।

ক্লেশ সত্ত্বেও—ক্লেশকর বলেই—কিছুটা পথাতিক্রমের পর কথঞ্চিত

সুস্থ বোধ করলাম। হিমালয়ের চাইতে সংক্রামক আর কিছু হয় না,—কয়েক পা অগ্রসর হতেই কেদারনাথ আবার নিকটতর হতে থাকল,—আত্ম-রুদ্ধতা অতিক্রম করে স্বাভাবিক গতিতে শ্বাস-প্রশ্বাস বইতে লাগল। কিছুক্ষণ পরেই নিজেকে আবার সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেললাম। স্পষ্ট অনুভব করলাম, আমি যাত্রী মাত্র! সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে চলেছি, দায় কেবল পথাতিক্রমণ। পথিপার্শ্বের সুখ-দুঃখ পথের পাশেই ছেড়ে আসতে হয়, পথিপার্শ্বেই পড়ে থাকে। জীবন-ট্রাজেডির আমি নায়ক বটে,—তার স্তুতি ও নিন্দা, সবই আমার,—কিন্তু জীবনের পথ এই প্রেক্ষাগৃহের বাইরে। স্তুতি ও নিন্দা সুখ ও দুঃখ সেখানে সমার্থক; উভয়ই সমান নিরর্থক। সেখানে আমি যাত্রী। একমাত্র দায়িত্ব পথাতিক্রমণ। পঠিত গ্রন্থটিই নব ব্যঞ্জনায় ভাস্বর হয়ে উঠল।

অবশেষে আমাদের সেদিনকার প্রাতঃকালীন গন্তব্যস্থল চন্দ্রাপুরী চটিতে এসে যখন পৌঁছলাম, বেলা তখন বারোটা। চন্দ্রা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমে এই সমৃদ্ধ, প্রায় শিল্পপ্রধান, চটিটি অবস্থিত। অতি সঙ্কীর্ণ ও শীর্ণ একটি রোমাঞ্চকর দড়ির ঝুলায় চন্দ্রা নদী পেরিয়ে চটির প্রবেশ-পথ। চন্দ্রা নদীকে ঝরণা বলে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। চন্দ্রাপুরী চটিটি বড় মনোরম, এমন সপরিসর চটি কেদারনাথ পর্যন্ত আর একটিও নেই। হিমালয়ের ক্রোড়ে প্রায় ফার্লঙ আড়াই সমতল ব্যেপে গমক্ষেত। ক্ষেতের মাঝখান দিয়েই চটির পথ—চটি অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী, অনেকগুলো দোকান আছে আর সে সব দোকানে আলু ও চাল ব্যতিরেকেও দু-চারটে পণ্য পাওয়া যায়। আমার নাগরিক সমারোহপুষ্ট মন চন্দ্রাপুরী চটিতে পৌঁছেই হাল্কা উচ্ছলতায় নেচে উঠল।

পথে আজ আমার বিলম্ব হয়েছিল সর্বাধিক। এমন কি কুলি ছড়িদারও আজ আমার আগে পৌঁছে গেছে। চটিতে প্রবেশ করে দেখি ইতিমধ্যে কেবল যে বিছানাপত্রই খোলা হয়ে গেছে তাই নয়, উনানেও হাঁড়ি চেপেছে এবং মনোমালিন্যের প্রথম অঙ্কও শেষ। ননীবাবু চটির কোণে বসে হাঁটু মালিশ করছেন, তাঁর ভ্রূ-কুঞ্চিত, ওষ্ঠ বিকৃত, যেন পাঁচনটুকুর অবশিষ্ট এখনো মুখে লেগে আছে। বুঝতে বিলম্ব হল না যে ঝড়ের এটা ক্ষণিক বিরতি মাত্র। এলো-গায়ে কোমরে-গামছা

বেঁধে তারাদা উনানে কাঠ গুঁজলেন। উনানে কাঠ গুঁজবার সে কি নেপোলনীয় ভঙ্গী—উনানটা যেন উনান নয়, প্রতিপক্ষের মুখ! এমন অবস্থায় চটিতে ঢুকে অপ্রতিভ হয়ে পড়লাম—যেন দাম্পত্য কলহের মধ্যে উপস্থিত হয়েছি। ওঁদের সঙ্কীর্ণতায় আমার সমস্ত উচ্ছ্বাস সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেল। এই ভেবে অধিকতর ভীত হলাম যে, এক্ষুনি তো ওঁদের মনোমালিন্যে মধ্যস্থতা করতে হবে। কিন্তু, এমন সময়, নীলমণি আমায় বাঁচাল। গায়ের কোটটা আমি খুলতে না খুলতেই তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠল।

কি আজ এত দেরি যে, কাবু হয়েছেন বুঝি? হাঃ হাঃ! ওর হাসির কৃত্রিমতাটুকু খেয়াল করে আমিও চেষ্টাকৃত সোৎসাহে হেসে উঠলাম:

হাঃ হাঃ।—নাঃ, সেইটুকু আর আজ অস্বীকার করতে পারব না।

কিন্তু দেখুন তো, আমি এখনও কেমন ফিট। চটপট বার কয়েক ওঠবস করে, দু-চার বার হাত ছুঁড়ে ও মুড়ে বুকের পাটায় পাঁচ-সাতটা চাপড় মেরে নীলমণি ওর ফিটনেস-এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিল। তারপর বলল, আসুন, একটু মলাই করে দিই।

দিন দাদা, দিয়ে একটু বাঁচান। নয়তো বুঝি এখান থেকেই উদ্দেশ্য-প্রণাম করে ফিরতে হয়। আড় চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে নীলমণির দিকে একবার চাইলাম; আড়চোখ আরও নিমীলিত করে নীলমণি নিশ্চুপ থাকবার পরামর্শ দিল। জানলা-পথে তাকিয়ে দেখি, দূর থেকে তুষার-শিখর আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে, লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

স্নানার্থে মন্দাকিনী তটে এসে নীলমণি হঠাৎ মৃদু হেসে বলল: আজকের এই গণ্ডগোলের জন্যে কিন্তু পুরো দোষ আপনার! মন্দাকিনীর তটদেশ যেন আক্ষরিক অর্থেও ঠিক তাই। নুড়ি আর নুড়ি, ছোট বড় অজস্র। কল্লোলমুখর অচ্ছোদ জলধারা যেন পুরোটাই কবির কল্পনা। একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি কেবল একমুখ ধোঁয়া ছাড়লাম।

নীলমণিই আবার বলল, কি প্রয়োজন ছিল আপনার অমন ভাবে পাত্র উজার করে দেবার! নীলমণিও একটু থামল, তারপর শুধু বলল,

একটু বিবেচনা করে দেখলে পারতেন। এমন অঘটনটা তা হোলে আর ঘটত না।

আর ঘটবে না। আমি সিগারেট টানতে থাকলাম। ননীর অমন বিকৃতির যদি আমিই নিমিত্ত হয়ে থাকি, তাহোলে আর কখনো অমন অবিবেচনার কাজ করবো না। দেখবেন!

হাওড়ার নীলমণিও এইবার একটু অপ্রস্তুত না হয়ে পারল না। কিন্তু এর প্রত্যুত্তরে অশ্লীল রসিকতাটুকুর সম্ভাবনায়ই আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে এল। তাড়াতাড়ি বললাম: বরং তৃষ্ণায় প্রাণ সম্বরণ করব, কিন্তু কাঁধে করে জলের বোতল বহন করা—শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ!

এর পর নীলমণিও অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল। আমিও!

সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের পরিকল্পিত গন্তব্য-চটি ছিল গুপ্ত কাশী। কিন্তু ভীরী পৌঁছেই রাত্রির মত থামতে হল। কমিয়ে বলবার ইংরেজি-গুণে যারা ইংরেজদের চাইতেও বাড়া, সেই স্থানীয়েরা যখন বলল, গুপ্তকাশী পর্যন্ত পরবর্তী পাঁচ মাইল পথ সত্যই দুর্গম, তখন কবিদের অনুজ্ঞা অমান্য না করাই সাব্যস্ত হল। তার উপর পথিমধ্যে নাকি রাত্রিযাপনযোগ্য চটিরও অভাব। এই শেষোক্ত সতর্কতায় আমি কিঞ্চিৎ প্রলুব্ধ হলাম; কিন্তু সুশীল বলল—

ছুটি তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না, একটু দেরি হলে কি আর এমন ক্ষতি হবে। আজ এখানেই থাকা যাক।

আমার ছুটি সম্পর্কে আমি এতটা নিশ্চিত ছিলাম না, তা ছাড়া আমার তাড়া ছিল, কিন্তু সেসব কথা বোঝাতে হলে অনেক বাক্যব্যয় প্রয়োজন, আর সেই কথাটা সম্পর্কেও আমার তেমন নিশ্চয়তা নেই। অতএব বিনা প্রতিবাদে অন্য সকলের সিদ্ধান্তই শিরোধার্য করলাম। তারাদা রান্না করতে চলে গেলেন।

ভীরী অত্যন্ত ছোট চটি। পথের দু ধারে খেলাঘরের মত সাজানো দু-চারটে কুঁড়ে পেরোলেই মন্দাকিনী অতিক্রম করে কেদারনাথের প্রসারিত পথ চোখে পড়ে। ঝুলার পাশেই সামান্য একটু জায়গা চাতালের মত বাঁধানো, চাতালের তলায় বিঘত দেড়েক জমিতে গাঁজার চাষ করা হয়েছে। মাথার টুপি, কোটের বোতাম, জুতোর ফিতে খুলে

ওই চাতালে বসে আমার জীবনের সেদিন পর্যন্ত সব চাইতে রমণীয় সন্ধ্যা মন্দাকিনীর ধীরগম্ভীর সামসঙ্গীত-শ্রবণে অতিবাহিত হল। সেদিন আমি নিজেকে ভুলে ছিলাম, সেদিনের অনুভূতির বিশদ বিবরণ আজ আর স্মরণ নেই।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনীভূত হল, ঘনায়মান অন্ধকারে হিমালয়কে মনে হল সমাহিত। যাত্রীরা নৈশাহার সেরে কেউ নিদ্রার আয়োজন করল, কে যেন গান ধরল। স্নিগ্ধ উদাত্ত কণ্ঠে ভজন গান। আবহসঙ্গীত যোগাল মন্দাকিনী। সব মিলিয়ে, আমি ভুলে গেলাম যে আমি অন্য জগতে বিচরণ করছি।

এমন সময় জনৈক গাড়োয়ালী এসে আমার পাশে বসল। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তার পর বলল, আপ তো বহুৎ সিগ্রেট পিতে হ্যায় শেঠজী, হামকো একঠো দিজিয়েগা? মধ্যমা ও তর্জনী ওষ্ঠপ্রান্তে ঠেকিয়ে লোকটি মুদ্রার আকারে প্রার্থনার পুনরুক্তি করল। নিবিষ্টচিত্তে কিছুক্ষণ সিগারেট টেনে লোকটি আবার বলল, আপ কেয়া উও গানা শুনতা হ্যায়?

হুঁ।

উও তো রোশনবাঈ গা রাহী। উনহোনে বহুৎ ভারী গানেওয়ালী হ্যায়, লক্ষ্ণৌমে তো এইসা কোই নাহি হ্যায় জিসনে উনকি নাম নাহি শুনা।

ও।

ম্যায় তো উনকিহী কুলি হ্যায়।

লোকটি চুপ করল। নাম রোশন, পেশা বাঈজী—এসেছে মহাপ্রস্থানের পথে! একটু বিস্ময়বোধের প্রয়োজন অনুভব করলাম, কিন্তু বিস্মিত হলাম না। ছড়িদার এসে জানাল খাবার প্রস্তুত।

শারীরতত্ত্বের নীতি অনুযায়ী সেদিন দুষ্প্রাপ্য গভীর নিদ্রা পাওনা ছিল। কিন্তু কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়বার আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা পরেও আমি জেগেই রইলাম। ক্লান্ত অবসন্ন দেহটা নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়েছিল; কিন্তু আমার মন সেদিনের আনন্দের স্মৃতিটুকু ভুলে উঠতে পারছিল না। আধো-ঘুম আধো-জাগরণ—মন্দাকিনীর গান, হিমালয়ের উপস্থিতি, উষ্ণ একটা অনুভূতি।

হঠাৎ কার কণ্ঠের চাপা আওয়াজে হিমালয়ের শ্বাসরুদ্ধ হল। স্বরটা আসছিল আমাদের চটির নীচের তলার দোকানঘর থেকে। কণ্ঠটাকে আমাদের বুড়ো চটিওয়ালার কণ্ঠ বলে চিনতে বিলম্ব হল না। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সে আবার বলে উঠল, চুপ চুপ, ফের কখনও ও-কথা বলিস নে। ছি ছি, ও-কথা ভাবতে তোর লজ্জা হল না, বলতে জিভে আটকাল না?

আমি কান খাড়া করে রাখলাম, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে আর কোন কথা শুনতে পেলাম না। অনেকক্ষণ পরে আবার কানে এল—কি রে, এখনও বসে আছিস যে, যা, শুগে যা। না না, না না, ও-অনুরোধ আর করিস নে, অমন পাপ কাজে আমি কখনও মত দিতে পারব না। যা ভাই, যা, এখন গিয়ে শুয়ে পড়্—কাল আবার রাত থাকতে উঠতে হবে।—কি রে, এখনও যে বসে রইলি?—উঃ, এমন চিন্তা তোর মাথায় এল কেমন করে যে, রাত্রি বেলা ওই খাদে নামবি—ওই তিন দিনের মড়া পচা বুড়ীটার সঙ্গে কোন টাকাপয়সা ছিল কি না দেখতে? যদি টাকা পাওয়া যায় তো তা দিয়ে কি হবে—ও যে পাপের টাকা! আর যদি কিছু ওর সঙ্গে থেকেও থাকে তবে তা ওর বৈতরণী পেরোবার পাথেয়; ওই অভাগিনীকে তুই সেই শেষ সম্বল থেকেও বঞ্চিত করবি? ছি-ছি, ছি-ছি ছি!—কি রে, যাবি নে শুতে? তবে আমিও এই বসে রইলাম। দেখি, তুই কেমন করে যাস!

আমি সন্তর্পণে কান পেতে রইলাম, হিমালয়ও উৎকণ্ঠায় একাগ্র রইল। কিন্তু আর কোন কথা শুনতে পাওয়া গেল না।

পরদিন সকালে পথ ধরবার আগে চা-পানের সময় চটিওয়ালার মুখের দিকে একবার চাইলাম। সে মুখে গত রাত্রির কুৎসিত স্মৃতি, তার চাইতেও বেশী আগামী রাত্রির বীভৎস ভীতির সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে।

কোটের বোতাম ভাল করে এঁটে, মাথার টুপি চেপে বেঁধে আমি গুপ্তকাশীর পথ ধরলাম। কাউকে কিছু বলবার বা জিজ্ঞেস করবার মত আর কিছু ছিল না।

ছয়

উপনিষদ থেকে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে তারাদা যেন মাঝে মাঝে কার কথা বলে থাকেন, যিনি প্রবচনেও লভ্য নন—ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। ইনি যে কে তা আজও বুঝে উঠতে পারি নি, তবে এই পরিচয়টি পার্বত্য চড়াই সম্পর্কেও সম্পূর্ণ সত্য। চড়াই বস্তুটি বলে বোঝানো অসম্ভব, শুনে বোঝা অধিকতর দুরূহ। যদি বলি, বিপরীত দিক থেকে কলকাতার পার্কের স্লিপে আরোহন করুন, চড়াইয়ের স্বরূপ বুঝতে পারবেন—তা হলে চড়াইয়ের বিরাটত্ব অনুশীলনকারীর অনধিগত থেকে যাবে,—আর ওই বিরাটত্ব বাদ দিলে চড়াই চড়াই-ই নয়। অপর দিকে, যদি অন্যতর লেখকের মত বলি, এ চড়াই সাপের মত বুকে বেয়ে ভাঙতে হয় তবে তা অতিরঞ্জন হবে, হয়তো বা অল্পকথনও হবে, কিন্তু কখনও সত্যকথন হবে না। হিমালয়ের অন্যান্য প্রত্যঙ্গের মত এই চড়াইয়ের সত্য পরিচয়ও অভিজ্ঞের অভিজ্ঞতায়, কবির বর্ণনায় নয়।

একটা ভাত টিপলেই যেমন হাঁড়ির খবর জানা যায়, তেমনি একটা চড়াই ভাঙলেই যাবতীয় চড়াই চেনা হয় না। মনুষ্যজীবনের অভিজ্ঞতার মত প্রতিটি পরবর্তী চড়াই-ই পূর্বেকার চড়াইটির চাইতে ভিন্নতর, নূতনতর—হয় অধিকতর সুখকর, নয় ক্লেশকর। রামপুর থেকে চন্দ্রাপুরী ও তারপর চন্দ্রাপুরী থেকে ভীরী চটির পথে এর আগে তো অনেক চড়াই ভেঙেছি—কিন্তু সেই চড়াইও চড়াই ছিল আর এই গুপ্তকাশীর চড়াইও চড়াই। দুর্বল বাক্যের অসহায়তা দেখে ওই ক্লেশের মধ্যেও হাসি পায়!

আর ওই ক্লেশেরই কি কোন উপমা আছে! পা টনটন, মাথা ঝিম ঝিম, বুক ধড়ফড় ইত্যাদি বিশেষণে ওই ক্লেশ স্পর্শাতীত। একটা চাপা অস্ফুট, নিয়তির মত অস্খালনীয় সামগ্রিক যন্ত্রণা—ঠিক যন্ত্রণাও নয় বরং বিষাদ-বেদনা—দেহ মন এমন কি অন্তরীক্ষ পরিব্যাপ্ত করে ফেলে। প্রথমে সামান্য একটু ক্লান্তি, তারপরে নগণ্য একটু হতাশা, অবশেষে অন্তহীন নিঃসঙ্গতা। মনে হয়, পাহাড়ের ওই চূড়া, উপত্যকার ওই নদী, ক্ষেতের ওই গমশীষ, দিগন্তের অভ্র-আবীর তুষার, আকাশ ও আকাশের সূর্য সবাই মিলে বুঝি এক ষড়যন্ত্র করছে। শুধু তাই নয়, শাস্তিটা দেখবার জন্যে এসে গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে আবার। সেই ভীড়ের মধ্য দিয়ে দীন যাত্রীকে নিজের ক্রুশ বহন করে একা চড়াই ভাঙতে হবে। একদম একা। নদীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর, একটু থেমে সে ফিরেও চাইবে না; পাহাড়ের কাছে সহায়তা ভিক্ষা কর, সে স্থাণু হয়ে বসে থাকবে; তুষার-শিখর বহুদূরে, প্রার্থনা তার কানেও পৌঁছবে না। অগত্যা যাত্রী একা। এই একাকিত্বের দুর্বহ বোঝা নিয়ে তাকে একাই পথ চলতে হবে। চোখ মুদে ঈশ্বরের নাম স্মরণ কর, বঙ্গের কোন স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি তোমায় কোলে টেনে নেবে না; মনের চোখের সামনে যে মূর্তি এসে দাঁড়াবে সে রুদ্র,—তিনি শুধু আদেশ করতে জানেন। যাত্রীর পক্ষে নিজে ছাড়া নির্ভরযোগ্য আর কেউ নেই; আর আছে শুধু চড়াই—বেঁকে বেঁকে কেবল উঠেই চলেছে। উঠেই চলেছে বটে, কিন্তু পাশের উপত্যকার গভীরতাও ক্রমশই বাড়ছে। মোহমুদ্গরের বাণীটির অর্থ এমন চড়াই না-ভাঙলে সম্যক বোঝা যায় না। সত্যিই তো, কান্তাই বা কে, আর পুত্রই বা কে!

অথচ ক্লেশের কথা বললেই কি চড়াইয়ের কথা ফুরোল! এই ক্লেশের গৌরবের কথা বাকি রয়ে গেল যে! একাদিক্রমে আধ ঘণ্টা বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট চড়াই ভাঙবার পর মুহূর্তের জন্য যাত্রী যখন আপন যষ্টিতে ভর দিয়ে দাঁড়াল সেই মুহূর্তের গৌরবে তৎক্ষণাৎ ক্লেশের স্মৃতিটুকু পর্যন্ত মুছে গেছে। তখন কী অপূর্ব প্রশান্তি! সাধনা সিদ্ধ হয়েছে, কর্তব্য সমাধা হয়েছে—বিশ্রামটুকু স্বোপার্জিত; এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের স্থির চূড়ার সঙ্গে, নদীর প্রবহমাণ ধারার সঙ্গে

গভীর আত্মীয়তা স্থাপিত হয়। নিঃসঙ্গতার কারাগার তখন ভেঙে গেছে; যাত্রীর ক্রুশ তখন জয়মাল্য হয়ে যাত্রীর কণ্ঠে ঝুলছে।

আরও চড়াই আছে? থাক না! একটু চা ও একটা সিগারেট পান করে নিই, ঠিক পেরিয়ে যাব। ক্লান্তিতে ও গৌরবে হাত পা ছড়িয়ে একটি পাথরের উপর বসে এক পেয়ালা চায়ের নির্দেশ দিলাম ও যাত্রীদের দেখতে লাগলাম। চারিদিকে সব নিস্তব্ধ; নিস্পলক দৃষ্টিতে আকাশের সূর্য, হিমালয়ের চূড়ো, দেবদারু চীড়—সবাই যাত্রীদের শক্তি পরীক্ষা দেখছে। শুধু ঠুক-ঠুক-ঠকাস লাঠির শব্দ, আর হুস হাস শ্বাসের শব্দ।

চড়াই আর কতটা বাবা?

আউর থোড়া দূর মাইজী। জয় কেদারনাথ, জয় বদরিবিশাললাল!

জয় কেদারনাথ, জয় বদরিবিশাললাল!—প্রত্যুত্তর দিয়ে কেউ এগিয়ে যায়, কেউ বসে এক পেয়ালা চা খায়।

আগে যাঁদের পেছনে ফেলে এসেছি তাঁরা এখন একে একে আমাকে ছাড়িয়ে যেতে লাগলেন। এই দু দিনে যাত্রীদের সকলের সঙ্গেই পরিচয় হয়ে গেছে—সবাই এক পথের পথিক, সবাই সম অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ, সবাই যেন পরমাত্মীয়। কেউ হেসে উৎসাহ দিয়ে যান; কেউ পরামর্শ দেন—বসবেন না পায়ে খিল ধরে যাবে। কেউ বা শুধু সমবেদনার দৃষ্টিতে সৌহার্দ্য জ্ঞাপন করে সোজা পথে চলে যান।

ক্রমে সুশীল এসে পৌছল—আর না মশাই, যথেষ্ট হয়েছে—গুপ্তকাশী থেকেই আমি ঘোড়া নেব। বাবা রে বাবা, চড়াইয়ের কি আর শেষ হতে নেই! পা দুটো যেন দুটো বিষফোড়া হয়ে উঠেছে—উঃ! উঃ! —নিজেকে টানতে টানতে সুশীল এগিয়ে গেল।

একটু পরেই ননীবাবু এলেন কোন প্রকারে নিজেকে বহন করে। বলা চলত, চিরেতার জল পান করতে করতে। ভ্রূ কোঁচকানো, ওষ্ঠ বিকৃত, চোখে বিষদৃষ্টি। স্পষ্টতই ক্লেশের যে একটা আনন্দের দিক আছে ননীবাবুর নজরে তা পড়ে নি। বেচারা, বেচারার তাই রাগের আর অন্ত নেই—হিমালয়ের উপর রাগ, কেদারনাথের উপর রাগ, পথের উপর রাগ, সহযাত্রীদের উপর রাগ, নিজের উপর রাগ। রাগ

ননীবাবুকে বেষ্টন করে আছে, রাগ ছাড়া কিছুই আর তাঁর চোখে পড়ছে না, বোধে আসছে না। আমিও ফক্কে খেলাম। আপন রাগের বোঝায় নত হয়ে ননীবাবু চলে গেলেন।

কেয়া ভাই, ঠক লাগ গিয়া?—রুদ্রপ্রয়াগের সেই স্নান-প্রগল্‌ভা মহিলা, অসহ্য ক্লান্তির মধ্যেও রাঙা ঠোঁট ফাঁক করে একটু হাসলেন।

নাহি বহিন, বৈঠা জরা সিগ্রেট পিনেকো লিয়ে।

চলতে রহো, চলতে রহো। সব তো আনন্দময় হ্যায়!—মহিলার পিছন পিছন কাল সন্ধ্যার সেই গাড়োয়ালী কুলিটিকে দেখেও নিশ্চিত হতে পারলাম না যে, এ-ই রোশনারা বাঈ। তাঁর হাসিতে এতই উদারতা, দৃষ্টিতে এতই বিশ্বাস, চরণে এমনই বলিষ্ঠতা! তাঁর চলার পথটির দিকে অনেকক্ষণ তন্ময় হয়ে চেয়ে রইলাম।

তারপরে এল কর্ণেল-পত্নীর সেই পারলৌকিক অভিভাবক—সাধুবাবা। বাঈয়ের ঠিক পিছন পিছন তিনি এলেন এবং চলে গেলেন। তাঁর পদক্ষেপেও দেখলাম, বলিষ্ঠতা আছে কিন্তু শ্রদ্ধা নেই; তাঁরও দৃষ্টি নিস্পলক কিন্তু উদারতাবর্জিত। সাধুবাবার ছায়া অনুসরণ করে এলেন কর্ণেল-পত্নী—অবসন্ন বিনম্রপদে।

এমন সময় চড়াইপাখির মত তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাফাতে নীলমণি এসে উপস্থিত। আমাকে দেখেই অধৈর্য হয়ে বলল—চলুন তো, চলুন, তাড়াতাড়ি চলুন! কেদারনাথের কাছে। ব্যাটাকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে, এত ওপরে উঠে তাঁর বসবার কী দরকার ছিল? কেন বাবা, আমাদের ভক্তির তো যথেষ্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে, এইবার গতরটা নেড়ে একটু নেমে আয় না, প্রণামটি ঠুকে বিদেয় হই। আসুন না, আসুন—আসুন আমার সঙ্গে।

মৃদু হেসে নীলমণির সঙ্গ ধরলাম। নীলমণির এই সব রসবর্জিত রসিকতায় সেদিন হেসেছিলাম স্মরণ করে আজও লজ্জিত হই; কিন্তু এই সকল স্থূল রসিকতাই সেদিন যে আমার দুর্গম পথ অনেকটা সুগম করেছিল সেই সত্য গোপন করবার কথা ভাবলে অধিকতর সঙ্কুচিত বোধ করি।

গুপ্তকাশী—স্থানীয় উচ্চারণে গুপত কাশী—চটি হিসেবে খুব বড় চটি নয়; তবে বড় ব্যস্ত চটি। দীর্ঘ চড়াইয়ের শেষে এর অবস্থিতি বলে যাত্রীরা সাধারণত এই চটিতে অন্তত একটি বেলা বিশ্রাম নিতে বাধ্য হয়। তা ছাড়া গুপ্তকাশীর আশেপাশের উপত্যকাগুলো অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তাই ব্যবসায়িক লেনদেনের কেন্দ্র হিসেবেও চটিটির প্রাধান্য আছে। তদুপরি গুপ্তকাশী থেকে উদার হিমালয়ের যে রমণীয় মূর্তি চোখে পড়ে, দেবপ্রয়াগ রুদ্রপ্রয়াগের পরেও তা অনুল্লেখযোগ্য নয়। দূরে মন্দাকিনীর অপর পারে চিত্রার্পিতবৎ উখীমঠ—চীনা ছবির মত বিষয়ের চাইতে পটটাই যার প্রধান। অপর দিগন্ত তুষারমণ্ডিত, সেই দিকে একবার চাইলে—। না, সেই দিকে একবার চাইলে মনের যে কী অবস্থা হয় তা আমি বৃথা বোঝাবার চেষ্টা করব না। তবে একবার চাইলে চোখ আর ফেরানো যায় না। এইটুকু হচ্ছে বাস্তব সত্য, জ্ঞাতব্য সত্য। বাকিটা, ইংরেজীতে বলি, 'সাইলেন্স'। সর্বোপরি, তীর্থ হিসেবেও গুপ্তকাশী গুরুত্বহীন নয়, সেদিক থেকে গুপ্তকাশীকে বরং কেদারনাথের ভূমিকা বলাই সমীচীন। পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গেও এর কী যেন একটা যোগাযোগ আছে। তা ছাড়া, এখানে আছে অর্ধনারীশ্বরের দুষ্প্রাপ্য মূর্তি—জগতের গোটা চারেকের একটি। মূর্তিটি অতিশয় সুন্দর, গঠনে অনস্বী-কার্যরূপে দক্ষিণী ছাপ আছে। হিন্দুস্থানী স্থূলরুচির প্রতিমূর্তি মন্দির ও অন্যান্য বিগ্রহের পাশে অর্ধনারীশ্বরের মূর্তিটি দ্বিগুণ রমণীয় বলে প্রতীত হয়। অর্ধনারীশ্বরের আদর্শে যে ঐশী সমন্বয় আছে এই বিগ্রহদর্শনে তাও যেন অনেকটা উপলব্ধ হয়। তবে আমার হয় নি; আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, আমি বড় বেশী 'প্যুরিটান' এবং আমি নিছক পর্যটকের মত, অভিশপ্ত ত্যাজ্যপুত্রের মত ফাঁকা মন নিয়ে ঘুরে ঘুরে ফাঁকা চোখে মন্দির বিগ্রহ কুণ্ড ইত্যাদি কিছুক্ষণ পরিদর্শন করলাম। মুহূর্তের জন্যও সেদিন ভুলতে পারি নি যে, আমি প্রবঞ্চিত হয়েছি। কার জন্যে এবং কী থেকে?

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী গুপ্তদান, ভুজ্জিদান ইত্যাদি নিয়ে তারাদা ব্যস্ত থাকায় রান্না সেদিন যথাচরিত বিলম্বেও নামবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। মণিকর্ণিকা কুণ্ডের গোমুখনিঃসৃত বরফ-গলা শীতল ধারায় স্নান করে বেশ কিছুটা উষ্ণ শীতও অনুভূত হচ্ছিল। এক গেলাস চা

নিয়ে, একটা সিগারেট ধরিয়ে, চটির চাটাইতে দেহ এলিয়ে উত্তরের কপাটহীন জানলাপথে আমি তুষারসীমার দিকে তাকিয়ে রইলাম। জানলা দিয়ে খানিকটা উষ্ণ রোদ গায়ে এসে পড়ছিল; কিন্তু মনের মৃত্যু-শীতলতা কাটাবার পক্ষে তা আদৌ যথেষ্ট ছিল না।

আমি ভাবছিলাম, আমার মানসিক নিঃস্বতার কথা। সেই দারিদ্র্য কোন কালেই আমার অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু তার অপূরণীয় দীনতা ও ক্লেদোক্ত হীনতা বোধ হয় এর আগে আর কখনও এমন ভাবে অনুভব করি নি। আমি ভারতীয়; কিন্তু ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি বা ঐতিহ্যের যতটুকু আমি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি তা শুধু ওই সমস্তের প্রতি বিমুখতা আর বৈরিভাব। অপর দিকে, আমার ঠিক পূর্বপুরুষ যে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আপনার বলে গ্রহণ করেছিল, সেই সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি আমি যখন হাত বাড়ালাম তখন তাতে পচন ধরেছে। অলস দৃষ্টিতে আমি দূরে তুষার-পটের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইলাম। আমার মনের চোখের সামনে দিয়ে ছায়াছবির মত অতীত জীবনের একটির পর একটি দৃশ্য পার হয়ে যেতে লাগল। প্রথমে বিস্মৃত বাল্যের দু-চারটে, পুরনো আলোকচিত্রের মত ঝাপসা ছবি, তারপরই যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, বাস্তুত্যাগ। বড় দ্রুত জীবন, আর কী হ্রস্ব, কী সঙ্কীর্ণ, কী ক্ষুদ্র, কী চঞ্চল! এই দ্রুততার, এই সঙ্কীর্ণতার কথা আজ পর্যন্ত শুধু যে জানতে পারি নি তাই নয়, জানবার কথা মনে পর্যন্ত হয় নি। অথচ, কি আশ্চর্য, আমার বয়স ইতিমধ্যেই সাতাশ হয়ে গেছে! সাতাশ বছর, অথচ পায়ের তলার মাটিটুকু পর্যন্ত চেনা হয় নি। মাটিটুকু আছে তো!

সুদীর্ঘ সাতাশ বৎসর একাদিক্রমে নিজেকে ফাঁকি দিয়ে এসেছি। মুহূর্তের জন্যও নিজেকে জানতে দিইনি যে জীবিত আছি। দুঃখে কেঁদেছি বটে, সুখেও হেসেছি,—কিন্তু সবই যন্ত্রবৎ, প্রত্যাশা মতো। আবেগের স্বতঃস্ফূর্ততায় নয়, সজ্ঞান সচেতনতায় নয়। জ্ঞানোন্মেষেরও আগে থেকে একের পর এক প্রাকৃতিক রাজনৈতিক সামাজিক পারিবারিক বিপর্যয় চেতনার ভিত্তি শিথিল করে দিয়ে গেছে। অঙ্কুরের কি প্রতিশ্রুতি ছিল তা স্মরণ রাখবার অবকাশ অঙ্কুরেরও মেলেনি। বিগত সাতাশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে কেবল আত্মরক্ষার

অজুহাতে ক্রম আত্মাবলোপে। বাইরের প্রতিকূলতা থেকে প্রতিরক্ষার প্রয়াসে নিজেকে প্রত্যেক মুহূর্তে দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রেখেছি,— মাঝে এতটুকুও পরিসর রাখিনি যে একবার চোখ মেলে দেখি। সময় গতিহারা হয়ে থেকেছে সুদীর্ঘ সাতাশ বৎসর!

গুপ্তকাশীর ক্ষণিক অবকাশে অনবধানবশত একবার নিজের দিকে তাকাতে বিস্ময়ে নিথর হয়ে গেলাম। উদ্বিগ্ন সন্ত্রস্ততায় এতকাল যা'কে বক্ষে আঁকরে রেখেছি শ্বাসরুদ্ধ হয়ে তার অবস্থা আজ মৃতকল্প। বাইরের ঝড়-ঝাপ্টাও তা'কে রেহাই দেয়নি,—প্রতিটি আঘাতই ক্ষত-বিক্ষত করে গেছে। তাকিয়ে দেখি আমার অতীত রক্তাক্ত দেহে ধুল্যবলুণ্ঠিত হয়ে আছে। ক্লান্ত নির্জীব সাতাশটি বৎসর!

তুষার-দিগন্তের দিকে তাকিয়ে সেদিন পুরো দেড় ঘণ্টা সময় কেটে গেল। দেড় ঘণ্টা পরে সেদিন যখন আহারের ডাক পড়ল, তখন নিজেকে অকস্মাৎ প্রবীণ-বয়স্ক অভিজ্ঞ বলে একটু যেন ভারী বোধ হল। আমাদের মত নাগরিক মধ্যবিত্ত চির-অপরিণতদের পক্ষে এমন বোধ আর কিছু না হোক, অন্তত উল্লেখ যোগ্য।

সেদিন সতেরোই মে সন্ধ্যায় গুপ্তকাশী থেকে ফাটা চটিতে এসে পৌঁছলাম। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে; চটির নির্জনতা ও শৈত্য ছাড়া আর বিশেষ কিছু নজরে পড়ল না। আমাদের সুশীলচন্দ্র গরম জামা চাদর ইত্যাদির ওপরে পুরু বর্ষাতি চাপিয়ে বন্ধ ঘরের মধ্যে শীতে ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগল। ননীবাবু পায়ের ফেট্টি কানে জড়িয়ে চিৎপটাং। নীলমণি উনুনে আগুন দিল, তারাদা রান্নায় ব্যস্ত হলেন, আমি দু বালতি জল তুলে দিয়ে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে কর্মব্যস্ত তারাদা আর নীলমণিকে নীরবে সমবেদনা জানাতে লাগলাম।

সেদিন রাত্রিতে কম্বলের তলায় কাঁপতে কাঁপতে ভাবলাম, আচ্ছা, আমার এই ইদানীন্তন সজীবতার জন্যে, উৎকণ্ঠিত আত্মজিজ্ঞাসার জন্যে হিমালয়ের যে মাত্রাতিরিক্ত প্রশস্তি আমি গাইছি, অত প্রশংসা কি হিমালয়ের প্রাপ্য? এমন হওয়া তো, বিচিত্র নয় যে, এই সকলই মূলত আমার উন্মুখতার, আমার আগ্রহাতিশয্যের প্রতিধ্বনি মাত্র। তা হলে আমার বর্তমান ভাবগ্রাহিতার জন্য কি হিমালয়ই প্রশংসনীয়? ফাটা

চটিতে সেদিন এ প্রশ্নের কোন জবাব পাই নি; কেন না এমন প্রশ্নের আসলে কোন জবাবই নেই। তবে এই কথাটি সেদিন মনে হয়েছিল যে, হিমালয় না হলে আমার বুভুক্ষু মনের কাতর আর্তনাদ বিনা-প্রতিধ্বনিতেই মিলিয়ে যেত।

পরদিন প্রাতে শয্যাত্যাগের পর আবার পথ গ্রহণ। পথ—পথ—আর পথ। এ পথের যেন আর শেষ নেই, শুধু চলেইছে চলেইছে। তবে পথ একঘেয়ে নয়, রোমাঞ্চবর্জিত নয়; এ পথে চলা অর্থহীন নয়, ভবঘুরেমি নয়। পথের পার্শ্বে ফুল ফুটে আছে, পথের তলা দিয়ে ঝরণা বয়ে যাচ্ছে, গাছে পাখি ডাকছে, রাস্তায় গাছের শুকনো পাতা ছড়িয়ে আছে। কখনও শ্বাসরুদ্ধকারী চড়াই, কখনও প্রাণান্তকর উৎরাই, তারপর সঞ্জীবনী চা। মাঝে মাঝে গমক্ষেত. চোখে পড়ছে, তার পাশ দিয়ে অবশ্যম্ভাবীরূপে একটি ঝরনা। ছোট ছোট ক্ষেত, যেন প্রয়োজনের তাগিদে নয়, খেলাচ্ছলে গড়া। ওই ক্ষেতের চাষীদের মধ্যেও চাষীজনোচিত গাম্ভীর্য নেই; সবাই প্রায় নারী, যেন এক-একটি উচ্ছল ঝরনাধারা। যাত্রীদের দেখলেই লাঙল-কাস্তে ফেলে হাসতে হাসতে পথে নেমে বা উঠে আসে। বলে—শেঠজী, একঠো পাই পৈসা দেও। তাও যেন অভাবের তাড়নায় নয়, কৌতুকচ্ছলেই। ওদের বসন জীর্ণ, কেশ রুক্ষ, কঠিন পরিশ্রমে চেহারায় কাঠিন্য। কিন্তু এই সমস্ত-কিছুকে ঢেকে কি এক বিস্ময়কর রকম সহজ সরলতা! যথেষ্ট নির্দয় না হলে ওদের করুণা করাও শক্ত। ওদের আর যে দীনতাই থাক্, ওরা আমাদের মত উর্ধ্বমূল নয়। আর নিজেদের এই গৌরব সম্পর্কে ওরা অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সচেতন। তাই ওদের দারিদ্র্য আছে, কিন্তু তা ক্লেদমুক্ত; ওরা অজ্ঞ, কিন্তু তাই বলে হীনমন্য নয়; ওরা পুরো একটা পয়সাও চায় না, বলে—শেঠজী একঠো পাই পৈসা দেও। আজকের কারেন্সিতে পাই-পয়সা না-ই থাকল, কিন্তু ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে ধ্বনিটির নাড়ির যোগাযোগ আছে।

কিন্তু পথ এদেরও অতিক্রম করে সামনে চলে গেছে। প্রতি পদক্ষেপে হিমালয়ের নব নব রূপ প্রত্যক্ষ করে আমরা এগিয়ে চলেছি। এই নব নব রূপের আবার নবতর প্রতিক্রিয়া, প্রতি মুহূর্তে দেহে মনে বুদ্ধিতে ক্রমাগত পটপরিবর্তন হচ্ছে। পরিবর্তন অত্যন্ত সূক্ষ্ম, একাগ্র

হয়ে খেয়াল না করলে নজরেই পড়ে না। এই বিবর্তনের ধারাবাহিক বিবরণ একই কথার পুনঃ পুনঃ পুনরাবৃত্তি বলে মনে হবে। মনের তুলনায় ভাষার সামর্থ্য কত সসীম!

রামপুর চটিতে দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের পর, বেলাবেলি আমরা ত্রিযুগীনারায়ণের পথে বেরিয়ে পড়লাম। কুলি ও ছড়িদার সোজা গৌরীকুণ্ড চলে গেল; আগামী কাল সেখান থেকে কেদারনাথের উদ্দেশ্যে যাত্রা করব। পথ এইবার ক্রমাগত চড়াই।

চড়াইয়ের একটা মস্ত বড় সুবিধে এই যে, এতে কথা বলবার অবকাশ খুবই অল্প। সবাই নিজের শ্বাস সামলাতে ব্যস্ত, কথা কইবে কে? মাঝে মাঝে কেবল লাঠির ঠক-ঠক শব্দ, আর যাত্রী নিকটতর হলে, শ্বাসের হুস-হাস। হেসে সৌহার্দ্যটুকু জ্ঞাপন করবার শক্তিও কারো নেই। মানুষ যে স্বভাবতই কত নিঃসঙ্গ তখন যে সে কত সম্পূর্ণ, চড়াই অতিক্রম না করলে তা বোধ হয় সম্যক বোঝা যায় না। চড়াই-পথে পা বাড়ালেই যেন জীবনের পরিসর অনেক বেড়ে যায়। ব্যক্তি আর তখন সঙ্কীর্ণ সসীম একটি ছোট গল্প নয়; মহাকাব্যের একটি মহৎ সর্গ, নিদেন পক্ষে একটি বৈদেহী শ্লোক।

পথ দুর্গম বলে এদিকে যাত্রীর সংখ্যা খুব অল্প, অনেকেই সোজা গৌরীকুণ্ডে বেরিয়ে যায়। ফলে এ পথে চায়ের দোকান একটিও নেই। মাঝে মাঝে পথের উপরে পাহাড়ে হেলান দিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি আর আপন মনে ভাবতে ভাবতে পথ অতিক্রম করছি, এমন সময় সজল কালো মেঘে পর্বতপ্রদেশ ছায়াময় হল। ক্রমে বায়ু-বেগ বাড়ল; অরণ্যানী কেঁপে উঠল। দিগন্তে তুষার-শিখর নীলাভ দেখাল। যে কোন মুহূর্তে বৃষ্টি নামতে পারে, যাত্রীরা কিঞ্চিৎ দ্রুত চলার প্রয়াস পেল।

অনিচ্ছা সত্ত্বে আমাকেও একটু তাড়াতাড়ি পা চালাতে হল, তবে বরাতগুণে আশ্রয় মেলবার আগেই বৃষ্টি ঝেঁপে এল। মাথার টুপি আরও একটু চেপে গায়ে প্লাষ্টিকের চাদর জড়িয়ে এগুতে লাগলাম। যেন—। কিন্তু সেই বৃষ্টিতে মনের যা অবস্থা হল, এবং যা যা মনে হল, তার বিবরণ শিশুসুলভ শোনাবে। অতএব শুধু এইটুকু বলি যে, আমি সেদিন সত্যি শিশু হয়েছিলাম; ঠিক শিশুর মত অকারণে খুশী।

অবশেষে শাকম্বরী-মাতার প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছুলাম। সামনেই লেখা আছে: শাকম্বরী-মাতার ওল্ড টেম্পুল। টেম্পুলই বটে, কেন না মন্দির এটা নয়। কুলীন কুড়েঘর বলতে যদি একান্তই আপত্তি দেখা দেয় তো কোনক্রমে এটাকে অচ্ছুৎ কুড়েঘর বরং বলা চলে। কুড়ের এক কোণে শাকম্বরী-মাতার বিগ্রহ; অপর অংশে চটির পণ্য-সামগ্রী ও চায়ের সরঞ্জাম। সামনে স্বল্পপরিসর একটু চাতাল মত স্থান; তারও উপরে আচ্ছাদন আছে। একান্ত বাধ্য হলে যাত্রী এখানে মাথা গুঁজতে পারে। বৃষ্টির প্রকোপ ইতিমধ্যে বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাড়াহুড়ো করে পথের যাত্রীরা সবাই এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আমি এসে যখন পৌঁছুলাম আশ্রয়টুকুতে তখন আর তিলধারণের স্থান নেই। চটিওয়ালা প্রতি মুহূর্তে একবার করে ছুটে গিয়ে ক্রেতাকে চা তৈরি করে দিচ্ছে, আবার পর-মুহূর্তে ছুটে এসে পূজারীর পূজা গ্রহণ করছে। বলা বাহুল্য, যিনি চটিওয়ালা, তিনিই চা-বিক্রেতা, আবার তিনিই শাকম্বরী-মাতার পুরোহিত।

অনেক চেষ্টা করেও শাকম্বরী-মাতার অবয়বটুকু দৃষ্টিগোচর হ'ল না; অন্ধকার খুপরিটুকুর মধ্যে যা নজরে পড়ল তা হচ্ছে, একটা অনির্দেশ্য বস্তুতে দোদুল্যমান একটা তামার মুণ্ডমালা। মুণ্ডগুলো মনুষ্যমুণ্ড নয়। এ পোড়াচোখে ভূত কখনও দেখি নি, তবে মনে হল, মুণ্ডগুলো তাদের হওয়া বিচিত্র নয়। কান্তরস না হোক, সামান্যতম ভক্তিরসও সঞ্চারিত করে শাকম্বরী-মাতার বিগ্রহে বা সজ্জায় এমন কিছু নেই। সেই আকারহীন অদৃশ্য অবোধ্যতার সামনে দাঁড়িয়েই যাত্রীর পর যাত্রী বস্ত্রদান, ভুজ্জিদান করে চলেছে; তোতাপাখির মত উচ্চারণ করে চলেছে চটিওয়ালা অশিক্ষিত পুরোহিতের গাড়োয়ালী-মিশ্রিত সংস্কৃত মন্ত্র। এই-ই এখানকার রীতি। পূজা-প্রাঙ্গণের পাশ কাটিয়ে আমি চাতালের অপর প্রান্তে চলে গেলাম, সেখানে চা বিক্রি হচ্ছিল।

বাইরে বৃষ্টির বেগ তখনও বেড়ে চলেছে। হিমালয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বৃষ্টির ধ্বনি। বৃষ্টির স্বচ্ছ আবরণের অন্তরালে অরণ্যানী বাক্যময় হয়ে উঠছে। দূরে নীলাভ স্বপ্নিল তুষার-সীমা। সমতলে বৃষ্টির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যে বেদনা জড়িত থাকে এখানেও তা আছে; কিন্তু এমন উদার মুক্তি আর অন্য কোথায়! এ তো ব্যর্থ বাল্যপ্রেমের ছিঁচকাঁদুনি

নয় ; এ অভিজ্ঞের সংবেদনশীল নৈর্ব্যক্তিক ক্রন্দন। চায়ের গেলাস হাতে নিয়ে আমি চাতালের কিনারায় এসে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসলাম। বসেই দেখি, আমার পাশেই বসে আছেন সেই তিনি, যিনি অজ্ঞাত কোন কারণে এ পথে আসেন নি, অজরামরকে যাঁর চাই-ই চাই। বাক্যালাপের পরিবেশ সেইটে ছিল না, মৃদু হেসে আমি শুধু পূর্ব-পরিচয় স্বীকার করলাম। উনিও। কিন্তু উনি প্রত্যুত্তরে হেসে-ছিলেন কি কেঁদেছিলেন তা আর আজ ভাল স্মরণ নেই। দূরে তুষারের শুভ্রপটে নীলাক্ষরে কোন সত্য যেন এই মুহূর্তেই ভেসে উঠবে। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে।

সেদিনও ঠিক এমনি মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছিল। তবে যখন আপিস থেকে সমস্ত দিনের সঞ্চিত গ্লানি নিয়ে পথে পা দিয়েছি তখনও বৃষ্টি নামে নি ; নীল নবঘনে আকাশ ছেয়ে গেছে, বিকেলবেলায়ই নকল সন্ধ্যা নেমে এসেছে। পরিবেশের বৈপরীত্যে গ্লানিটাকে দ্বিগুণ মনে হল। দুটো মাত্র পথ ছিল সেই গ্লানি ভোলবার। এক : প্রেমিকার সঙ্গ। দুই : কফি-হাউসের কোণের টেবিলে পরিচিত-জনের সহিত আড্ডা। কিন্তু তখনও পর্যন্ত আমি প্রেম কাকে বলে জানতাম না।—আমি বাঙালী বলে কথাটা হয়তো একটু অস্বাভাবিক শোনাবে। কিন্তু কথাটা সত্যি।

যদিও অনেক চেষ্টা করেছি কোন একটি মেয়ের প্রেমে পড়বার, বাট ইট জাস্ট ডিড্‌ণ্ট হ্যাপেন। আর বন্ধুজনের সঙ্গে আড্ডা ?—আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে সেই বনের মোষ তাড়ানো ? তার চাইতে বরং হিন্দী ছবি ভাল। অতএব আফিস ছুটির পর ড্যালহৌসি থেকে হেঁটে চৌরঙ্গী এলাম। এমন সময় বৃষ্টি নামল। মুহূর্তমধ্যে মুষলধারায়—ঠিক যেমন বঙ্গের বর্ষা নেমে থাকে। আমি একদৌড়ে গিয়ে অশোকার পোর্টিকোর তলায় আশ্রম নিলাম।

রুমাল দিয়ে চশমার কাচ থেকে বৃষ্টির জলটুকু মুছে ফেলবার পর দেখি, আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন শুভ্রা দেবী। ইনি আমার ঠিক বহুদিনের পরিচিতা নন, তবে এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক কালের।

অর্থাৎ আমরা দুজন একসঙ্গে কলেজে পড়তাম, এবং আমার ছাত্রজীবনের অলস কল্পনার তিনিই ছিলেন অন্যতমা নায়িকা। সেই জন্যেই হয়তো এঁর সঙ্গে আলাপ করবার সাহসটুকু ছাত্রজীবনে কোনদিন সঞ্চয় করে উঠতে পারি নি। মনে আছে সেই সময়ে ক্বচিৎ কখনও ওর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলে সমস্ত দেহ কেমন অবশ অসাড় হয়ে যেত, বুকের ভেতরটা কেমন তোলপাড় করে উঠত, গলা শুকিয়ে আসত; ইংরেজীতে বোধ হয় ওকেই 'কাফ লাভ' বলে। সে যাই হোক, ছাত্রজীবনের পরেও কফি-হাউসে গেলেই দেখতাম, কোণের টেবিলটা দখল করে ও সহপাঠী আর পাঠিনীদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে। ওকে প্রথম দেখবার পর এইভাবে অনেক দিন কেটে গেল—প্রায় তিন বছর; তবু ওর দিকে সহজভাবে তাকাবার মত স্বাভাবিকতাটুকু আমার আয়ত্তে এল না। তিন বৎসর পরেও আমি যেন সেই অপরিণত বালকটিই রয়ে গেছি। এবং ইতিমধ্যে ওর প্রতি আমার কৌতূহলই বলুন আকর্ষণই বলুন কিংবা সরাসরি প্রেমই বলুন, একটুও প্রশমিত বা অবদমিত হল না। কোন উপন্যাসে এমন কাহিনী পড়লে, লেখকের নাম না-দেখেই আমি বলে দিতে পারতাম যে, বইটা বিশেষ একজন লেখকের লেখা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার বেলায় এ কথা না-মেনে উপায় নেই যে, সামান্যতম প্ররোচনা বা উৎসাহ ব্যতিরেকেও আমি শুভ্রা দেবীকে পূজো করে যেতে লাগলাম। কত অজস্র অদ্ভূত আজগুবি ভাবনাই তখন ভাবতাম, যদিও জানতাম ওই সবই নেহাত অর্থহীন বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়, শুভ্রা দেবীকে আমার দূর থেকেই পূজা করতে হবে। এমন সময় একটি আষাঢ় সন্ধ্যায় যখন বৃষ্টির বেগে বাইরের পৃথিবী প্রায় ভেসে যাচ্ছে তখন দেখি আমার পাশেই স্বয়ং শুভ্রা দেবী দাঁড়িয়ে আছেন। একা দাঁড়িয়ে আছেন; আমিও একা। মনে হল নোয়ার নৌকোয় বুঝি বা উপস্থিত হলাম।

তারপর যেমন হয়ে থাকে। আমি একটু হাসলাম, হেসে নমস্কার করলাম। প্রত্যুত্তরে উনিও হাসলেন ও নমস্কার করলেন। কুশল আদান-প্রদান হল। ওদিকে বৃষ্টি তো কমেই না, অদূরভবিষ্যতে কমবার লক্ষণও দেখা যায় না। মনে মনে বর্ষাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি অশোকা-রেষ্টুরেন্টের ভিতরে গিয়ে বসবার প্রস্তাব করলাম। নিয়মমাফিক ইতস্ততর পর উনিও প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

কিন্তু না, আমি সম্ভবত ঠিক বুঝিয়ে বলে উঠতে পারছি না। কাহিনীটা হয়তো আপনার কাছে বঙ্গীয় জীবনের একটা নিত্যনৈমিত্তিক সাধারণ প্রেম-কাহিনী বলেই মনে হচ্ছে। অবশ্য এর জন্যে সাংঘাতিক অভিনবত্বের দাবী আমি করব না, তবে এর সঙ্গে অন্যান্য কাহিনীর এইটুকু অন্তত পার্থক্য আছে যে ওয়ান হ্যাজ লিভড থ্রু ইট। একটি মেয়ের সঙ্গে একটি ছেলের আলাপ হলেই সুন্দর প্রেম-কাহিনীর সূত্রপাত হতে পারে; কিন্তু বাস্তব জীবনে এমন ঘটনা অন্যান্য অজস্র ঘটনার একটি মাত্র—বৈশিষ্ট্যহীন কোন লম্বা শিকলের একটি কড়া। অতএব শুভ্রা দেবীর সঙ্গে আমার পরিচয় থেকে যদিও আমি আমার কাহিনী বলতে শুরু করেছি তবু এখন মনে হচ্ছে, উল্টো দিক থেকে অর্থাৎ কিনা শেষের দিক থেকেই বুঝি বা আমি আরম্ভ করে থাকব! অথচ কোথা থেকে শুরু করব? এর কি ছাই কোন শুরু আছে? ছাত্র, বাল্য এমন কি শৈশব জীবন থেকে শুরু করতে পারতাম; কিন্তু আমি কী হব কী করব তা তো আমার শৈশবেরও অনেক—অনেক আগে স্থির হয়ে গেছে। তবে?

দিন, একটা সিগারেট দিন।

নাঃ, অত ভাবতে গেলে পাগল হয়ে যাব। তবে এইটুকু জেনে রাখুন, ওই সন্ধ্যার অনেক আগেই আমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে রেখেছিলাম যে, আমার জীবনই শুধু অর্থ এবং উদ্দেশ্য-হীন নয়, এর কোন অর্থ এবং উদ্দেশ্য খুঁজে বের করবার সময় এবং সামর্থ্যও আমি চিরতরে হারিয়েছি। আমার জীবন এমন একটা অ্যাসেট, খাতাপত্রে যার দাম শূন্য, অথচ তবু তাকে চিনি বয়ে যেতে হবে। মাতাপিতা আগেই গত হয়েছেন, জ্ঞাতি-সম্পর্কীয়রা শুধু ঠকিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, দূরেও সরে গেছে। পারিবারিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, আত্মিক সর্ব অর্থেই আমি একা। আমার জন্যে ভাববারও কেউ নেই, আমাকে ভাবিত করবারও কেউ নেই। একটা প্রেতজীবন যাপন করছিলাম।

এমন সময় শুভ্রা দেবীর সঙ্গে আলাপ হল। আমার বুভুক্ষু চিত্তের উদ্‌গ্রীবতায় সেই আলাপ দু-ঘণ্টার মধ্যে রূপান্তরিত হল প্রেমে। পৃথিবীর রঙটাই যেন দু-ঘণ্টার মধ্যে পাল্টে গেল। যখন পথে বেরলাম

তখন আর রাস্তার কাদা নজরে পড়ল না, তখন দেখি ক্ষান্তবর্ষণ স্বচ্ছ আকাশে চাঁদ উঠেছে, হালকা অচ্ছোদ ছোট ছোট মেঘপুঞ্জ আস্তে আস্তে অজানার উদ্দেশে ভেসে চলেছে। ঠিক যেমন হয় আর কি। আমাকে কেন্দ্র করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, জড়-জীব সব-কিছু কয়েক সপ্তাহ ধরে ঘুরল। তারপর—

এমনটা আমি চিরকাল ধরে দেখে আসছি : একসঙ্গে একটার বেশি সমস্যা আমার চোখেই পড়ে না। যখন কলেজে পড়তাম, তখন মনে হত কলেজের প্রাঙ্গণ পেরলেই আমার সব সমস্যার শেষ হবে, জীবনে আর কোন দুঃখই থাকবে না। কিন্তু কলেজ পেরিয়ে দেখি সমস্যার তখন সবে শুরু। তখন মনে হল, একটা চাকুরি না হলে আর চলে না; একটা চাকুরি হলেই জীবনের শেষ ক্ষতটি সেরে যায়। অবশেষে অনেক চেষ্টাচরিত্রের পর একটা চাকুরি যখন পাওয়া গেল তখন দেখি, ক্ষতের ব্যথার উপশম তো হলই না, বরং আরও বেড়ে গেল। এইবার একটি নারীর অভাবে জীবনটাকে মরুবৎ মনে হল। মনে হল, এখন যদি একজন ভালবাসার পাত্রী পাওয়া যায়, আফিস থেকে বেরিয়ে টো-টো করে না ঘুরে যদি একটা আঁচলে গিয়ে বসতে পারি, তবে আর আমার জীবনে চাইবার বা পাবার বাকী কিছু থাকে না। কিন্তু শুভ্রা দেবীর সঙ্গে আলাপ হবার তিন সপ্তাহ পরে দেখি, আমার বাসনার অঞ্জলি আদৌ উচ্ছলিত হয়ে ওঠে নি। আজ ও আসব বলে এল না, কাল ও ছুটোয় আসবে বলে চারটেয় এল, পরন্তু বিদায়কালে ও তেমন ভাবে চাইল না, তেমন ভাবে হাসল না। এই মুহূর্তে স্বর্গের নন্দনকাননে পরিভ্রমণ করছি তো পর-মুহূর্তে দেখি নরকের তপ্তকটাহে দগ্ধ হচ্ছি। সম্ভব অসম্ভব, বাস্তব অবাস্তব, চতুর বাতুল—কত অজস্র বন্য উন্মত্ত চিন্তা যে তখন মাথায় খেলত তার ইয়ত্তা নেই। কত আশা কত আশঙ্কায় মন তখন প্রতি পর-মুহূর্তে মুগ্ধ হত, মূর্ছা যেত। সর্বদাই যেন সপ্তমে চড়ে আছি।

এমন রোমাঞ্চকর প্রেম কাহিনী শুনতে আমারও ভাল লাগে; কিন্তু তার নায়ক হওয়া অন্য কথা। সে একটা অবিমিশ্র শাস্তি। চেয়েছিলাম প্রশান্তি, পেলাম উত্তেজনা। ভাবলাম, এই সমস্যার সমাধান—বিবাহ। সমস্ত অনিশ্চয়তার তা হলে অবসান হয়। রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা, প্রাণান্তকর

সংশয়, গ্লানিকর সন্দেহ, অবিরত অস্বস্তি—বিবাহের পর আর এসব কিছু থাকবে না, তখন অমল ধবল পালে লাগিয়ে শুধু মন্দাক্রান্তা তালে তরণী বাওয়া!

অবশ্যম্ভাবী প্রতিরোধগুলো অতিক্রম করে অবশেষে বিয়েও হয়ে গেল। কিন্তু সেই প্রশান্তি কোথায়? আপিস থেকে ফিরে যেই ভাবছি এবার ছাতে গিয়ে সন্ধ্যার আরক্ত মৃদু আলোকে মাদুর পেতে একটু বসব, অমনি এক বন্ধু এসে উপস্থিত কিংবা কোন আত্মীয়। আজ ওর বান্ধবীর বিয়ে, কাল আপিসের অ্যাকাউণ্ট ক্লোজ করবার জন্যে আমায় ওভারটাইম খাটতে হবে। যতই হাত বাড়াই ততই দূরে সরে যায়; তৃপ্তি আর পাই নে, সুখ ক্রমাগতই ছল করে পালায়। মন তিক্তবিরক্ত বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে, কিন্তু আশা কমে না। স্থির করলাম, ছুটি নিয়ে কিছুদিনের জন্য বাইরে চলে যাব—আকণ্ঠ পান করে দেখব তৃষ্ণা মিটে কি না!

দু মাসের ছুটির ব্যবস্থা হল। যা সঞ্চয় ছিল তা নিয়ে দুজনে মিলে দুন এক্সপ্রেসে উঠলাম। দেরাদুন থেকে মুসৌরী যাব; পটভূমিতে থাকবে হিমালয়, আমার ও শুভ্রার মধ্যে কোন আত্মীয়ের বা ফাইলের আবরণ থাকবে না। ট্রেন যতই এগুতে লাগল, লক্ষ্য যতই নিকটতর হতে থাকল, আমাদের ব্যগ্রতা ততই বাড়তে লাগল, উচ্ছ্বাস বার বার সীমা অতিক্রম করল।

বড্ড বেশী সিগারেট খাচ্ছি, তাই না? এত উঁচুতে উঠে হঠাৎ অত সিগারেট খাওয়া উচিত নয়। তা হোক।

অবশেষে রাতটুকু পোহালেই যখন দেরাদুনে গিয়ে পৌঁছব, তখন শেষ রাত্রির দিকে হঠাৎ শুভ্রার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা উঠল। দু-চার বার বাথরুমে গেল, বাথরুমে গিয়ে হয়তো বমিও করে থাকবে। আধ ঘণ্টা পরে দেখি শুভ্রার চোখের নীচে কালো দাগ পড়ে গেছে; গাল দুটো ভেঙে গেছে। তখন আর ওর উত্থানশক্তি ছিল না; ট্রেনের সীটের ওপরই ভেদ-বমি শুরু করে দিল। চোখ দুটো থেকে বিষাদের ভাবটা সরে গেল। হতাশাভরে ও এদিকে ওদিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত চাইতে থাকল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হরিদ্বারে ট্রেন পৌঁছুতে রেল-কর্তৃপক্ষের লোক এসে স্ট্রেচারে করে শুভ্রার অচেতন দেহটা হাসপাতালে

নিয়ে গেল। বেলা চারটেয় সব শেষ।

কোন একটা আশ্রম থেকে জনাপাঁচেক স্বেচ্ছাসেবক এলেন। আমার তখন যে অবস্থা, আঘাতের গুরুত্ব অনুভব করবার সামর্থ্যও নেই। ইন্দ্রিয়গুলো যেন অথর্ব হয়ে গেছে। যন্ত্রচালিত পুতুলের মত শুভ্রার শেষকৃত্য সেরে আমি গঙ্গার ঘাটের নির্জ্জন একটি প্রান্তে গিয়ে বসলাম। তর তর বেগে গঙ্গা বয়ে চলেছে, এতক্ষণে আমার বুক ফেটে কান্না বেরোল। এতক্ষণে আমি নিজের অসহায়তা, আশাভঙ্গ সম্পর্কে সচেতন হলাম। এই আঘাত ভুলব কেমন করে? এর পর? হাঁটুর মাঝে মুখ গুজে আমি কান্না রোধ করবার চেষ্টা করলাম। সন্ধ্যার পর রাত্রি নেমে এল। শৈলদিগন্ত অন্ধকারে ঢাকা পড়ল; গঙ্গা নিঃশব্দে আপন মনে বয়ে চলল। তখন আমার চোখের জল শুকিয়ে গেছে। প্রবহমাণা গঙ্গার দিকে চাইলাম; কিন্তু এই মুহূর্তে যে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছি, এই মুহূর্তেই সেই গঙ্গা কঙ্খাল ছাড়িয়ে অনেক—অনেক দূরে চলে গেছে। সব-কিছু বয়ে চলেছে, জগৎ, জীবন সব-কিছু নিত্য প্রবহমাণ; এক দণ্ড দাঁড়াবার সময় নেই কারও; উপায়ও নেই। সব ফুরিয়ে যাচ্ছে, ক্রমাগতই ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিছুই থাকছে না, কিচ্ছু না। ত্রিশ বছর পর আজও আমি যেই একা সেই একা। এর শেষ কোথায়? এই যে সব ছুটে বয়ে চলেছে এ কোন্ চন্দ্রের আকর্ষণে? তাঁর কাছে পৌছলে কি এই গতি যতি পাবে, এই চঞ্চলতা শুদ্ধ হবে। সে কে, সে কী, সে কোথায়? আর যাঁরা শেষ পর্যন্ত বইতে পারল না, যাঁরা মাঝপথেই ফুরিয়ে গেল, যাঁরা হরকীপ্যারী থেকে ভাসানো ওই প্রদীপগুলোর মত দপ করে জ্বলে উঠেই নিবে গেল, তাদের কী সান্ত্বনা রইল? আকাশের তারাগুলো পিট পিট করতে থাকল, গঙ্গার প্রবাহ থমকে দাঁড়াল না।

শবদাহ সমাধা হতে একজন সাধু আমাকে ডেকে ধর্মশালায় নিয়ে এলেন। মাত্র ঘণ্টা কয়েক আগে যে ধর্মশালা দেখে গেছি জনশূন্য, এখন ফিরে দেখি তা যাত্রীসমাগমে গম গম করছে। সমস্ত রাত্রি শয্যার উপর সজাগ বসে কাটিয়ে দিলাম। পরদিন সকালেই আবার ধর্মশালা জনশূন্য শ্মশানের মত খাঁ-খাঁ করতে লাগল। বিকেলেই আবার যাত্রী দলের আগমনে মুখর হয়ে উঠল। আসছে

যাচ্ছে, আসছে যাচ্ছে—বিরামবিহীন। কোথা থেকে আসছে, কেন যাচ্ছে? জীবনে কোনদিন যে সমস্যার অস্তিত্বই অনুভব করি নি, সেই নশ্বরতার সমস্যা যেন আমাকে পেয়ে বসল, ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। বিগত জীবনের এক একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে, তার অবশিষ্ট খুঁজতে গিয়ে দেখি—সেই ঘটনার চিহ্নটুকুও আর নেই। অতীতের সব কান্না থেমে গেছে, সব আনন্দ স্তব্ধ হয়ে গেছে, সব আশা ভেঙে গেছে। তবে কী রইল, শেষ পর্যন্ত কী থাকবে?

এর আগে উপর্যুপরি তিন রাত্রি চোখের পাতা এক করতে পারি নি; তৎসত্ত্বেও পরদিন রাত্রে ঘুম এল না। ধর্মশালার কোনে বিছানার উপর একা জেগে বসে আছি। মাছপাতুড়ির মত গায়ে গায়ে যাত্রীরা শুয়ে আছে। শুয়ে শুয়ে মৃদু কণ্ঠে দুজন বুড়ী গল্প করছিল: হ্যাঁ বোন, সব ছেড়েই এসেছি; ছেড়ে না এলে কি আর ছাড় পাওয়া যায়? বউটাই না হয় মারা গেছে, নাতনীটাকেই না হয় দেখবার কেউ নেই,—কিন্তু ইহকাল দিয়েছি বলে কি পরকালটাও দিতে হবে? আজ বাদে কাল মারা যাব, আজকেই যদি ব্যবস্থা করে না রাখি তবে তখন আমায় কে দেখবে? মরলেই যদি সব শেষ হত তবে না হয় নাতি-নাতনী নিয়েই বাকি দিন কটা কাটিয়ে দিতাম। কিন্তু তা তো হবার নয়। ভেবেচিন্তে তাই এবার চোখ কান বুজে বেরিয়েই পড়লাম। একবার বাবা কেদারনাথ তো দর্শন করে নিই, তারপরে যা হবার হবে।

পরদিন সকালে সূর্যোদয়ের আগেই ধর্মশালার এক সাধুর জিম্মায় মালপত্র গচ্ছিত রেখে এই ঝোলা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং সত্যি কেউ আছেন কি না, তাঁকে পাওয়া সম্ভব কিনা?

তিনি আছেন, তিনি না থাকলে কি এমন সম্ভব? চেষ্টা করলে তাঁকে নিশ্চয় পাওয়াও যাবে। আমি যতই ভুলে থাকি না কেন, তাঁর ক্ষমা তো অন্তহীন। মাঝে মাঝে সংশয়ের ধোঁয়ায় দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসে কিন্তু চোখ মেলে চতুর্দিকে একবার চাইলেই সব সন্দেহ সব সংশয় দূর হয়ে যায়।

ভদ্রলোক দূর তুষার-দিগন্তের দিকে নিমীলত চক্ষে তাকিয়ে রইলেন। আমার বলবার কিছু ছিল না; সান্ত্বনা বাহুল্য হত, সমবেদনা প্রকাশ বাতুলতা হত। দু গেলাস চায়ের নির্দেশ দিয়ে আমিও সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় সমাহিত শান্ত সৌম্য উদার তুষার শিখরের দিকে চাইলাম।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। যাত্রীরাও প্রায় সবাই ইতিমধ্যে আবার পথে নেমে পড়েছে। সন্ধ্যার আগেই ত্রিযুগীনারায়ণে পৌঁছনো প্রয়োজন। অবশেষে আমরা দুজনও নিঃশব্দে পথে পা বাড়ালাম।

মেয়াদ ফুরোতে দিন বিনাবিবাদে ম্লান হেসে বিদায় নিল; সময় সমাগত হলে রাত্রি এসে আপন কর্তব্য হাতে তুলে নিল শ্রদ্ধাভরে। অনুশোচনাও নেই, ঔদ্ধত্যও নেই, ছেড়ে দেওয়া ও টেনে নেওয়া একান্তই প্রাকৃতিক নিয়ম। বৃষ্টিস্নাত অরণ্যানী আপন শ্যামলতায় চিকচিক করতে লাগল। মৃদু হাওয়া যেন অন্তরীক্ষের উষ্ণশ্বাস।

ত্রিযুগীনারায়ণে গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন এক খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়া ছাড়া আর কিছুর সময় ছিল না। পাওার দেওয়া পুরু কার্পেটের উপরে পাণ্ডার দেওয়া লেপ গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়তে খেয়াল হল যে রওনা হবার পর থেকে একদিনও এমন জায়গায় শুতে পারি নি যেখানে অসমান তরঙ্গায়িত মেঝে পিঠে পীড়া দেয় নি। আজই প্রথম শুয়ে পড়তেই ঘুমে চোখ বুজে এল। এমন সময় আমাদেরই চটির অপর প্রান্ত থেকে কর্ণেল রিহির বাঙালী পত্নী মৃদুকণ্ঠে গান ধরলেন—তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি।

হঠাৎ খেয়াল হল যে আজ সমস্ত সন্ধ্যা যাঁর কাহিনী শুনে কাটল তাঁর নামটাই জিজ্ঞেস করা হয় নি। ঘুমে তখন আমার চিন্তাশক্তিও অবশ হয়ে এসেছে। ভাবলাম, নাম জিজ্ঞেস করবার আর কী প্রয়োজন। মানুষ ছাড়া আর কে তাঁকে প্রতিজীবনে খুঁজে মরবে? এ মানুষেরই নিয়তি।

সাত

আসল তাৎপর্য আরও অনেক পরে প্রতিভাত হয়েছিল। তবে গুপ্তকাশীতে যেমন, ত্রিযুগীনারায়ণেও তেমনই পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন মনে হল, এক রাত্রিতেই বয়স বুঝি দশ বৎসর বেড়ে গেছে। দেহে এই বয়োবৃদ্ধির কোন লক্ষণ প্রকট নয়; হাঁটু দুটো বাদ দিলে, দেহ বরং দিন দিন সজীবই হয়ে উঠছে। কিন্তু মনে—কী বলব, কী বললে বিষয়টার গুরুত্ব সঠিক প্রকাশ পাবে, হাস্যকর বাতুলতা মনে হবে না।—মনে, কেমন যেন একটা নিষ্কামতা ক্রমশ পরিব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এই নিষ্কামতাকে প্রথমটায় মানসিক আলস্য বা মনের ভাবগ্রাহিতার সংবেদন-শীলতার স্পর্শকাতরতার সংকোচন বলে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়। আমার অন্তত তাই সন্দেহ হয়েছিল। পূর্বদিন সন্ধ্যায় ভদ্রলোকের সেই করুণ কাহিনী শুনে যখন বিগলিতও হলাম না, আবার সেটাকে হাস্যকর ভাব-বিলাসিতা বলে উড়িয়েও দিতে পারলাম না; তখন একবার মনে হয়েছিল যে, এ আমার ভাবগ্রাহিতার ও বেদনা বোধেরই দীনতা। যতই উপরে উঠছি, ততই আমি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তা সম্ভবত সত্যি নয়। কারণ, এই সন্দেহ আমার সেই সময়ই হয়েছিল। তা ছাড়া পরদিন সকালে ত্রিযুগীনারায়ণে যখন ঘুম ভাঙল তখন আমি শান্তমনে পূর্বদিনের শ্রুত কাহিনীটি আর একবার ভেবে দেখলাম, এবং তার পরেও সমান শান্ত রইলাম, সমান অনুত্তেজিত, সমান নিরুদ্বিগ্ন। প্রাক্-সূর্যোদয়ের বাঁধভাঙা চাপা প্রভায় পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ তখন সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলটির মত চোখ মেলে চাইছে। প্রশান্তি ও উদারতায় সব-কিছু স্নিগ্ধ। লেপের তলা থেকে মুখ বার করে পূর্বদিনের কাহিনীটি স্মরণ করে আমার মনে

হল, এই তো নিয়ম, এই তো স্বাভাবিক। মানুষ আসছে যাচ্ছে, মাঝে দু-চারবার হাসছে কাঁদছে। এতে সুখী হবারই বা আছে কী, আর দুঃখী হবারই বা আছে কী? কিন্তু তবু কী আশ্চর্য মর্মস্পর্শী আখ্যান; জীবনের গভীরতা যেন দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে; উদারতা করেছে সীমাহীন। বয়স যেন এক রাত্রিতেই দশ বৎসর এগিয়ে গেছে। মনে কেমন একটা অচপল পরিণত স্থিতি-স্থাপকতা! আত্মনির্ভরতার উদ্ধত দুর্বলতা যেন অতীতের ঘটনা। যেন মনে হল যে এইবারে হয়তো অপরিবর্তনীয় অনিবার্যকে সহজেই মেনে নেবার ক্ষমতা আয়ত্ব হয়েছে। চেষ্টা না করলে বুঝি বা আত্ম-সমর্পণ করতেও সক্ষম হব। চিন্তার অন্তরঙ্গ অনুসঙ্গগুলো ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যেতে নিজেকে একটু নিঃসঙ্গ মনে হল। কিন্তু দৈন্যের লেশ মাত্র নেই সে-নিঃসঙ্গতায়। জন্মের আগেকার ও মৃত্যুর পরেকার নিঃসঙ্গতার মতোই এর উষ্ণতা!

প্রথম প্রভাতের স্নিগ্ধ নরম আলোয় শুয়ে শুয়ে নিঃশব্দে অবগাহন করতে লাগলাম। নিজেকে মনে হল যেন বিশাল-বক্ষ নদী-শয্যা তেমনি বলিষ্ঠ, তেমনি সহিষ্ণু; তেমনি নির্বাক এবং সুদূর। সুদীর্ঘ সাতাশটি বৎসর,—সুদীর্ঘ সাতাশ বৎসর ধরে যা ছিল অবজ্ঞাত এবং অবহেলিত, বিস্মিত বিক্ষিপ্ত এবং মৃত;—সেই অচলায়তন যেন আজ ধীরে ধীরে পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠছে। সুদীর্ঘ সাতাশ বৎসরের রুদ্ধতা কাটিয়ে আপন প্রবাহ পথ খুঁজে পেয়েছে। কত ঘটনা ঘটে গেছে—কত সুখ কত দুঃখ—অথচ কিছুই জানা হয়নি দেখা হয়নি বুঝে নেয়া হয়নি। সুদীর্ঘ সাতাশ বৎসর আত্মকেন্দ্রিকতার চুষি-কাটি চুষিয়ে নিজেকে নিজের হাত থেকে ভুলিয়ে রেখেছি। ক্ষুদ্র হতাশা ও সংশয়, ক্ষুদ্র বৈচিত্র্য ও বেদনায় নিজেকে বিব্রত বিক্ষিপ্ত বিভ্রান্ত করে রেখেছি। জানতেই দিইনি এ-বিশ্ব কি বিরাট বিপুল এবং বৈচিত্র্যময়। সুদীর্ঘ সাতাশ বৎসর অতিবাহিত হয়েছে কিন্তু যেন সাতাশটি মুহূর্তও কাটেনি। প্রাকৃতিক নিয়মে প্রাণের স্ফূর্তি শুরু হয়েছে, দেহের স্ফূর্তি স্তিমিত হয়েছে কিন্তু বুদ্ধি ও চেতনা রয়ে গেছে বালসুলভ বাতুল এবং অপরিণত। যেন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র—দায়িত্বহীন নির্বোধ অপ্রতিভ। অবশেষে কবে কখন থেকে যেন সেই মৃত সাতাশ বৎসরের অনড়তায় প্রাণ সঞ্চার সুরু হয়েছিল।

ত্রিযুগীনারায়ণের সূর্যস্নাত প্রভাত বেলায় যখন সে সম্পর্কে সচেতন হলাম ঘটনাটির অভিনবত্ব তখন সম্পূর্ণ কেটে গেছে। বিস্ময় বোধেরও সামান্যতম প্রয়োজন অনুভূত হল না, এ-যেন একান্তই স্বাভাবিক এবং শেষ বিচারে অনিবার্য ছিল। অনভ্যস্ত স্কন্ধে বোঝাটা সামান্য গুরুভার মনে হল—মুহূর্তের জন্য,—ত্রিযুগীনারায়ণের উষ্ণ আলোয় চোখ বুজে অবগাহন করতে থাকলাম। ক্ষুদ্র ছিঁচকাঁদুনি থেমে গেছে—যা কিছু ঘটবার ছিল সব কিছু ঘটেছে, আরও যা ঘটবার তা-ও সব ঘটবেই—ত্রিযুগীনরায়ণের ঘনিষ্ট আলোয় অনায়াসে সর্বাঙ্গীন আত্মসমর্পণ করলাম। বয়স যেন এক রাত্রিতেই সাতাশ বৎসরে পৌঁছে গেছে। নিজেকে সাতাশ বৎসর পিছনে ছেড়ে এসে ছিলাম—আবার তার সন্ধান মিলেছে,—মিথ্যা ময়ুরপুচ্ছ আজ বাহুল্য। নিজেকে নিয়ে অতি-সাবধানতার আজকেই ইতি। ত্রিযুগীনারায়ণের আলোর অন্তরঙ্গ আলিঙ্গনে মত্ততা আছে।

সে-আলোয় ডুব দিয়ে তখন স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেছি। আমার গত সাতাশ বৎসর আবার করায়ত্ত হয়েছে, এখন থেকে আমি কেবল আমিই থাকব, আমিই হয়ে উঠব। সেদিনের সেই আত্ম-বিস্মৃত মূঢ়তার কথা ভাবলে আজ হাসি পায়। কান্নারও উদ্রেক হয়। হায় রে, যেই নাগরিক ব্যাধিতে আমি পঙ্গু তা কি অত সহজে নিরাময় হবার! শয্যায় যতক্ষণ শায়িত ছিলাম ততক্ষণ ঐ দিবাস্বপ্নে নিজেকে মোহিত রাখা গিয়েছিল, ততক্ষণই। অবশেষে শয্যাত্যাগের পর উপর্যুপরি দু'গেলাস চা ও দুটো সিগারেট পান করে দেখি তন্মধ্যে কখন আবার আপন বিবরে ফিরে এসেছি। যাত্রী থেকে কখন টুরিস্ট হয়ে গেছি। দৃষ্টিতে আবার সেই অভব্য কৌতূহল, চিন্তায় সেই অশ্লীল সংশয় আর সন্দেহ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ত্রিযুগী নারায়ণের আলো কণামাত্র ম্লান হল না।

আমার দেখা ত্রিযুগীনারায়ণের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য সেখানকার আলো। এমন আলো এত আলো যে এই পৃথিবীতেই সম্ভব প্রথমটায় তা ঠিক বিশ্বাস হয় না। এ আলো উদ্ধত নয় রূঢ় নয়, মাতৃস্নেহের মত

অপ্রতিরোধ্য আর সর্বব্যাপক। আঁধারকে এ ধিক্কার দেয় না, ব্যঙ্গ করে না—সস্নেহে তার কালিমা মুছিয়ে দেয়। প্রেমের মত, সঙ্গীতের মত এ আলো ভাবগ্রাহীর অজ্ঞাতসারেই তার দেহের শিরা-উপশিরা প্লাবিত করে দেয়, রোমকূপগুলো উচ্ছ্বসিত করে তোলে। মনে হয়, চোখ বুজলে, হাত বাড়ালে এই আলোর কোমলতা বুঝি বা স্পর্শও করা যাবে। ত্রিযুগীনারায়ণে আলোর এমন অপর্যাপ্ততার কারণ কেবল তুষারশিখরের নৈকট্য নয়। ত্রিযুগীনারায়ণ পর্বতের প্রায় চূড়াদেশে বৃহৎপরিসর এক মালভূমিতে অবস্থিত।

মহাপ্রস্থানের পথের একটি ব্যস্ততম চৌমাথা এই ত্রিযুগীনারায়ণ। তীর্থ হিসেবে এর মৌলিক খ্যাতি ব্যতিরেকেও গঙ্গোত্রীর রাস্তা এই পথে কেদারনাথ চলে গেছে। যাত্রীমাত্রেই ত্রিযুগীনারায়ণে অন্তত এক রাত্রি থাকতে বাধ্য। সত্যযুগে নাকি এখানেই নারায়ণ সাক্ষী করে হোমাগ্নি জ্বেলে শিব-পার্বতীর বিয়ে হয়েছিল। সেই হোমাগ্নি আজও অনির্বাণ জ্বলছে। এর পরেও আর শিবদুর্গার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করবার অবকাশ কোথায়? আমরা পাঁচ জন মিলে পাঁচ সিকে দিয়ে মোটা একটা কাঠের গুঁড়ি ধরাধরি করে হোমাগ্নিতে প্রদান করলাম। এইই রীতি।

হোমাগ্নির কম্পমান আলোয় প্রায়ান্ধকার মন্দিরাভ্যন্তর মাঝে মাঝে চমকে উঠছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের বেদী ঘিরে পূজারীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। পাণ্ডারা কেউ পূজো দেওয়াচ্ছে, কেউ বা যজমানের অভাবে হোমাগ্নির পাশে বসে আগুন পোয়াচ্ছে আর তামাক টানছে। মন্দির বলতে যে অলঙ্কার হীন রিক্ত শুন্যতা বোঝায়, ত্রিযুগী-নারায়ণের মন্দিরে তার চিহ্নমাত্র নেই। এ যেন অনেকটা সভাগৃহে পরিণত পার্লারের মত। মন্দিরের শান্ত সৌম্য সুন্দর রৌপ্যমূর্তি-গুলো দেখেও মনে যেন ঠিক ভক্তিভাব উপজাত হল না। তবে কেমন যেন নম্র বোধ করলাম।

বাইরে থেকে বরং মন্দিরটাকে অনেক বেশী গুরুগম্ভীর মনে হয়। অনেকটা যেন লিঙ্গরাজের মন্দিরের মত দেখতে, অথচ খুঁটিয়ে দেখলে এ দুয়ে কোন জ্ঞাতিত্বই চোখে পড়ে না। একের প্রভাবে অপরের প্রভাবিত হবার সম্ভাবনাও কম। কিন্তু তবু কোথায় যেন একটা অনস্বীকার্য ঐক্য আছে। মন্দিরচত্বরে চৌবাচ্চার মত

বাঁধানো গোটা পাঁচেক ছোট কুণ্ড আছে—কিম্বদন্তী, সেগুলোর জল নারায়ণের পদনিঃসৃত। সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই, তবে পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেটের প্রভাবে প্রত্যেকটা কুণ্ডের জলই যে লালচে সেটা লক্ষ্যনীয়। মন্দিরে প্রবেশপথের দু ধারে ছোট ছোট কতকগুলো মন্দিরের মডেল আছে—বুদ্ধগয়ার স্তূপগুলোর মত। তাদের কোনটার ভিতরে গণেশ-মূর্তি, কোনটার ভিতরে হর-পার্বতীর। প্রত্যেকটির সামনেই মস্ত এক-একটি পেতলের থালা সাজিয়ে ছিন্নবসন এক-একজন গ্রাম্য বালক দাঁড়িয়ে আছে। এরা পাণ্ডাদের শিক্ষানবিশ। যাত্রী দেখলেই চেঁচিয়ে ওঠে: আইয়ে শেঠজী, হর-পার্বতী দর্শন কিজিয়ে। মনে ভক্তি না থাকলেও এই পর্বত-সন্তানদের সরল মিষ্টি ডাক অবহেলা করা শক্ত। যাত্রী এগিয়ে এলে ফুলনৈবেদ্য হাতে নিয়ে প্রমাদপূর্ণ সংস্কৃত যে মন্ত্র ওরা আওড়ায় তার একটি শব্দেরও অর্থোদ্ধার করা অসম্ভব, কিন্তু তবু ওই অবোধ্য ধ্বনিগুলো কেমন করে জানি না মনের গহনে একটা চাপা আলোড়ন তোলে। তখন আর সানন্দে প্রার্থিত প্রণামী না দিয়ে উপায় থাকে না। সমস্ত সঙ্কোচ যেন অকস্মাৎ কোথায় মিলিয়ে যায়; আত্মসচেতনতা সত্বেও যাত্রী নির্বিবাদে হেঁট হয়ে অপরিচিত বিগ্রহকে সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণাম করে। আমার মনও তখন সম্পূর্ণরূপে ভক্তিভাবমুক্ত ছিল, কিন্তু সেই কারণে পূজো না দেওয়া, প্রণাম না করা আমার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হল না।—তা বাতুলতা হত এবং তা আমার মানসিক দীনতার অবস্থা চোখে আঙুল দিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দিত। তার চাইতে মরণ ভাল। অতএব পাণ্ডা যখন বলল, কোট-প্যান্ট পরে পূজো দিতে কোন বাধা নেই তখন আমিও সসঙ্কোচে একটি নৈবেদ্যের থালা নিয়ে সকল পূজারীর পিছে গিয়ে দাঁড়ালাম! মন্ত্রোচ্চারণের সময়ও আমার বার বারই মনে হতে থাকল, এতে কী লাভ? এ দিয়ে আমার কী হবে? তারপর পূজান্তে হেঁট হয়ে মাথা ঠুকে যেই প্রণাম করতে গেছি অমনি আমার টুপির কানাত মাটিতে ঠেকে চামড়া দিয়ে বাঁধানো বিলিতী ফেল্ট হ্যাটটা একেবারে প্রণামীর থালার উপর গিয়ে পড়ল। লজ্জায় আশঙ্কায় মুহূর্তমধ্যে কর্ণমূল লাল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি টুপিটা তুলে

নিয়ে আমি সেখান থেকে পালিয়ে এলাম।

তারপর চা-পান, তারপরে ননী ও তারাদার কী নিয়ে যেন এক অহ্ক বিবাদ। তারপর ত্রিযুগীনারায়ণ ত্যাগ করে আবার পথ ধরা।

ত্রিযুগীনারায়ণ সামনে ছেড়ে আমরা পিছিয়ে আসছি। ঝকঝকে তকতকে মক্ষিহীন ক্লেদহীন ত্রিযুগীনারায়ণ দূরে—ক্রমশ আরও দূরে আপন মহিমময় আলোয় অবগাহন করছে। ত্রিযুগীনারায়ণ গ্রামটি বড় ভাল লেগেছিল; এ জন্মে হয়তো আর কখনও এখানে ফিরব না, কিন্তু ত্রিযুগীনারায়ণ ছেড়ে আসতে একটিও দীর্ঘশ্বাস পড়ল না। আমাদের পথ ত্রিযুগীনারায়ণ অতিক্রম করে সামনে কেদারনাথের দিকে প্রসারিত। দু দণ্ড দাঁড়াবার সময়ও নেই, তার জন্যে ক্ষোভও নিষ্প্রয়োজন। দর্শনের কঠিন কঠিন সূত্রগুলো কেমন যেন সহজ সরল স্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে যতই উপরে উঠছি।

ছায়াচ্ছাদিত সঙ্কীর্ণ সোজা পায়ে-হাঁটা পথ। পথ উৎড়াই। ঝরনাধারার মত স্বচ্ছন্দ উচ্ছ্বাসে যাত্রীদল বয়ে চলেছে; পথে গাছের শুকনো পাতা ছড়িয়ে পড়েছে, মন্দমধুর হাওয়া বইছে। মনে হয় সুখ অতি সহজ সরল। সবাইকে এড়াবার মানসে, মনটাকে উড়িয়ে দেবার প্রয়াসে, একটু জোরে পা চালালাম। একে একে সবাইকে অতিক্রম করে গেলাম; শাকম্বরী-মাতার মন্দিরও পথের বাঁ পাশে পড়ে রইল। মন্দরটিকে দূর থেকে দেখে কেমন একটু বিস্ময় লাগল; কাল যেন কখন নিজের অবচেতনে বিশ্বাস করেছিলাম যে আমার গত সন্ধ্যাটিকে রমণীয় করবার জন্যেই ও এতকাল দাঁড়িয়ে ছিল। এর পরে বোধ হয় আর থাকবে না। কিন্তু আজও দেখি জীর্ণ মন্দিরটি পথের পাশে নিরুদ্বিগ্নে ঝিমোচ্ছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতায় আঘাত লাগতে প্রথমটায় অস্পষ্টভাবে একটু আহত হলাম, মৃদু হেসে আবার পথ ধরলাম। উৎরাই পথ। গতিপ্রাপ্ত পাথরের মত লাগাম ছেড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে হুড়মুড় করে এগিয়ে চলেছি। ত্রিযুগীনারায়ণ অনেক আগে অদৃশ্য হয়ে গেছে, শাকম্বরী-মাতার মন্দিরের চূড়াও দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল, সহযাত্রীদের মধ্যে যারা আমার অনেক আগে রওনা হয়েছিল তারা সব পড়ে রইল পিছনে। যে পথ দিয়ে কাল এসেছিলাম সেই পথ

ভাইনে ছেড়ে নব জোয়ারের উদ্দাম স্রোতের মত হু-হু করে নেমে চললাম। উৎরাই-স্রোতে গা ভাসাতে বড় আরাম।

বেলা এগারোটা নাগাদ শোণপ্রয়াগে এসে পৌছুলাম, বাসুকী ও মন্দাকিনীর এইটে সঙ্গমস্থল। দেবপ্রয়াগ বা রুদ্রপ্রয়াগের খ্যাতি এর নেই; ব্যস্ততাও না। এমন কি যাত্রীর রাত্রিযাপনযোগ্য একটি চটি পর্যন্ত নেই এখানে। শুধু একটা চায়ের দোকান আছে, সেখানে চাল-ডালও পাওয়া যায়। যাত্রী নিতান্ত অপারগ হলে এখানে বড় জোর এক বেলা বিশ্রাম নিতে পারে। কিন্তু বিনা প্রয়োজনেও যে যাত্রী এখানে বসে এক গেলাস চা পান না করে তাঁর মত অভাগা বুঝি আর নেই।

গভীরতম উপত্যকার একেবারে তলদেশে, হিমালয়ের অন্দর মহলে শোণপ্রয়াগ। চারিপার্শ্বে খাড়া পর্বতরাজি গগন স্পর্শ করতে উদ্যত, এক দিক 'থেকে মন্দাকিনী অপর দিক থেকে বাসুকী এসে অবিরত ভীমগর্জনে মিলিত হচ্ছে। যুগপৎ পৃথিবীর গতি ও স্থিতি লক্ষ্য করবার এমন প্রকৃষ্ট স্থান আর কোথায় আছে জানি না। পাশেই ছোট্ট কুঁড়েঘরে নিরীহ চায়ের দোকান। মানুষের সৃষ্টি যেন সসম্মানে আপন ক্ষুদ্রতা স্বীকার করে নিয়েছে। ওই দোকানের চা যেন মেস্কালিনের ক্রিয়া করল।

গত সপ্তাহকাল ধরে, বাসে বা পায়ে, হিমালয়ের পার্বত্য পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কত প্রয়াগ দেখলাম, কত নদী পার হলাম, কত চড়াই ভাঙলাম উৎরাই নামলাম, কত চূড়া দেখে উদাসীন হলাম, তুষারশৈল দেখে মুগ্ধ হলাম। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সব দেখাই ছবির দোকানের টাঙানো ছবিগুলোর মত ভিন্ন ভিন্ন রয়ে গেছে, ফ্রেস্কোর অনুরূপ সুবিন্যস্তভাবে সুসজ্জিত হয় নি। যদিও মাঝে মাঝে একটা ঐক্যের আভাস পেয়েছি; কিন্তু হিমালয় এখনও আমার কাছে একবচন হয় নি, বহুবচনই রয়ে গেছে। চোখ বুজলে হয় এই সঙ্গমের কথা মনে পড়ে, কিংবা ওই নদীপথ, নয়তো সেই চূড়ো। হিমালয়ের ব্যাপ্তি সামগ্রিকরূপে ধারণ করেতে পারি এমন ক্ষমতা আমার মধ্যবিত্ত সঙ্কীর্ণ চিত্তের নেই। এই শোণপ্রয়াগ বিশাল হিমাচলের সংক্ষিপ্তসার স্বরূপ। দুটো পাহাড়ের মাঝপথে হিমালয়ের যতটুকু অংশ এখানে বসে চোখে

পড়ে তাও বিরাট। কিন্তু তা দর্শককে হতভম্ব করে দেয় না। ওপর দিকে চাইল যতটা আকাশ দেখা যায়, একটু চেষ্টা করলে ততটা হৃদয়ে ধারণ করা শক্ত নয়। হিমালয়ের শোণপ্রয়াগ যেন মহাভারতের রাজশেখর বসু-সংস্করণ। পরিতুষ্ট মনে চা পান করতে লাগলাম।

একে একে আবার সবাই আমাকে পেরিয়ে যেতে লাগল। বুড়ি গেল, প্রগল্‌ভা গেল, সাধুবাবা গেল, কর্ণেল আর কর্ণেল-পত্নী গেল। এর আগে—অনেক আগে যখন এঁদের সবাইকে পথে অতিক্রম করে এসেছি তখন স্বভাবতই একটা বিজয়গর্ব অনুভব করেছিলাম। শশকের মতো ঝিমোতে ঝিমোতে এখন একে একে কচ্ছপদের এগিয়ে যেতে দেখে পরাজয়ের অপমানে মুখ ভার করবার আগেই মনে মনে হেসে ফেললাম—প্রতিদ্বন্দ্বিতা শব্দটার অগভীরতা হঠাৎ যেন স্পষ্ট চোখে পড়ল।

যে নাগরিক সভ্যতায় আমি আজন্ম লালিত পালিত, সে সভ্যতার মূলকেন্দ্র হচ্ছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সে সমাজে সভ্য বলে পরিচয় দিতে হলে, সবাইকেই পড়শীর চাইতে এক বিঘত উপরে উঠতে হবে। সেই ওঠার আর শেষ নেই। কারণ, যে স্তরেই তুমি উঠে থাক না কেন, সেখানেও তোমার পড়শী আছে, যাকে অতিক্রম করতেই হবে। অতএব সর্বদা সজাগ থাক, সচকিত থাক, সন্ত্রস্ত থাক, নজর রাখ যাতে কেউ তোমাকে কখনও এক চুলও ছাড়িয়ে না যেতে পারে। সভ্যতা মানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ নেই। যদি শেষ পর্যন্ত না ছুটতে পার তবে উইলি লোম্যানের মত পথের গ্লানিতে মাথা খুঁটে মর। আর যদি প্রতিযোগিতায় প্রথম হও তবে তুমি প্রস্তরীভূত আক্‌ল বেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতাকেন্দ্রিক সভ্যতার ওই দুটোই পরিণতি। দুটোই ঘৃণ্য। তা হলেও তৃতীয় পথ কিছু নেই!

আমরা, যারা এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যেই জন্মলাভ করেছি এবং জন্ম থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছি, প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন জীবনের কথা আমরা কল্পনাই করতে পারি না। সে যে স্থবিরত্ব, সে যে মৃত্যু। অথচ মানুষে মানুষে সত্যিই কি কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভব? প্রত্যেক মানুষই একটি করে উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মেছে; কোন দুটো মানুষেরই আত্মব্রহ্ম এক ব্রহ্ম নয়; সেই ব্রহ্মলাভের পথও ভিন্ন ভিন্ন মানুষের বিভিন্ন;

মনুষ্যজীবনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অর্থহীনতা বোঝাবার জন্যে উচ্চ দর্শনের এই সকল যুক্তি আমি বুঝিও না, বোঝাতেও পারবো না। কিন্তু হিমালয়ের গভীরতায় এই শোণপ্রয়াগে বসে আজ যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছি, একেবারে হাঁটুর এই ব্যথাটির মত, যে আমি একক, আমি অনন্য; আমি উত্তমও নই অধমও নই, আমি ভিন্ন। নিজের বদলে আমি অন্য কেউ হতেও পারি নে, হতে চাইও না। সত্য বটে আমি আপিসে আমার সাক্ষাৎ-ওপরওয়ালার আসনে বসতে পারলে খুশী হতাম, কিন্তু সে আমার আমিত্ব পালটে নয়, আমিত্ব সমেত। দরিদ্র যখন রাজাকে ঈর্ষা করে তখন কি সে তার দারিদ্র্য ব্যতিরেকে রাজা হতে চায়? তবে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতার অর্থ রইল কি? শুধু পোষাকে পোষাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শুধু টেবিলে চেয়ারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, শুধু বাড়িতে গাড়িতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা—কিন্তু এই সব কি মানুষ? মানুষে মানুষে তা হলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোথায়? নিয়তির অনুশাসনে প্রত্যেক মানুষকে তাঁর নিজের ক্রুশ বহন করতে হবে—অন্যের কাঁধে সে বোঝা চাপানোর চেষ্টা বাতুলতা, অন্যের ক্রুশের সঙ্গে সে ক্রুশ বিনিময় করা অসম্ভব। তবে কেন পরস্পরের সঙ্গে আমরা এমন বিবাদ করে মরি? তবু মরি। চা-পান সমাধা হতে সিগারেট ধরালাম—নিত্যপ্রবাহমাণ সঙ্গমের দিকে চেয়ে, নিত্যকালের প্রহরী পর্বতের দিকে চেয়ে, নিত্যপ্রসারিত পথের দিকে চেয়ে ক্ষীণায়ু একটা সিগারেট ধরালাম।

আপন আপন ক্রুশ বহন করে যুগাতিযুগ ধরে যাত্রিদল উৎরাই নেমে আসছে,—বসে এক গেলাস চা পান করছে, তারপর আবার চড়াই বেয়ে চলে যাচ্ছে। ক্রমে কর্নেল-কন্যা নেমে এলেন। এর আগে যতবারই আমি ওঁকে দেখেছি, ততবারই আমার উর্মিমালার কথা স্মরণ হয়েছে। ঠিক যেন প্রজাপতিটির মত। রঙচঙে, মাটিতে পা পড়ে না, খাদ্য শুধু ফুলের মধু আর বায়ু, বেতসলতার মত দেহ যেন পুরোটাই কল্পনা। এখন দেখেও আবার প্রজাপতির কথাই মনে পড়ল, তবে বিপরীত দিক থেকে। শুঁয়োপোকার মত মুখ গোমড়া করে, অবিন্যস্ত দেহলতাটিকে কোন ক্রমে টেনে টেনে তিনি চড়াই বেয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। খেয়ালও করলাম না যে এর আগেই কখন তিনি আমার জগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্বাসিতা হয়ে গেছেন।

কখন থেকে আর আমার অক্ষম রীরংসার আয়ত্তাতীত ইন্ধন নন; সন্দেহাতীত রূপে জনৈকা যাত্রী। জীবনের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোর বুঝি এমন সহজেই সমাধান হয়ে যায়!

আমার সিগারেট শেষ হয়ে এসেছিল, এমন সময় এলেন সেই ভদ্রলোক। পরস্পরের চোখ মিলিত হতে দুজনেই মৃদু হাসলাম। ওঁর হাসিতে সহযাত্রিত্বের উষ্ণতা ছিল, আশা করি আমার হাসিতে সমবেদনার শীতলতা ছিল না। দুজনে পথ ধরলাম। শোণপ্রয়াগ থেকে চড়াই পথ শুরু। এ চড়াইয়ের শেষ একেবারে কেদারনাথে। কেদারনাথের দূরত্ব এখান থেকে মাইল নয়েক।

পথক্রমণ এইবারে বেশ কষ্টদায়ক হয়ে উঠতে লাগল। মাথার উপরে সূর্যের তেজ ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠছে, প্রস্তরাকীর্ণ পর্বতপ্রদেশ অধিকতর উত্তপ্ত, অসহ। সূর্যের দুঃসহ কিরণে কোন দিকে চাইবার উপায় নেই, তুষারসীমা ধক ধক করে জ্বলছে, চাইলেই চোখ ধাঁধিয়ে যায়। ওদিকে সকালবেলায় বেশ কনকনে শীত পড়েছিল বলে রাজ্যের যত গরম জামা সব গায়ে চড়িয়েছিলাম; এখন সেগুলো ক্রমাগত দংশন করতে লাগল। কিন্তু নিরুপায়, মাথার হ্যাটটা আরও একটু চেপে বসিয়ে কোনক্রমে চোখ দুটোকে একটু সংরক্ষিত করে, অবনত মস্তকে ঘর্মাক্ত কলেবরে তিক্ত-বিরক্ত মনে পথাতিক্রম করতে থাকলাম। পথ ক্রমাগতই চড়াই।

অবশেষে বেলা বারোটা নাগাদ প্রায়-অথর্ব পা দুটো নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে গৌরীকুণ্ডে পৌছে দেখি, ছড়িদার জিতরাম রান্নাবান্না সেরে স্মিতমুখে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। কুলী দেশীরামও যেন কোথা থেকে একটা শতরঞ্চি ভাড়া করে সেটা চটিতে বিছিয়ে দিয়ে আমাদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে রেখেছে। আমরা গিয়ে বসতেই চা এল। পথের ধারের চটিতে এমন গার্হস্থ্য আপ্যায়ন বোধ হয় একমাত্র গাড়োয়ালেই সম্ভব। এই সরল গাড়োয়ালদের যতই দেখছি ততই বিস্মিত হচ্ছি। এদের বৈশিষ্ট্যগুলো এতই সহজভাবে স্বাভাবিক যে, বলে বোঝান শক্ত। পর্বতের মত এই পার্বত্যদের পরিচয়ও নিজে না জানলে জানা হয় না; একবার জানলে ভোলা যায় না আর।

গৌরীকুণ্ড, ভ্রমণ-কাহিনীর প্রচলিত ভাষায়, বেশ ব্যস্ত জনপদ। চটির বারান্দায় দেহ এলিয়ে বসে আমরা অলস নয়নে যাত্রীদের আনাগোনা দেখতে লাগলাম। চটির কোণে বসে ননী নিজের পায়ে তেল মালিশ করছে আর যেন পাঁচন গিলছে। সুশীল চোখ উলটে চটির মাঝখানে অচেতন হয়ে পড়ে আছে; যেন বিকারের ঘোরে মাঝে মাঝে অস্ফুট কণ্ঠে বলছে—এইবার আমি ঘোড়া নেব; ঘোড়া ছাড়া আমি আর এক পাও এগুতে পারব না। তারাদা গেছেন জিতরামের রান্না সরেজমিনে তদারক করতে; একটু পরেই তিনি এসে ঘোষণা করলেন —আলুর খোসাগুলো ভাজা চড়িয়ে দিলাম। তাঁর চোখে মুখে একটা বিস্ময়কর রকমের তৃপ্তি, চলনে বলনে অবিশ্বাস্য স্বাচ্ছন্দ্য। আর বেচারা নীলমণি? নীলমণি সেই নীলমণিই আছে। সেই হাসি-খুশি চপল-চটুল, স্থূল-অমার্জিত, উদার-অন্তরঙ্গ হাওড়ার নীলমণি। সর্বশেষে আমি,—যেন একটা জিজ্ঞাসা-চিহ্ন, হিমালয়ের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেও কিছুতেই মাথা তুলতে পারছি না। অজানা আনন্দে নিজের অগোচরে হঠাৎ হয়তো কখন বিস্ময়সূচক চিহ্নের মত সোজা দাঁড়িয়ে উঠছি; কিন্তু পর-মুহূর্তেই বেঁকে ধনুষ্টঙ্কার-রোগীর মত আবার সেই প্রশ্নসূচক চিহ্ন!

বিভিন্ন ব্যক্তির উপর পর্বতের এই ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব, ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া একটা রীতিমত গবেষণার যোগ্য বিষয়। যদিও এই বিষয়ে চূড়ান্ত কোন মত প্রকাশের অনুরূপ যথেষ্ট পর্বতাভিজ্ঞতা আমার নেই, তবুও এই নবিশিকালের মধ্যেই কয়কটা জিনিষ লক্ষ্য করতে সমর্থ হয়েছি। উদাহরণস্বরূপ, প্রথমত, আমাদের ননীর কথাই ধরা যাক। দুন-এক্সপ্রেসের কামরায় প্রথম যখন ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় তখন ও হাস্যময় সদা-সপ্রতিভ এক উজ্জ্বল নির্ভরযোগ্য যুবক। অথচ হৃষীকেশ পার হবার পর থেকেই ওর মত অসহায় দ্বিতীয় কোন যাত্রী আমার নজরে পড়েছে বলে স্মরণ হয় না। সর্বদাই ভ্রূ কুঞ্চিত, ওষ্ঠ বিকৃত, দৃষ্টি তিক্ত, কার বিরুদ্ধে যেন ও ক্ষমাহীন একটা অভিযোগ আছে, যা ও এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারছে না—যা ওকে প্রতিপলে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর, সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর করে তুলছে। মেজাজ ওর সর্বক্ষণ তিরিক্ষি হয়ে আছে, হেসে কথা বললে সেটাকে টিটকিরি বলে ভ্রম

করছে ; সহজ কণ্ঠে কথা বললে রেগে উঠছে। যেন সবাই ওর শত্রু ; পথ শত্রু, হিমালয় শত্রু, যাত্রীরা শত্রু, চটিওয়ালা শত্রু, এমন কি নিজের হাত-পাগুলো পর্যন্ত শত্রু। ওর জন্যে রাগও হয়, করুণাও হয়। রাগ হয়, ও মানুষের অনারোগ্য দুর্বলতাগুলোর বিরক্তিকর স্মারক বলে। আর করুণা হয় এই ভেবে যে, বেচারা এত অর্থ ব্যয়, এত কষ্ট স্বীকার করে জীবনে একবারের মত এমন বিরাটের পদপ্রান্তে এসেও এক মুহূর্ত্তের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে পারল না ; কচ্ছপের মত নিজের আবরণের তমসাচ্ছন্নতায় নিজেকে গোপন করে রাখল। অথচ এই ননীকে সমতলে উদার বলেই মনে হয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, ননী আসলে উদারই,—কিন্তু হিমালয়ের উদারতার পাশে তা সঙ্কীর্ণতার চাইতেও সঙ্কীর্ণ। এইটে উপলব্ধি করেই হয়তো এর আঘাতটা ননী সহ্য করতে পারেনি ; নিজের সঙ্কীর্ণ উদারতাটুকুই আঁকড়ে থেকেছে এবং ঠকেছে। এই পরাজয়ের গ্লানি ননী কিছুতেই ভুলতে পারছে না, হিমালয়কে তাই ও কিছুতেই ক্ষমা করতে পারছে না ; ফলে হিমালয়ও ওকে ক্ষমা করছে না। বেচারা ননী !

সুশীলের অবস্থা বরং কথঞ্চিৎ ভাল। প্রতিযোগিতায় নামবার আগেই ও ঠকেছে, এবং ঠকেছে যে তা ও এখনও টের পায় নি। বয়স ওর পঁয়ত্রিশ। দৈহিক আকৃতি, হোঁদল-কুৎকুৎ যদি আপত্তি না করে তবে অনেকটা তার মত বলা যায়। ওর মন এবং প্রাণ বলে যদি কোনকালে কিছু থেকেও থাকত, আজ তবে তা ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়। রাগ নেই, আনন্দ নেই, বিস্ময় নেই, হতাশা নেই, উত্তেজনা নেই, নিস্পৃহতাও নেই ; শুধু টিপ টিপ নস্যি টানছে, রীতি অনুযায়ী কুলিকে ধমকাচ্ছে, আর অনুক্ষণ ক্লান্তি বোধ করছে। ব্যাস্, নাগরিক সভ্যতার ষ্টীম-রোলারে নিষ্পেষিত সুশীল এখানে বিশল্যকরণীর খোঁজে এসেছিল কি না জানি নে, তবে তা যে পায় নি তা জানি।

নীলমণি হচ্ছে ননী ও সুশীলের সম্পূর্ণ বিপরীত। হিমালয় ওকে কতটা প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছে তা বলা শক্ত, তবে হতোদ্যম করে নি, ভীতসন্ত্রস্ত করে নি। শশকের মত লাফিয়ে লাফিয়ে ও সর্বদা সকলের আগে এগিয়ে চলেছে, চা-ওয়ালাকে তার স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করছে, ক্ষেতে কর্মরতা পর্বতরমণীর সঙ্গে ঠাট্টা করে তাকে হাসাচ্ছে,

নেচেকুঁদে মুখ বিকৃত করে পর্বতশিশুদের আমোদিত করছে, সহযাত্রীদের বিবাদে সালিশী মানছে। ও সর্বদাই সবখানে আছে—ক্লান্ত হয়ে হাত বাড়াও সহযোগিতা পাবে, উৎসাহে এগিয়ে চল সাহচর্য পাবে। অথচ হরিদ্বারে যখন ওকে প্রথম ধরে আনা হল তখন ওর সহযাত্রীত্বের আতঙ্কে আমিই সব-চাইতে বেশী উৎকণ্ঠিত হয়েছিলাম। যদি কেদারনাথের উচ্চতায় উঠে শহরের ডাস্টবিন থেকে কুড়নো একটা অশ্লীল গল্প ফেঁদে বসে তবে? কিন্তু এখন দেখছি কেমন করে যেন হিমালয় ওকে চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে, অথচ পূর্বের নীলমণিও আদৌ মরে নি। এইটে কি করে সম্ভব হল? কিন্তু সত্যিই সম্ভব হয়েছে। মনুষ্য-চরিত্র এক বিস্ময়, হিমালয় আর,—এককভাবেই এদের কারও রহস্য ভেদ করা শক্ত; এই যুগ্ম-রহস্যের ঠাঁই পাব কোথায়? এই অক্ষমতার জন্য সংকোচ বোধ করাও সঙ্কীর্ণতা।

অপর দিকে তারাদা যেন পরমহংস। সর্বদাই এক হাত উপরে মাথা তুলে স্বচ্ছন্দে এগিয়ে চলেছেন। মাঝে মাঝে করুণা করে হিমালয়ের সৌন্দর্যের দিকে চাইছেন বটে, আবেগাতিশয্যে প্রায়শই বাংলা-সংস্কৃত-হিন্দী-আরবী কবিতাও আওড়াচ্ছেন, কিন্তু তবু এখনও পর্যন্ত একবারও হিমালয়ের সঙ্গে তারাদাকে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে হয় নি। হিমালয় ওঁকে মুহূর্তের জন্যও সমাহিত, হতবাক্ করে নি। উনিই যেন হিমালয়কে নিজের অঙ্গাভরণ করে নিয়েছেন। ঝগড়া, মন-কষাকষি, রূঢ়তা—এই সবই এখনও ওঁর আচরণে প্রকট হয়ে আছে, অথচ প্রতি পর-মুহূর্তেই হিমালয় আর হিমালয়সন্তানদের দেখে উনি বিস্মিত এবং আনন্দিত হচ্ছেন এবং এ দুয়ের একটিও অনান্তরিক বা অগভীর নয়। উত্তম ও অধমের, ঔদার্য ও সঙ্কীর্ণতার, সত্ত্ব ও তম গুণের এমন অন্তরঙ্গ অঙ্গাঙ্গি-ভাব যে সম্ভব তা বিশ্বাস করতে হলে হিমালয়ের পটভূমিতে আমাদের তারাদাকে দেখতে হয়।

আর সর্বশেষে আমি? আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি, আর বসে বসে অসার হাঁটু দুটোয় নীলমণির দেয়া তার্পিন তেল মালিশ করছি। চমৎকার লাগছে, পায়ের ব্যথাটাই যেন উপভোগ্য। দেহের ক্লান্তি স্মৃতি থেকেও মুছে গেছে; সূর্যের প্রখর কিরণ আর অভিশাপ নয়, যেন আশীর্বাদ, কিন্তু তা সত্ত্বেও শীতে মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছি। একটু

পরে কাঁধে গামছা ফেলে গৌরীকুণ্ডের প্রধান আকর্ষণ উষ্ণকুণ্ডের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

হিমশীতল মন্দাকিনীধারার পাশেই উষ্ণ প্রস্রবণ ; প্রাপ্য না হলেও ঈশ্বরকে একবার ধন্যবাদ জানানো প্রয়োজন। প্রস্রবণের বাঁধানো বেদীতে স্নানার্থীদের ভিড় ; কুণ্ডের জল থেকে ক্রমাগত ধোঁয়া উঠছে। কুণ্ডে নেমে স্নান করা এক দুরূহ ব্যাপার, যাত্রীরা অধিকাংশই তাই কেউ ঘটি করে জল তুলে, কেউ বা গামছা ভিজিয়ে গায়ে সেঁক দিচ্ছে, স্নান সারছে। আমি একবার ঝপাৎ করে লাফ দিয়েই তড়াক করে উঠে পড়লাম। অথচ অনেকে, সবাই প্রায় বয়স্ক, ওই কুণ্ডে দাঁড়িয়ে সূর্যপূজা করছে। একমাত্র বিশ্বাস ছাড়া তাদের দেহে অন্য কোন আবরণ আমার চোখে পড়ল না।

অবগাহন বরাতে লেখা নেই বুঝে অগত্যা একটু দূরে বসে আপন অবিশ্বাসের শীতে কাঁপতে কাঁপতে স্নানার্থীদের পুণ্যার্জন ঈর্ষামুক্ত দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম। আমার কপালটাই কেবল দেখার, অংশ গ্রহণ করার নয়। তা হোক, তবু দেখার বিস্ময়টুকু যে আমাকে এখনও ত্যাগ করে নি তা নিয়েই আমি কৃতজ্ঞ। যাত্রীরা আসছে, পূজো দিচ্ছে, সূর্যস্তব আওড়াচ্ছে, তারপর ডুব দিয়ে চলে যাচ্ছে। একান্তই সাধারণ ঘটনা। অথচ ওই দেখতে দেখতেই আমার আর বিস্ময়ের অন্ত রইল না। এর আগেও যদিও বিষয়টা আমার নজরে পড়েছিল, কিন্তু এখন নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলাম যে হিমাচল অঞ্চলটার অবস্থিতি ঠিক দেবলোক-স্বর্গলোকে না হলেও মর্ত্যলোকে নয়। কথাটা সব তীর্থ সম্পর্কে অল্পবিস্তর সত্য হলেও এই হিমলোকে মানুষ যতটা বাহ্যাড়ম্বরমুক্ত আপন প্রকৃতি ফিরে পায় তেমন বোধ হয় আর অন্য কোথাও নয়। এখানে মানুষ লজ্জায় সঙ্কুচিত বা ভয়ে সন্ত্রস্ত হয় না ; এখানে মানুষ যখন নির্দয় তখন সেই নির্দয়তা যেমন নগ্ন, তেমনই তার সদয়তাও কপটবিনয়বর্জিত। ক্ষুধা ব্যতিরেকে লোভের, তৃষ্ণা ব্যতিরেকে কামের এখানে অস্তিত্ব নেই। মানুষ এখানে বড়বাবুও নয় ভৃত্যও নয়, পিতাও নয় পুত্রও নয়, নেহাতই মানুষ। লজ্জা-ভয়ের অবকাশ এখানে নেই। যাত্রীরা আপন মনে স্নান করছে, যাত্রীদের মধ্যে নারীও আছে এবং সকলেরই বস্ত্র সুবিন্যস্ত নেই, অথচ তারই পাশে আমি নিঃসঙ্কোচে বসে আছি, যেন এইটেই স্বাভাবিক।

দলের সবাই আগে থেকে স্নান সেরে এসে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি চটিতে পদার্পণ মাত্র সবাই উঠে দাঁড়াল। আহারান্তে তারাদা বললেন, চলুন, এইবার মন্দির দেখে আসা যাক। স্থানীয় মন্দিরটি কেদারনাথের চাইতে অর্বাচীন মন্দির নয়। শুধু ভক্তিতাত্ত্বিক বা কাস্তুতাত্ত্বিক নয়, এর ঐতিহাসিক মূল্যও অপরিমিত। জানেন তো—

আমার তখন আর কিছু জানবার কৌতূহল ছিল না। হাঁটুতে হাত দিয়ে বললাম, আপনারাই না হয় মন্দির দেখে আসুন তারাদা। আমি একটু বিশ্রাম নিই, আর হাঁটুর পরিচর্যা করি। আমি বড় ক্লান্ত।

পিতার নিকট আমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে তারাদা সদলবলে বেরিয়ে গেলেন। শতরঞ্চির উপর অবসন্ন দেহ এলিয়ে, একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি ভাবতে লাগলাম, এই সব মন্দির বিগ্রহ ইত্যাদি যদি আমার লক্ষ্য নয়, তবে কেন এই পথে এত কষ্ট স্বীকার করতে এলাম? এই সকলের প্রতি আমার এমন অনুশোচনামুক্ত অনীহারই বা কারণ কী? ঈপ্সিত ভারতাত্মা যে এই সব মন্দিরে বিগ্রহে নেই, এমন ধারণা আমার হল কেমন করে? সমান অর্থব্যয় এবং স্বল্পতর কষ্টস্বীকার করে আমি তো মর্ত্যের অমরাবতী কাশ্মীরও দেখে আসতে পারতাম, অথচ রওনা হবার আগে থেকে আজ পর্যন্ত কেন ওই পথের কথা আমার একবার মনেও পড়ল না এবং এই মুহূর্তেও কেন এই পথে এসেছি বলে অনুশোচনা হচ্ছে না? আশ্চর্য, কিন্তু সত্য। নিজের অচেতনে কখন তুষ্ট মনে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম।

আজ বিকেলে আমাদের খুব বেশী হাঁটবার পরিকল্পনা ছিল না, অতএব বেশ বেলা পর্যন্ত চটিতে গড়িয়ে অবশেষে পাঁচটা নাগাদ ধীরে ধীরে আবার পথ ধরলাম। গৌরীকুণ্ড থেকে সাড়ে তিন মাইল দূরে রামওয়াড়া চটিতে আজ রাত্রিযাপন করব স্থির হয়েছে। আর মাত্র মাইল তিনেক হেঁটে সোজা কেদারনাথেই আজ চলে যাওয়া যেত, আমার ও নীলমণির অভিমতও ছিল তাই। কিন্তু তারাদা যখন বললেন, দেখুন, সন্ধ্যের পর সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেলে, চোরের মত গিয়ে কেদারনাথে প্রবেশ করা ঠিক ভাল দেখায় না। তার চাইতে

রামওয়াড়ায় রাতটুকু কাটিয়ে, কাল সকালে নৈবেদ্যের থালা হাতে নিয়ে, সোজা কেদারনাথের রাজসভায় গিয়ে ঢুকব। ভৈরবী সকালে গাওয়া ভাল। তখন সবাই বিনাপ্রতিবাদে তারাদার প্রস্তাবে সায় দিল।

সাড়ে তিন মাইল পথ, পুরোটাই চড়াই। তা হোক, তাড়া নেই, তা ছাড়া পর্বতের ছায়া আছে, ঘন সবুজ অরণ্যানী আছে, অজানা পাখীর কাকলী আছে, পার্বত্য ফুলের বৈচিত্র্য আছে, আর সবার উপরে আছে তুষারশিখর। রওনা হবার পরে কখন দেখি নিজের অজ্ঞাতেই রামওয়াড়া চটিতে পৌঁছে গেছি। পৌঁছতেই নীলমণি নিকটস্থ চায়ের দোকানটি থেকে বেরিয়ে এসে বলল, কী খবর?

সম্পূর্ণ সুস্থ। সন্ধ্যার আগে অনায়াসে এভারেস্টের চূড়োয় উঠে যেতে পারতাম।

আমিও তাই; অথচ তারাদার হুকুম, আজ রাত্রি এখানেই কাটাতে হবে। এত কাছে এসে, এখন কি আর মন মানে, বলুন তো?

হুকুম না মানলেই হয়, আপনি তো আর তারাদার পোষ্য নন।

যাবেন আপনি? তো চলুন, ওরা আসবার আগেই আমরা বেরিয়ে পড়ি; দেখি ওরা কী করে এখানে থাকে?

এইবার আমি ইতস্তত করতে লাগলাম। যাব? কিন্তু আমি যে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত। এতদিন ধরে কেদারনাথের উদ্দেশ্যেই হাঁটছি বটে, কিন্তু একদিন যে কেদারনাথ গিয়ে পৌঁছতেই হবে সে কথা তো ভাবি নি কোনদিন। কী নিয়ে যাব?—আমার ভক্তি নেই বিশ্বাস নেই, বিরাগ নেই বিদ্বেষ নেই, সংশয় নেই সন্দেহও নেই।—তবে কেন যাব? আমার দেবার কিছু নেই, চাইবারই বা আছে কী?

কী হল? যাবেন তো চলুন। ওরা এসে পড়লে কিন্তু আর যাওয়া হবে না।

তা হলে আজ আর যাব না। চলুন, আগে এক গেলাস চা তো পান করা যাক।

নীলমণি একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। আমি শ্বাসরুদ্ধ করে আমার সমস্যাটার কথা ভাবতে লাগলাম। ফিরে যাবার কথা এখন চিন্তা করাই বাতুলতা। অথচ এগিয়ে চলা অধিকতর ভীতিপ্রদ। তবে? চতুর্দিকের

পাহাড়-পর্বতগুলো নিস্পলক দৃষ্টিতে নির্বাক তাকিয়ে রইল,—চটিওয়ালার চায়ের জল ফুটে উঠল, একে একে যাত্রীরা এসে পৌঁছতে চটি মুখর ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কিন্তু আমার কী কর্তব্য ?

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল; অদূরের তুষারশিখর স্বপ্নিল হয়ে উঠল; যাত্রীদের আনাগোনা কমল; চটি নীরব হয়ে শীতে কাঁপতে লাগল। আমি কী করি ?

আপনি এখানে বসে কী করছেন ?

আগুন পোয়াচ্ছি।

আঃ, চমৎকার জায়গাটি পেয়েছেন তো মশাই, দেখি-দেখি একটু। আঃ!—আমার গা ঘেঁষে বসে তারাদা আগুনে হাত সেঁকতে শুরু করলেন—কী ব্যাপার, আপনাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে ?

আপনাকে কিন্তু বড় বেশী চিন্তামুক্ত মনে হচ্ছে।

হাঃ-হাঃ! এখানে এসেও যদি চিন্তাই করব, তবে আর এখানে আসব কেন ? এখন যার চিন্তা করবার সে করুক। আঃ, দেওজী, একঠো চা দেও। আপনারও চলবে নাকি ?

চলুক।

ইতিমধ্যে হিমালয়ের গায়ে অন্ধকারের কম্বল চাপা পড়েছে; সমস্ত চটি নিথর। একটু পরে সেই নিথরতা ভেদ করে চটির অপর প্রান্ত থেকে একটি গানের সুর ভেসে এল। সুরেলা মহিলাকণ্ঠ, স্পষ্টতই সেই বাঈজীর। প্রথমে বিলম্বিত লয়ে আলাপ শুরু হল।

গান এর আগেও অনেক শুনেছি, এবং এঁর চাইতে বিখ্যাত গাইয়ের কণ্ঠেই শুনেছি। কিন্তু এর আগে গান কখনও এমন ভাবে মনের রুদ্ধ দুয়ার খুলে দেয় নি। মিনিট পনেরো আলাপ শুনবার পরেই কোথায় গেল আমার চিন্তা আর কোথায় গেল আমার ভাবনা! স্তরে স্তরে গান উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠছে, আর একের পর এক গ্রন্থি খুলে যাচ্ছে,—চারিদিকে আলোর উৎসব পড়ে গেল যেন!

চলুন তারাদা, এমন গান শুধু শোনবার নয়, দেখবারও।

গুনটা শুধু গানের নয়, স্থানেরও।

চটির সামনে গিয়ে দেখি, জনা দশেক শ্রোতার মাঝে বসে বাঈজী শুধু গলায় চোখ বুজে গান গাইছেন। তারাদা বললেন, এই

গানটা শেষ হোক, তারপরে ঢুকব। কারুর পূজায় ব্যাঘাত ঘটাতে নেই।

বাইরে দাঁড়িয়ে গান শুনতে শুনতে আবার তন্ময় হয়ে গেলাম। আর, আমি কিনা ছাই, এতক্ষণ ভেবে মরছিলাম যে, কেদারনাথ কেন যাব!

গান শেষ হতে অবশেষে ভিতরে ঢুকে দেখি, শ্রোতাদের মধ্যে আমাদের ননীবাবুও আছে। আমরা গিয়ে তার পাশে বসতেই সে হঠাৎ যেন চমকে উঠে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, সন্ত্রস্ত চোখে নির্বোধের মত আমাদের দিকে তাকিয়ে যেন হাসবারও চেষ্টা করল একটু। কিন্তু ততক্ষণে বাঈজী ভজন ধরেছেন। কিছুক্ষণ পরে ননীর দৃষ্টি অনুসরণ করে বুঝলাম, ও কেন হঠাৎ আমাদের দেখে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল। ওর দৃষ্টির লক্ষ্য ছিল কর্ণেল-কন্যা। কিন্তু তবু কণামাত্র বিস্মিত বা বিমর্ষ হলাম না।

আরও অনেকগুলো গান হল। ক্রমশ রাত বারতে থাকায় যাত্রীরা একে একে বিদায় নিতে লাগলেন। কিন্তু বাঈজী অপরের জন্য গাইছিলেন না, তিনি গেয়েই চললেন। আমরা যখন উঠলাম, তখন বাঈজীর সামনে একজন মাত্র শ্রোতা বসে রইল; তিনি কর্ণেল-পত্নীর পারলৌকিক অভিভাবক সাধুবাবা। ক্লান্ত দেহে শয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়তেই নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন আমি সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। দেহই শুধু ক্লান্তিহীন নয়, মনও সজীব এবং প্রত্যাশী। শীতে কাঁপতে কাঁপতে এবং অকারণে হাসতে হাসতে পোশাক পরে, এক গেলাস চা গিলে, তাড়াতাড়ি পথে বেরিয়ে পড়লাম। তুষারশিখরে প্রতিফলিত সূর্যের আলোয় পথ ঝকঝক করছে, মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। হন হন করে আমরা এগিয়ে চলেছি লাইন বেঁধে। আজ আর কারও ধৈর্য মানছে না।

এমন সময় অকস্মাৎ পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরতেই দেখি, সামনে অদূরে—। পশ্চাতের যাত্রীরাও তৎক্ষণাৎ ধ্বনি তুলল—জয় কেদারনাথ!

আট

মনে হয়, কেদারনাথ মন্দিরের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা নিয়েই প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই ঐতিহাসিক বিপর্যয়টা ঘটেছিল যার ত্রিকালজয়ী সাক্ষ্য এই হিমাচল। তিন মাইলের উপর ক্রমাগত চড়াই ভাঙবার পর পাহাড়ের একটি বাঁক ঘুরতেই সামনে যখন দেখলাম সাক্ষাৎ কেদারনাথ, তখন মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালাম; কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ নির্বোধের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। সত্যিই কেদারনাথের দরজায় এসে পৌঁছে গেছি! কথাটা বিশ্বাস করতে কিছুটা সময় লাগল; এবং তারপরেও কথাটা পুরোপুরি বিশ্বাস হল না।

সোজা ফার্লং দুয়েক পাথর-বাঁধানো পথ। পথের দক্ষিণ ধার দিয়ে রজতধারা মন্দাকিনী খরবেগে প্রবাহমানা। দুই ধারের গিরিশ্রেণীর শীর্ষদেশ তুষারাবৃত। সামনে গগনচুম্বী তুষারশিখরের পটভূমিতে শিবের সমাহিত উজ্জ্বল তৃতীয় নেত্রের মত কেদারনাথের শান্ত সৌম্য সহজ অলঙ্কারহীন মন্দির। ভয়ে নয়, সঙ্কোচে নয়, শ্রদ্ধায় কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়ালাম; চোখের সামনে যা দেখছি, চেতনার গভীরতায় তা গ্রহণ করবার চেষ্টা করলাম।

আজ আর মনে কোন ক্ষোভ নেই, কোন অনুশোচনা নেই। কিন্তু তবু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, সেদিন আচম্বিতে যে নৈসর্গিক দৃশ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিলাম তার পুরোটা দেখবার ক্ষমতা আমার দৃষ্টির ছিল না, আর যতটুকু উপলব্ধি করেছিলাম তা একান্তই নগণ্য। যদিও সেইটুকুতেই আমার ভীরু বাসনার

ছোট্ট অঞ্জলি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। ঐশ্বর্যের দোরগোড়ায় পৌঁছেও যে দীনতা ঘুচল না, ভেবে দেখেছি, সেই জন্যে দায়ী আমার শিক্ষা। আজন্ম ইংরেজী এম্পিরিসিস্ট আবহাওয়ায় লালিতপালিত হয়ে আমাদের চিত্তের দীনতা আজ এমনই সীমাহীন হয়েছে যে, যা-কিছু বাক্যাতীত অনির্বচনীয় তা-ই আমাদের বোধের বাইরে থেকে যায়, অনেক সময় দৃষ্টিরও। কথা দিয়ে বাঁধতে না পারলে, দুয়ে দুয়ে চারের নিয়মে গাঁথতে না পারলে, রসনায় আস্বাদ না পেলে আমরা কোন কিছুর অস্তিত্বই স্বীকার করি না। কিন্তু দু ফার্লং দূর থেকে কেদারনাথের দিকে চাইলে নিজের অক্ষমতা স্বীকার করতেই হয়—যেমন স্বীকার করতে হয় অন্যতর কিছুর শুদ্ধতর কারুর অবিসম্বাদী অস্তিত্ব।

লিখতে বসেছি ভ্রমণ-কাহিনী। আর ভ্রমণ-কাহিনী মাত্রেরই প্রথম এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হচ্ছে, আলোচ্য দেশ-ভ্রমণের সুযোগ যে পাঠকের আজও হয় নি তাঁর চোখের সামনে সেই দেশের রূপরেখা বাক্যের ছবিতে উপস্থিত করা, তাঁর মনে সেই দেশের আত্মার স্পর্শ লাগানো, সেই দেশের সৌন্দর্যে তাঁকে মুগ্ধ করা। অবশ্যই এমন দেশ এবং দৃশ্য এই জগতেই আছে শুধু বাক্যে যার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়। বাক্যের মূর্ছনা, সঙ্গীতের মীড় তুলির বলিষ্ঠতার যুগপৎ প্রয়োগে যার পূর্ণাকৃতি দর্শকের সম্মুখে সমুপস্থাপিত করতে হয়। এমন দেশের ভ্রমণ-কাহিনী লেখাই হয় না। যেমন কেদারনাথের ভ্রমণবৃত্তান্ত আজ পর্যন্ত লিখিত হয় নি, এবং হবার সম্ভাবনাও অকিঞ্চিৎকর।

কিন্তু আগেই বলেছি যে, কেদারনাথের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি আমি আপন অক্ষমতায় আজও গ্রহণই করতে পারি নি। তবে সাক্ষাৎ ব্যর্থতা সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করতে পারব না যে, কেদারনাথের যতটুকু সৌন্দর্য আমার নয়নগোচর হয়েছে, যে কটি কথা আমার কর্ণগোচর হয়েছে, এবং যেটুকু স্পর্শে আমার মন শিহরিত হয়েছে যত্নে কৃতে তা ভাষায় গ্রন্থন করা সম্ভব, এমন কি বঙ্গভাষায়ও। কিন্তু হায়, কালদোষে বঙ্গভাষাও আজ আমার সম্পূর্ণ অনধিগত, স্বীকৃতিটা হয়তো পাঠকের কাছে কিঞ্চিৎ আকস্মিক মনে হবে, অতএব একটু আগে থেকে বলি।

বিশুদ্ধ বস্তুর বৃত্তান্ত কেবল মাত্র বিশুদ্ধ ভাষাতেই লিপিবদ্ধ করা সম্ভব। ভাষা ও বস্তুর যোগাযোগ অবিচ্ছেদ্য; ভাষা যদি বিকৃত হয় তবে বস্তুর বিশুদ্ধতা সে ভাষায় কখনই ধরা দেবে না, আর লেখকের দৃষ্টির দোষে বস্তুর বিশুদ্ধতা যদি তার নজর এড়িয়ে যায় তবে তার ভাষার বিশুদ্ধতাও ব্যাহত হতে বাধ্য। এই অচলাবস্থা থেকে আর একটু এগোলে দেখা যাবে যে, ভাষার বিকৃতির কারণে জগতের কোন-কিছুরই বিশুদ্ধতা আর সেই ভাষাব্যবহারকারীর নজরে পড়ছে না। কিংবা যদি বা কখনও অকস্মাৎ কিছু পড়ছে, তবে দর্শকের সেই দেখা একমাত্র দর্শকের সম্পত্তি হয়ে থাকছে, তার ভাষার আর তখন এমন ক্ষমতা নাই যে সেই ব্যক্তিগত দর্শনকে সার্বজনীন করে নিজেকেও পুষ্টতর করে নেয়। স্বাদেশিকতা সত্ত্বেও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, বঙ্গভাষা আজ এমনই অধঃপতিত ভাষাসমূহের অন্যতম। কৃত্রিমতাদুষ্ট বঙ্গভাষার আজ এমনই দীনাবস্থা যে, বিশুদ্ধ বা বলিষ্ঠ কোন ভাববহনের ক্ষমতাই এর নেই, এ ভাষায় আজ কেবল মাছের দর জিজ্ঞাসা করা যায়, কিংবা বড় জোর প্রেম নিবেদন করা চলে। অথচ কেদারনাথের মূল কথাই হচ্ছে বিশুদ্ধতা আর বলিষ্ঠতা। বঙ্গভাষার এই অধোগমন কার প্রশ্রয়ে কবে থেকে শুরু হয়েছে সে গবেষণা এই প্রসঙ্গে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হবে, কিন্তু আজ যখন কেদারনাথ-ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখতে বসে স্বয়ং কেদারনাথকেই সেই বৃত্তান্ত থেকে নির্বাসিত করতে বাধ্য হচ্ছি তখন একটা দীর্ঘশ্বাস যত বে-আইনীই হোক, অক্ষমনীয় অপরাধ নয়। তবু ভাল যে সেই ভাষা আমি ভুলেছি, নয়তো এই বৃত্তান্তের পুরোটাই অলিখিত থাকত! সে যাই হোক, যা সমস্ত জীবন ধরে সম্পূর্ণ অভাবিত ছিল, যা প্রত্যাশা করবার ঔদ্ধত্যটুকুও কোনকালে সঞ্চয় করে উঠতে পারি নি, যার কথা কোনদিন কাউকে বলে বোঝাতে পারব না কিন্তু তৎসত্ত্বেও যার স্মৃতি এর পর থেকে প্রতিদিন আমার দৈনন্দিন জীবনের সঞ্চিত ক্লেদ মুছিয়ে দেবে, যার বিশুদ্ধতায় আমার বিকৃতি সংযত হবে—অকস্মাৎ অনস্বীকার্যরূপে অপ্রত্যাশিত সেই কেদারনাথের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত কিছুক্ষণ নিথর হয়ে রইলাম।

কী হল, বিষম লাগল বুঝি?

উহুঁ, সামলে নিয়েছি।

নীলমণি যে কখন এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়েছিল খেয়ালই করি নি। কিন্তু আমরা যেই আবার যাত্রা শুরু করতে যাব অমনি কর্নেল-পত্নীর সেই গুরুজী আমাদের গা ঘেঁষে, প্রায় ধাক্কা মেরে, পাশ কাটিয়ে হনহন করে এগিয়ে গেলেন। যেন আপিসের বেলা হয়ে গেছে, যেন পেছন থেকে বাঘের দল তাড়া করেছে! অবশ্য কবে যেন একদিন তিনি কার কাছে বলেছিলেন যে, তিনি শুধু কেদারনাথ দেখতে আসেন নি। কিন্তু তাই বলে—! তবে আমাদের পরিপার্শ্বে বিস্মিত হবার মত আরও অনেক কিছু ছিল। সাধুজী পেরিয়ে যেতেই আমরা ওঁকে বিস্মৃত হলাম।

পাথর-বাঁধানো সোজা পায়ে-হাঁটা পথ। পথের মাঝে আশেপাশে বৃষ্টির জল জমে আছে—জলের উপর বরফের অচ্ছোদ সর। অনতিদূরে পথের ডান দিক দিয়ে মন্দাকিনী বয়ে চলেছে। কোনক্রমে পাণ্ডাতনয়দের এড়িয়ে, সঙ্কীর্ণ একটি ঝুলা পেরিয়ে আমরা অবশেষে কেদারনাথে পৌছলাম।

সকাল তখন আটটা। চায়ের দোকানগুলোর উনুনের আগুন ঘিরে কুলি ও যাত্রীর দল মৌচাকের মত জমে বসে আছে। পণ্য সাজিয়ে কোন কোন দোকানদার যাত্রীর অপেক্ষায় ধ্যানমগ্ন হয়ে গেছে। কেউ কেউ এতক্ষণে রোদ উঠল দেখে ঝাঁপ তুলছে, বা মন্দির-চত্বরে পণ্যের ঝাঁপি খুলছে। কিন্তু এ সকলই বাহ্য, পরে সময় হলে এ সব দেখা যাবে। যাঁকে দেখতে এতদূর আসা তাঁকে আগে দেখা প্রয়োজন। জুতো-টুপি খুলে রেখে, সিঁড়ি বেয়ে আমি আর নীলমণি দ্রুত মন্দিরে উঠে গেলাম।

মন্দিরদ্বারের ঠিক সামনে বলিষ্ঠগঠন এক নাতিক্ষুদ্র বৃষমূর্তি। দরজার ডাইনে সুন্দর একটি গণেশমূর্তি সিন্দুরে চন্দনে সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেছে। মন্দিরে প্রবেশের আগে প্রথমে এখানে পূজো দিয়ে নিতে হয়। একজন পাণ্ডা গাঢ়োয়ালী উচ্চারণে বিশুদ্ধ সংস্কৃত মন্ত্রে অনবরত সেখানে পূজো দেওয়াচ্ছে। আমি ও নীলমণি ওদের অতিক্রম করে আরও ভিতরে ঢুকে গেলাম। ইতিমধ্যে আমাদের পায়ের পাতা সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে

গেছে, হাত জমে গেছে, বুকে খিল ধরেছে। মন্দিরাভ্যন্তরে ঢুকতে সমগ্র চেতনাটুকু শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। অথর্ব ভাবলেশহীন চোখে দেখলাম, প্রায়ান্ধকার কক্ষে প্রদীপের স্বল্প আলোকে বিশেষ কোন আকারহীন একটি প্রস্তরশীলা ঘিরে পূজারীরা বসে আছে। প্রস্তরটির এক কোণে প্রদীপ জেলে পুরোহিত পূজো গ্রহণ করছে, তারপর পূজারী নৈবেদ্যের থালা থেকে কী নিয়ে প্রস্তরটির অঙ্গে মাখিয়ে দিচ্ছে। প্রস্তরটির বর্ণ কালো, এবং ছুঁয়ে দেখলাম গঠন সম্পূর্ণ গঠনহীন। সিক্ত প্রস্তরটিতে হাত দিতে মনে হল হাতে শত বৃশ্চিক যুগপৎ দংশন করল—এত ঠাণ্ডা! মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ির কোণের রোদটুকুতে আমরা নীরবে বসলাম। তখনও হিসেব মেলাবার মত অবস্থা আমাদের নয়।

কিন্তু সেই সামান্য অজুহাতে কেদারনাথ মন্দিরের আকারহীন বিগ্রহটির কথা বিস্মৃত হওয়া সম্ভব ছিল না। একটা অনির্দেশ্য অস্বস্তিতে মনের ভিতরটা কেমন যেন খচ্‌খচ্‌ করতে থাকল। আকারহীন বৈশিষ্ট্যহীন একটি প্রস্তরখণ্ড মাত্র,—সৌন্দর্য নেই সুষমা নেই, এমন কি একটু মসৃনও নয়,—অকিঞ্চিৎকর নগন্য এক টুকরো পাথর! আর তা-ই দর্শন করবার মানসে কি-না যুগ-যুগান্ত ধরে অগনিত যাত্রী এই ভয়াবহ দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করে আসছে। এই ধরনের কিম্বা এর চাইতেও সুন্দর, বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, ব্যঞ্জনাময় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি প্রস্তর যে এইখানে পৌছবার অনেক আগেই অতিক্রম করেছি, অনায়াসে পথিপার্শ্বে অবজ্ঞাভরে ছেড়ে এসেছি! এই কেদারনাথ!—জন্মাবধি প্রত্যেক হিন্দুর যা ঐকান্তিক লক্ষ্য? —অবস্থাটির গুরুত্ব অনুধাবনের চেষ্টা করতে সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি হয়ে পড়লাম। কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না যে প্রবঞ্চিত হয়েছি কিম্বা পুরস্কৃত!

একবার মনে হল যে, পুরোটাই হয়তো একটা প্রকাণ্ড বিদ্রূপ, —শেষ পর্যন্ত এই কেদারনাথে যা বিস্ফারিত! গ্রাণ্ড ইনকুইজিটর বুঝি অবশেষে যবনিকা উত্তোলন করলেন। যেন প্রতি যাত্রীর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে, যেই মূঢ় বিশ্বাসে নিরীহ দুর্বল শোক-সন্তপ্ত মনুষ্য সমাজ নিজেকে নিরন্তর ভুলিয়ে রাখে তার

ভিত্তি এর চাইতে দৃঢ়তর নয়, তার মধ্যে অধিকতর সত্য কিছু নেই। শেষ বিচারে একটা নিছক প্রস্তরখণ্ড মাত্র; নীরস এবং নির্বিশেষ! এই প্রস্তরখণ্ডে যদি সামান্যতম মাহাত্ম্যও থেকে থাকে তাহলে কলকাতার কাণা-গলির পুরানো বাড়িটির ভাঙা ইঁটটিও মহৎ। এমন নিষ্ঠুর বিদ্রূপ—এমন নিরর্থক অস্ত্রোপচার—বুঝি এক কোন দৈত্যকার বার্ণার্ড শ'র পক্ষেই বিস্ফারিত করা সম্ভব! ভান করছিলাম যেন শীতেই ক্লিষ্ট। কিন্তু আসলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে জড়ভরতের মতো বসে রইলাম। কেদারনাথ মন্দিরের প্রাঙ্গনে, উষ্ণ রৌদ্রকিরণে, হিমেল হাওয়ায়।

দূর থেকে বহুদূর পর্যন্ত পর্বতের বক্রগতি পথ চোখে পড়ছিল। কিছুক্ষণ মাত্র আগে এই দুর্গম পথ অতিক্রম করে আসবার সময় মনে কত আশা ছিল, কত অধৈর্য ব্যগ্রতা। কী-ই জানি পাব যা'র পরে আর কোন বিকৃতি থাকবে না, নবজন্ম ঘটবে! বুঝি বা জানতে পারব কেন যুগে যুগে গৃহী গৃহত্যাগী হয়েছে, রাজা বারে বারে করেছে রাজ্যত্যাগ, সাধক কেন অরণ্য পর্বতে ঘুরে বেরিয়েছে দিনের পর দিন জন্ম থেকে জন্মান্তর। আরও কত কি আশা করেছিলাম এখন আর সে-সব স্মরণ করতেও সাহস হল না। চুপ করে বসে রইলাম। চোখ বুজে একবার ভেবে দেখতে চেষ্টা করলাম প্রস্তরটার কোথাও কোন একটু বৈশিষ্ট্য ছিল কি না। রমণীয়তা না হোক রূঢ়তা, ব্যঞ্জনা না হোক নির্বিকল্পতা,—কোনও একটু বৈশিষ্ট্য, যা-তে করে অপরাপর প্রস্তরখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু অন্যান্য থেকে ভিন্ন করবার ক্ষীণতম সূত্রও চোখে পড়ল না,—যেই প্রস্তরখণ্ড হুবহু সেই প্রস্তরখণ্ড,—যেমনি নির্বাক তেমনি অথর্ব।

তাহলে যুগাতিযুগ ধরে অত ঘটা করে এই কেদারনাথে আসবার এমন কি তাড়া ছিল? শ্যামবাজারে যে জিনিষ আখচার পাওয়া যায় সে-জিনিষের খোঁজে কেন তাহলে মুক্তকচ্ছ হয়ে শ্যামনগরে ধাওয়া করা! এতকালের প্রবঞ্চনাটা কেবল হাতে নাতে উদ্ঘাটিত করা গেছে। কেবল জানা গেছে যে মানুষ মাত্রেই মূঢ়—প্রতিদ্বন্দ্বিতার পূর্বেই সে পরাস্ত।—আর হয়তো নিঃসংশয় হওয়া

গেছে যে এই প্রবঞ্চনার কোন নিরসন নেই, এই মূঢ়তার কোন নিরাময় নেই, এই পরাজয়ের কোন সান্ত্বনা নেই। ঐতিহাসিক কেদার-যাত্রার ওইটুকুই নীট লাভ। এই দুর্গম পথাতিক্রমণের অন্তিম প্রবঞ্চনা বা চূড়ান্ত পুরস্কার ঐ মোহভঙ্গ। এর পরে আর অনুমান করতে অসুবিধে হয় না যে এককালে কেন যাত্রী কেদারনাথ দর্শনের পর আবার গ্রার্হস্থ্যাশ্রমে ফিরে যেত না। এমন মোহভঙ্গের পর মৃত্যুবরণ করাই সহজ এবং স্বাভাবিক; হয়তো অনিবার্য!

আজকে আবার সমতলের সঙ্কীর্ণ স্বাদহীন জীবনে ফিরে এসে সেদিনের সেই অভিজ্ঞতা বিবৃত করতে বসে মনে হচ্ছে, কেদারনাথ বিগ্রহের উপরোক্ত প্রথমোদ্ভাবিত ব্যাখ্যাটিই যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত ছিল। কিন্তু সেদিন কেদারনাথে উষ্ণ রোদে মুক্ত হাওয়ায় উদ্ভাবিত যুক্তিটি আদৌ সন্তোষজনক মনে হয় নি। বহু ক্লেশে ব্যাখ্যাটি আবিষ্কারের পর মনে হয়েছে এইটে আসলে আমার পঙ্গু চেতনার বিকৃত আত্ম-সন্তোষ মাত্র। যা গ্রহণ করবার ক্ষমতা আমার নেই তা'র অস্তিত্বই কেবল অস্বীকার করছি। উটপাখীর বালুতে আত্মগোপনও এর চাইতে শ্লাঘাকর, এর চেয়ে কম হাস্যকর ও কম মর্মান্তিক। ইতিমধ্যে সহ্যের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গিয়েছিলাম—মধ্যবিত্ত চেতনার একেবারে অন্তিম বিন্দুতে—যেখানে থামতে না পারলে যে-কোন অনাসৃষ্টি ঘটনা ঘটবার অনিবার্য আশঙ্কা।

সৃষ্টিছাড়া বিগ্রহটিকে দৃষ্টির অন্তরাল করবার প্রয়াসে তখন নবাগত যাত্রীদের দিকে চোখ ফেরালাম। এই মন্দির প্রাঙ্গনে বসবার মুহূর্ত থেকেই একের পর এক শ্রান্ত ক্লান্ত দুস্থ যাত্রীদল কেদারনাথে এসে পৌঁছচ্ছিল। প্রত্যেকের সেই একই প্রতিক্রিয়া। —মন্দাকিনী অতিক্রম করেই অকস্মাৎ সবাই শ্রান্তি-ক্লান্তি ভুলে ত্রস্তপদে মন্দিরের অভ্যন্তরে অন্তর্হিত হয়ে যায়। কত যুগের সাধনা বুঝি সিদ্ধ হবে, আজন্মকালের স্বপ্ন সার্থক হবে, দীর্ঘ পথাতিক্রমের শেষ পুরস্কার আসবে আয়ত্বে, অমানিশার শেষে এইবার নতুন সূর্যোদয়! ততক্ষণে এদের জন্যে করুণার্দ্র হতেও ভুলে গেছি। মন্দিরাভ্যন্তরে যে কি নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনা প্রতীক্ষা করে বসে আছে সে সম্পর্কে একজন যাত্রীর মধ্যেও সামান্যতম সচেতনতা বা দ্বিধাবোধ

নেই। হয়তো এরা প্রবঞ্চিত হয়েও নিজেদের পুরস্কৃত বলেই জানবে। আবার সুযোগ পেলেই লোটা-কম্বল নিয়ে শত-সহস্র ক্লেশ সয়ে আবার আসবে প্রবঞ্চিত হতে। আবার ফিরবে মূঢ় সন্তোষ নিয়ে। এদের জন্য করুণার্দ্র হওয়াও বাহুল্য।

তন্মধ্যে আবার কখন আত্ম-চিন্তায় নিবিষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। এক বাঁও দুই বাঁও—তলাকার মাটি মিলছিল না। কেদারনাথ বিগ্রহের এই নির্মম বিদ্রূপের পর আবার সেই নাগরিক জীবনের একঘেয়েমিতে ফিরে যেতে হবে একদিন। এই স্মৃতি নিয়ে আবার ঝাঁপ তুলতে হবে। বস্তাপচা ভাঙাচুরো পণ্যে আবার সাজাতে হবে দোকান। যে সজ্জার প্রতি আমি নিজে কণামাত্র প্রলুব্ধ হব না সেই সজ্জায় পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে এ-বেলা থেকে ও-বেলা দিনের পর দিন। অথচ কা'র জন্যে কী কিছুই জানব না। শুধু জানব কিছুর জন্যেই কিছু নয়। তখন দিন কি ভাবে অতিবাহিত হবে, রাত্রি কেমন করে প্রভাত হবে! সম্ভাবনা যতই সামান্য থেকে থাকুক এর পর বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যাওয়া আদৌ অযৌক্তিক হত না।

এমন সময় অপর এক যাত্রীদল এসে পৌছল।—আগা পাশতলা অপরাপর যাত্রীদলের এসে পৌছনর মতো! হয়তো একটু বেশী পরিমাণেই শ্রান্ত ও ক্লান্ত, আর্ত ও দুস্থ। এরা সত্যিকারের নিঃস্ব যাত্রী। ছড়িদারের বিলাসিতা নেই, কুলির সহায়তা নেই; গায়ে জীর্ণ বস্ত্র, একজনের পায়ে কেবল ছিন্ন কেড্‌স্। নিজেদের সামান্য বোঝা নিজেরাই কষ্ট করে বয়ে এনেছে। মন্দাকিনী অতিক্রম করে এসে এদেরও দলের সবাই কঠিন কেদারনাথের জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করে মন্দিরের ভিতর নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। একজন কেবল সবার পিছন পিছন আসছিল—এক অশীতিপর বৃদ্ধ। সমবেত জয়ধ্বনির সময় সে মূক রইল, সবাই অন্তর্হিত হতে সে আমাদের পাশেই বসে পড়ল সিঁড়ির উপরে। বালসুলভ ব্যগ্রতার লেশমাত্র ছিল না তার আচরণে। অবশেষে লাঠিটাকে সাবধানে পাশে রেখে বৃদ্ধ ক্লিষ্ট যাত্রী চক্ষু নিমীলিত করল, বিলম্বিত বিস্তারের পর যেন অবশেষে সমে পৌছনো গেছে।

আর কোন ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল না। বিক্ষুব্ধ চেতনা মুহূর্তমধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেল। বৃদ্ধ যাত্রীর নিমীলিত চোখের অজস্র কুঞ্চনে পুরো ইতিহাসটাই অকপটে লেখা ছিল। দ্ব্যর্থহীন বলিষ্ঠ ভাষায় পাশাপাশি ক্লান্তি ও তৃপ্তির কথা। সুদীর্ঘ পথ ও সুনিশ্চিত লক্ষ্যের নির্ভুল মানচিত্র। এই ক্লান্তি ও তৃপ্তি এই পথ ও লক্ষ্য,—শত বিরুদ্ধ-যুক্তি সত্বেও মিথ্যা হতে পারে না কোনক্রমেই। প্রাণ ধারণের শ্বাস-গ্রহণের মতো এই সব স্বতঃসিদ্ধ। আমার পথভ্রান্তি হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু এই বৃদ্ধ অভিজ্ঞ যাত্রীর তো পথ ভুল করে কেদারনাথে এসে পৌঁছবার কোন যুক্তি নেই! পুরানো ব্যাখ্যাটিই তখন আবার নতুন দ্যোতনায় দীপ্ত হয়ে উঠল। সত্য বটে, কলকাতার কানা গলির পুরানো বাড়ির ভাঙা ইঁটটির সঙ্গে কেদারনাথ বিগ্রহের আপাত জ্ঞাতিত্ব আছে, কিন্তু তা-তে ক'রে কেদারনাথের মাহাত্ম্য তো আদৌ অপ্রমাণিত হল না। সে যে স্বতঃপ্রতিষ্ঠিত। এই জ্ঞাতিত্ব কলকাতার সেই ভাঙা ইঁটের সুপ্ত মাহাত্ম্যেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। পূর্বপূর্ব অভিজ্ঞতার গুরুত্ব উপেক্ষা করেছি বলেই আজকের অভিজ্ঞতায় আমি এমন হতবুদ্ধি। সত্যটা স্বীকার করবার পরেও অথর্ব হয়েই বসে রইলাম। সত্যটা গ্রহণ করা ক্ষমতায় কুলোল না।

ইতিমধ্যে কখন যে সেই বৃদ্ধ যাত্রী উঠে গিয়েছিলেন খেয়াল করিনি। কখন যেন আমি আবার আত্ম-বিবরের স্থূল নিশ্চয়তায় ফিরে এসে ছিলাম। সংশয়ের অভ্যস্ত অনুসঙ্গগুলো নিয়ে নাড়া-চাড়া করছিলাম আপন মনে। ত্রিযুগীনারায়ণের মতো কেদারনাথেও স্ফুলিঙ্গের আগুন জ্বলে উঠেই নিশ্চিহ্নে ফুরিয়ে গিয়েছিল।

ততক্ষণে দোকানপাট সমস্ত খুলে গেছে, লোকের আনাগোনা বেড়েছে। মৃদু গুঞ্জনে পারিপার্শ্বিকের স্থিরতা স্পষ্ট উপলব্ধ হচ্ছে। রাস্তা থেকে কুলিদের বরফ পরিস্কার করা প্রায় সমাধা হয়ে এল। একে একে নবাগত যাত্রীরা এসে পৌঁছতে লাগল। প্রত্যেকেরই দেহ ক্লান্ত, সকলেরই হাঁটুতে ব্যথা, কারও কারও পা ফুলেছে, কারও বা পায়ে ঘা হয়ে গেছে। কিন্তু মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াতেই প্রত্যেকের চোখ দুটো দেহমনের সমস্ত অবসাদ সত্বেও দীপ্ত হয়ে

উঠছে। সমস্ত জীবনের লেন-দেনের, লাভ-লোকসানের আজ হিসাব নিকাষ। প্রত্যাশার কোন মূল্য নেই—কেবল উপার্জন অনুযায়ী পুরস্কার! পুরস্কার বিতরণকারীর নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততায় কেবল বিষন্ন বোধ করলাম।

অবশেষে আমাদের দলের অন্য সবাই এসে পৌঁছল—তারাদা, সুশীল এবং ননী। তিনজনেরই আচরণে কেমন যেন তুষ্টিভাব—তবে এই তুষ্টিও তিনজনের তিন রকম, একের সঙ্গে অপরের কোন যোগাযোগ নেই।

কী ব্যাপার, আপনারা এখানে বসে আছেন যে?

ভেতরে যাবার পাসপোর্ট নেই বলে। বিনা প্রবেশপত্রে ঢুকলে ঘাড় ধরে বের করে দেয়।

আরে, আসুন আসুন—অবোধ সুশীল এইবার গলা যোগ করল, এই যে ইনি আমাদের পাসপোর্ট, পাসপোর্ট নন শুধু, স্বয়ং বন্দর।

উনি আমাদের পাণ্ডা, সুশীলই পরিচয় দিল, নাম পান্নালাল শুক্ল। ভদ্রলোকের পরনে ধুতি এবং গরম অলেস্টার, পায়ে অক্সফোর্ড আর মাথায় উলের গান্ধীটুপি, সুবিন্যস্ত চেহারা। মৃদু হেসে ভদ্রলোক আমাদের একটি কুঁড়ের দোতলায় নিয়ে তুললেন। কাঠের মেঝে, কাঠের দেয়াল; মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা রয়েছে, বেশ উষ্ণ কামরা। ঘরে ঢুকেই যে যার তাকিয়ায় হেলান দিয়ে কম্বল মুড়ি দিল, নীলমণি চা আনতে বলল।

বাইরে শীতে আকাশ বাতাস হি-হি করে কাঁপছে, পাহাড়গুলো জমে নিথর হয়ে গেছে। গরম কম্বল চাপা দিয়ে, গরম চা পান করতে করতে, কৃত্রিম হুহু-হিহি-সহযোগে কল্পনায় শীত উপভোগ করতে বেশ লাগছিল। কিন্তু একটু পরেই কে যেন আবার খোঁচা দিতে থাকল: সন্ধান যে এখনও শেষ হয় নি। কেদারনাথে এসেও চোখ মুদে পড়ে থাকব, সমতলে ফিরে তা হলে নিজেকে সান্ত্বনা দেব কী বলে?

না, এমন ভাবে শুয়ে থাকা কাজের কথা নয়. চলুন, ওঠা যাক।—নীলমণি কেমন করে যেন আমার আগেই আমার মনের কথাটি প্রতিবার জেনে যায়।

হ্যাঁ, ওঠা যাক বলাই নিরাপদ, খোঁজা যাক বলার অনেক অসুবিধে। না কি বলেন?—উন্মাদের মত অর্থহীন হাসি হেসে আমি কম্বল ছেড়ে উঠে বসলাম।

খবরদার, কেউ আর বেরুবেন না এখন। বেলা দশটা বাজে, এইবার স্নান সেরে পুজো দিতে না গেলে মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে। জিতরাম, তেল লাও।—দলপতি তারাদার আদেশ অমান্য করা অসম্ভব বলেই মনে হল। কিন্তু সংগঠনশীলতার চাইতেও মহত্তর কিছুর জন্যে তখন লালায়িত ছিলাম, অতএব তারাদার আদেশ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বললাম, চলুন নীলমণিবাবু, আগে চা তো পান করি। এখনো অনেক সময় আছে।

কিন্তু বাইরেও আবার সেই বরফ সেই পাথর, সেই শীত সেই যাত্রী। বার বার দুবার মন্দির-পরিক্রমা করলাম, প্রতিটি যাত্রীর চোখে মুখে নিবিষ্টভাবে খোঁজ করলাম; কিন্তু এই কি সব, এই কি শেষ? এর জন্যই কি এতটা পথ হাঁটলাম, এত অর্থ ব্যয় করলাম? ব্যবসায়ী বুদ্ধি আমার কোনকালেই তেমন পাকা ছিল না, কিন্তু এমন মূঢ়তা আমার পক্ষেই বা কেমন করে সম্ভব হল! বার বার পেয়ে আবারও পরশ-পাথর হারিয়েছি। আবার তার অনুসন্ধান লজ্জাকর মনে হল, একটা যুক্তিও বের করে ফেললাম। অকাট্য যুক্তি। গরম চায়ের গেলাস হাতে নিয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে অবশেষে স্থির করে ফেললাম, না, কেদারনাথকে পুজো দেব না। অবিশ্বাসিত ঈশ্বরের পুজোর জন্যে ন্যুমোনিয়ায় ঝুঁকি নেব না। কী হবে পুজো দিয়ে, কী হয়েছে এতটা পথ হেঁটে?

ঘরে ফিরে দেখি, ইতিমধ্যে তারাদার গায়ে তেল মাখা হয়ে গিয়েছে, এবং ননী ও সুশীল নাকি অনেক আগেই যে যার কম্বলের তলা থেকে জানিয়ে দিয়েছে যে ওরা বরং প্রাণ দেবে, তবু স্নান করবে না। আমরা ঘরে ঢুকতেই তারাদা ঝাঁজালো কণ্ঠে বললেন, আপনারাও কি স্নান করবেন না স্থির করেছেন? হুঃ, জানতে ইচ্ছা করে গতজন্মে আপনারা আওরঙ্গজেব ছিলেন, না, নাদিরশাহ ছিলেন।

অবস্থা বুঝে, ননী ও সুশীলের খাতায় নাম লেখাবার চাইতে বরং তারাদার হুকুম মান্য করা বিধেয় মনে হল। মুহূর্তকাল আগেকার অমন

সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত কোথায় উড়ে গেল। অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে আমি ও নীলমণি মুহূর্তের মধ্যে জামা খুলে ফেললাম, তারপর গায়ে গামছা জড়িয়ে তেল মেখে পাঁচ মিনিটের মধ্যে নদীর ঘাটে গিয়ে হাজির হলাম কাঁপতে কাঁপতে।

মন্দির-চত্বর বা চায়ের দোকানের চাইতে কেদারনাথের নদীর ঘাটে লোকের ভিড় অনেক কম। দেবপ্রয়াগ বা রুদ্রপ্রয়াগে এমন নয়। অবশ্য এখানকার ঘাটকেও সংজ্ঞানুযায়ী ঠিক ঘাট বলা যায় না, কোন সিঁড়ি নেই, কতকগুলো পাথর বেয়ে ওঠা-নামা করতে হয়। যাত্রীদের কেউ কেউ কাক-স্নান করছে, কিন্তু তাদের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য। অধিকাংশই মাথায় জল ছিটিয়ে এক ঘটি করে জল নিয়ে চলে আসছে। কেবল কর্নেল-পত্নীর সাধুজী একটি পাথরের আড়ালে, নদীর স্রোত যেখানে কথঞ্চিৎ কম, কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে জোড়াসন কেটে বসে সজোরে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। বিস্মিত হতে তখন ভুলে গিয়েছি, কিন্তু তবু বিস্ময় বোধ করলাম। সদ্য-বরফ-গলা হিমশীতল জল, তদুপরি এই ঠাণ্ডা আবহাওয়া, আঙুল ডোবালে আঙুল বেঁকে যায়; মানুষ কী করে সেই জলে অর্ধদেহ ডুবিয়ে শুদ্ধ উচ্চারণে মন্ত্র পাঠ করতে পারে? কিন্তু করতে পারে। অশ্রদ্ধা অত সহজে কাটবার নয়, কিন্তু সাধুজীর প্রতি এইবার কিছুটা শ্রদ্ধাও অনুভব করলাম।

কিন্তু নদীর ঘাটের চেহারা দেখতে আমরা আসি নি, এবং আমরা জানতাম যে একটু গড়িমসি করলেই স্নান আর করা হবে না। অতএব ঘাটে পৌঁছেই তরতর করে জলের কাছে নেমে গেলাম, তারপর শ্বাস রুদ্ধ করে পর পর আট-দশ মগ জল মাথায় ঢেলে ছুটে উপরে উঠে এলাম। উপরে উঠতেই সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর হতে একটা পাথরের উপর বসে পড়লাম। হাতের তখন এমন ক্ষমতা নেই যে, দেহমার্জনা করি। হাহা-হিহি করে হাসতে হাসতে কাঁপতে কাঁপতে যখন নীলমণি ও তারাদা আমার সামনে এসে দাঁড়াল, তখন আমিও শুধু হাহা হিহি করে হাসার ভানে কাঁপতে থাকলাম। অবস্থাটা বুঝিয়ে বলি তখন এমন সামর্থ্য নেই। তবে ওরা অবস্থাটা বুঝল এবং অনতিবিলম্বে ধরাধরি করে ঘরে ফিরিয়ে এনে আগুনের কড়াটার কাছে বসিয়ে দিল। দেহের রক্ত চলাচল শুরু হতেই তাড়াতাড়ি পোশাক পরে

নিলাম—গরম ট্রাউজারস, পুলোভার, গরম কোট, গরম চাদর, গরম মোজা এবং গরম দস্তানা, খুব ভাল করে বোতামগুলো এঁটে দিলাম। কিন্তু দেহের স্বাচ্ছন্দ্য কতকটা ফিরে পেতেই মনের মধ্যে একটা মারাত্মক পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করলাম। যদিও তার কোন কারণ ছিল না, তবু মৃত্যু আর পরাজয় এ দুয়ের কোনটাই তো আপেক্ষিক নয় যে অন্যান্যদের সমাবস্থা দেখে সান্ত্বনা পাব!

তারপর সেই সঙের পোশাকেই নিজেকে অধিকতর ভেবে দেখবার অবকাশ না দিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত পুজোও দিয়ে এলাম। একটা মন্ত্রও সঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে পারি নি, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতেরও না ছিল সাধ, না ছিল সাধ্য। তবু আচার সব যথাযথ পালিত হল। পুজো সেরে আবার চায়ের দোকানে এসে বসলাম। ইতিমধ্যে বেলা বেড়েছে। একটু পরে মন্দিরদ্বার বন্ধ হয়ে গেল। যাত্রীদের ব্যস্ত আনাগোনায় ভাটা পড়ল, গুঞ্জন স্তিমিত হয়ে এল। অদূরে হিমময় কেদারশিখরে প্রতি মুহূর্তে বরফ জমছে, বরফ গলছে; স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে শৃঙ্গ তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠল, তার পরই আবার প্রশান্ত। আস্থায়ী থেকে তালভঙ্গ না করে এত দ্রুত যে সমে আরোহণ করা সম্ভব কেদারশৃঙ্গ না দেখলে তা কল্পনা করাই শক্ত। এই রৌদ্রকিরণে শিখরদেশ কাঁচা সোনার মত ধক ধক করে জ্বলে উঠল, এই আবার পর-মুহূর্তেই ক্ষীণ মেঘের আবরণের আড়ালে সমাহিত হল। পর পর দু-পেয়ালা চা-পানের পর ভেবে দেখবার চেষ্টা করলাম, পুজো দিয়ে কী লাভ আমার হল? তখন নিজের প্রতিও নির্দয় হবার সুযোগ ছিল না। মনে হল, পুজো দিয়ে শান্তি যদি বা না পেয়ে থাকি তো স্বস্তি অন্তত নিশ্চয়ই পেয়েছি। এবং মনে হল, একটা কিছু, একজন কেউ—আমার একান্ত অন্তরঙ্গ হয়েও যিনি আমারও অতীত—আভাসে তাঁর অস্তিত্বের সুস্পষ্ট স্পর্শ পেয়েছি। এখনও, এই মুহূর্তে চোখ কান বুজে একটু ভাবলে বোধ হয় তাঁকে আবার স্পষ্ট অনুভব করতে পারব। নিশ্চয়ই পারব, কারণ তিনি যে আছেন। তিনি যে এই চায়ের গেলাসটির মত, ওই কেদার-পর্বতটির মত এবং এ সবের চাইতেও অনেক গুণ বেশী সত্য। একটু শুধু ধ্যান প্রয়োজন, সামান্য একটু চেষ্টা। নিজের ও নিজের দেহের কথা, পারিপার্শ্বিকের কথা বিস্মৃত হয়ে মুহূর্তের একটু একাগ্রতা, তা হলেই আমার কেদারনাথ আসা সার্থক হতে বাধ্য।

কিন্তু কিছুক্ষণ স্থাণু হয়ে বসে থাকার দরুণ ইতিমধ্যে আবার হাড়-কাঁপুনি লেগেছিল,—এমন সাধ্য ছিল না যে নিজেকে বিস্মৃত হই। অতএব তাড়াতাড়ি চায়ের দোকান ত্যাগ করে ঘরে ফিরে এলাম, এবং আবক্ষ কম্বল জড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে সোজা হয়ে বসে জানলা-পথে কেদার-পর্বতের দিকে তাকিয়ে তাঁর কথা ভাবতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু কই, মনের মধ্যে তাঁর মূর্তি তো স্পষ্টতর হল না। কেদারশৃঙ্গের মত তিনি যেন জানলার বাইরেই অবস্থান করতে লাগলেন। না, ঘরে ফিরে ভুল করেছি, বাইরে থাকলেই সম্ভবত এতক্ষণে তাঁকে ধরা যেত, বাইরে যে তিনি অনেক কাছে ছিলেন। আবার যেই তোড়জোড় করে বেরুতে যাব অমনি শুরু হল তুষারবৃষ্টি।

অনুসন্ধানকার্য আপাতত স্থগিত রাখতে হল বলে মর্মান্তিক রকম হতাশ হলাম না। বরং একটা স্বস্তির নিশ্বাস চেপে, আর একটা সিগারেট ধরিয়ে জড়সড় হয়ে বসে তুষারপাত দেখতে লাগলাম। ঝিরঝির ঝিরঝির করে ফুলঝুরির স্ফুলিঙ্গের মত নম্র এবং অনুদ্ধত তুষার ঝরছে। মেঘমুক্ত আকাশ, শীতার্ত কেদারনাথ সূর্যের সিক্ত কিরণে মহাপরিতৃপ্তির সঙ্গে অবগাহন করছে। তুষারকণাগুলো সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে, যেন হাসছে—কিছুক্ষণের মধ্যে আশপাশের সমস্ত কিছু ক্ষীণ তুষার-আবরণের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। হাওয়ায় ভেসে ঘরেও অল্প অল্প তুষার এসে পড়ছিল, হাতে মুখে মাথায় সোহাগ করছিল।

আগেই বলেছি, কেদারনাথের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি বহন করবার ক্ষমতা জগতের কোন ভাষারই নেই। সেই ভাষাও আমি বিস্মৃত হয়েছি, যে ভাষায় এই সৌন্দর্যের একটা রূপক অন্তত আঁকা সম্ভব ছিল। অতএব কেদারনাথের ঐশ্বর্য সম্পর্কে নীরব থাকাই বিধেয়। তবে তন্ময় হয়ে এই যুগযুগ-সঞ্চিত প্রশান্ত বিশুদ্ধতার সামনে বসে মনে হল, এই যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য, এও কি স্থানকালের ঊর্ধ্বে নয়? এর অভিব্যক্তি কি এই স্থানটুকুতেই সীমাবদ্ধ? তা কেমন করে সম্ভব, অথচ তার বিপরীতও যে অসম্ভব। কেদারনাথ সত্ত্বেও যে কলকাতা আছে, কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও অনস্বীকার্য।

কিন্তু অবিস্মরণীয় নয়। মুহূর্তকাল মধ্যে আবার সব ভুলে বিমনা হয়ে গেলাম। কী আগ্রাসী সৌন্দর্য, অথচ কী প্রশান্ত! আমি

আত্মকেন্দ্রিক জীব, আত্মহারা হলে অপ্রস্তুত বোধ করে থাকি, অথচ মুহূর্ত মধ্যে এইটুকু দেখবার মতও চেতনা আর রইল না যে, অপ্রস্তুত বোধ সমেতই আমি আগ্রাসিত হয়েছি।

ঝিরঝির করে তুষারবৃষ্টি ঝরছে। তা অতিক্রম করে অদূরে—কিন্তু কতদূরে!—তুষারাচ্ছাদিত কেদারনাথ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সঙ্কীর্ণ একটা পথ সাপের মত এঁকেবেঁকে কেদারনাথের গা বেয়ে উঠে গেছে। তার-পরই ডান ধার দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে। শুনেছি এই পথ ধরে কিছু দূর গেলে কয়েকটা প্রস্তরবেদী পাওয়া যায় চির-তুষারক্ষেত্রের মধ্যে। আগেকার কালে, অনেক কাল আগে শুধু ভ্রমণমানসে কেউ কেদারনাথ আসতেন না; সবাই আসতেন গার্হস্থ্যাশ্রমের পাট চুকিয়ে দেহরক্ষার সঙ্কল্প নিয়ে। কিন্তু সহস্রলক্ষগুণ বেশী পথকষ্ট সত্ত্বেও দেবপ্রয়াগে বা রুদ্রপ্রয়াগে যাঁদের যাত্রা সমাপ্ত হত না, তাঁরা কেদারনাথে এসে ওই পথে আরও উপরে উঠে যেতেন—জনপ্রাণীহীন চিরতুষারক্ষেত্রে। তারপর ওই বেদীর উপরে ধ্যানে বসতেন। তারপর—

পৃথিবীর গতি অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। সময়ের মালা থেকে দুটো মুহূর্ত খসে কোন্ অতলে হারিয়ে গেল। হিমালয় নিরুদ্বিগ্ন—অচঞ্চল দাঁড়িয়ে রইল।

কখন থেকে যেন তারাদা ও ননীর মধ্যে শ্যালক শব্দটির ব্যবহারিক ও আভিধানিক অর্থ বৈষম্য নিয়ে তুমুল কোঁদল বেঁধে গিয়েছিল। সূত্র ছিল, ননী নাকি ওই প্রিয় নামে জিতরামকে সম্বোধন করেছে। ওঁদের তর্ক ভাষাতত্ত্বের আওতা অতিক্রম করতে আমিও জানলা থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই সাগ্রহে সে গোলযোগে গলাযোগ করলাম। তারপরে নীলমণি কোন এক অজ্ঞাতনামা কেদারের বাপ সম্পর্কে একটি আদিরসাত্মক নয়, অশ্লীল কাহিনী কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী সহকারে নিবেদন করল। শুনে, কেদারনাথের দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই আমি অন্যান্য সকলের সঙ্গে বোকার মত হি-হি করে কিছুক্ষণ হাসলাম। অবশেষে বাইরের অপ্রতি-রোধ্য আগ্রাসী নিস্তব্ধতায় যখন ঘরের বক-বকম সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেল, তখন সেই নিস্তব্ধতা হৃদয়ের নাগাল পাবার আগেই মনে পড়ল: কলকাতায় অনেক দিন, সেই রুদ্রপ্রয়াগের পরে, কোন চিঠি লেখা হয় নি। চিঠি লিখতে আমি কোনকালেই তেমন ভালবাসি না; কিন্তু

সেদিন তৎক্ষণাৎ কাগজ কলম নিয়ে নিবিষ্টচিত্তে চিঠি লিখতে বসে গেলাম। পরে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মন্দিরে আরতি দেখবার জন্যে একবার চটি ত্যাগ করেছিলাম।

তখন একবার তাকিয়েও ছিলাম অস্তগামী সূর্যের রক্তিমরাগে রঞ্জিত মেঘজটাজুট তুষারাবৃত কেদারনাথের দিকে। অপূর্ব সৌন্দর্য! কিন্তু আর শুধু সুন্দর নয় কেদারনাথ। তাড়াতাড়ি মন্দিরের ভিতর ঢুকে অভিভাবকহীন অবুঝের মত কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। তারপর মন্দিরের বাইরে যেখানে কয়েকজন কিছু কাঠ জ্বালিয়ে গোল হয়ে বসে ছিল, সেখানে কয়েক মুহূর্ত আগুন পোয়ালাম। যেখানে কয়েকজন মিলে জড় হয়ে ভজন গাইছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ গান শুনলাম। অবশেষে নিজের কাছেই শৈত্যাধিক্যের অজুহাত দেখিয়ে চটিতে ফিরে এলাম। ভীতিকাতর চোখে একবার কেদারনাথের দিকে তাকিয়ে—

নৈশাহার সমাধা করে পাণ্ডার কাছ থেকে সুফল গ্রহণের পর সেদিন রাত্রিতে যখন সবাই শোবার উপক্রম করছি তখন সুশীল হঠাৎ জানাল যে, উচ্চতার কারণে ওর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, অল্পস্বল্প হাঁপানির ঝোঁক ওর নাকি আগে থেকেই ছিল। রীতি অনুযায়ী কেদারনাথে ত্রিরাত্রি বাস করা কর্তব্য। তারাদা বিপদে পড়লেন। কিন্তু সুশীলের শ্বাসধ্বনির মধ্যে অন্য কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগই ছিল না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারাদা অগত্যা আগামী কাল সকালেই কেদারনাথ ত্যাগ সাব্যস্ত করলেন; এবং কী কী কারণে এই সিদ্ধান্তই আমাদের পক্ষে নিরাপদ তা বোঝাতে লাগলেন। যদিও, আমার দিক থেকে অন্তত, সে ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না।

পরদিন সকালে নিদ্রাত্যাগের পর কুলি ও ছড়িদার মাল-পত্র নিয়ে আগে রওনা হয়ে গেল। শেষ বারের মত মন্দিরপরিদর্শনান্তে, গেলাস চারেক চা পানের পর পাণ্ডাজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেলা একটা নাগাদ আমরা কেদারনাথ ত্যাগ করলাম। মন্দাকিনী অতিক্রমণের আগে উচু একটা পাথরের উপর দাঁড়িয়ে শেষবারের মত সোজাসুজি একবার কেদার-পর্বতের দিকে চাইলাম। কেন না. এবারের মত যে কেদারনাথের শীতল হস্ত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে আনতে পেরেছি এই নিরাপত্তাবোধটুকু তখন মনের মধ্যে ছিল।

সোজা ফার্লং দুয়েক পাথর বাঁধানো পথ পেরিয়ে এসে পাহাড়ের বাঁক ঘোরবার আগে আর একবার ফিরে কেদারনাথের দিকে চাইলাম। আপন গৌরবে কেদারনাথ অধিষ্ঠিত; আপন ভাস্বরতায় প্রোজ্জ্বল; ধ্যানে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মনের কোণে একটু ক্ষোভ ছিল যে, কেদারনাথ আমার সইল না। মনের কোণে একটু স্বস্তি ছিল যে, কেদারনাথ আমার সয় নি। পাহাড়ের বাঁক ঘুরে উতরাই নামতে লাগলাম; ভাবলাম, কেদারনাথ ও আমার মধ্যেকার দূরত্ব, যা ঘোচবার নয়, এ ভালই যে তা বেড়ে চলেছে। কেদারনাথ থাকুন কেদারনাথেই। আমি পথ ভুল করেছিলাম, সেই ভুলটুকু অন্তত যে ধরতে পেরেছি সেইটুকুই আমার সান্ত্বনা। কেদারনাথ প্রেমের অতীত, তাঁর জন্যে আমার শ্রদ্ধা রইল। শ্রদ্ধার জন্য দূরত্ব প্রয়োজন, এ ভালই যে সে দূরত্ব বেড়ে চলেছে।

উৎরাই নেমে আসছি। ঝরনার জলের মত সোচ্ছ্বাসে পথের জয়গান করতে করতে নয়, গড়ানো পাথরের মত বাধ্য হয়ে পথকে গাল দিতে দিতে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে। একে পায়ে অসহ্য ব্যথা, যেন বেড়ি-লাগানো। ভয় হয় হাঁটু ভাঙতে গেলে হাঁটুই ভেঙে যাবে বুঝি—অতএব পা সোজা রেখে লাঠিতে ভর দিয়ে থপ থপ করে নামতে হচ্ছে। তার উপর গত দু দিন শীতের ভয়ে আর প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিই নি। তদুপরি মনে হতাশার দুর্বহ বোঝা—কেদারনাথ আমায় প্রবঞ্চনা করেছে, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নি। সর্বোপরি উৎরাই অত্যন্ত খাড়া। এত খাড়া যে আস্তে চলা অসম্ভব। যদি আদৌ চলতে হয় তবে ছুটে চলতে হবে। অগত্যা ছুটেই নেমে চলেছি। কিন্তু এমন নামা যে নামে নি, এ নামা যে কি-নামা তা সে কোনকালে অনুমানও করতে পারবে না। প্রতি পদক্ষেপে দেহের ভিতর প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন ওলট-পালট খাচ্ছে। উদর বুকে উঠে আসতে চায়, বুক নেমে যেতে চায় উদরে; গ্রীবা মাথাকে আর বইতে নারাজ, শিরা-উপশিরাগুলো যেন বিদ্রোহ করছে, পা দুটোর ওজন যেন দশ-দশ বিশ মণ! তবু নেমে চলেছি। তবু থামবার উপায় নেই। ক্রমে পায়ের আঙুলের ডগাগুলো অসাড় হয়ে এল। ওই আঙুলের ডগায় চাপ দিয়েই নামতে হচ্ছে; এক-একবার চাপ পড়ছে আর মনে হচ্ছে, আঙুলে বুঝি শত সূচ এক সঙ্গে

ফুটল। কিছুক্ষণের মধ্যে দৃষ্টি বিকৃত হল, মন বিতৃষ্ণ হয়ে উঠল। পৃথিবীর সমস্ত আলো নিভে গিয়েছে; মাঝে মাঝে যন্ত্রণার বিকট মুখব্যাদান ছাড়া চোখে আর কিছুই পড়ছে না। হিমালয় যেন পৃথিবীর পৃষ্ঠের বৃহত্তম কুব্জ—কুৎসিত এবং নির্দয়। হিমালয় যেন বিগত সহস্র জীবনের পাপ; যার ভার বইবার সামর্থ্য আমার নেই, যে ভার এড়াবার ক্ষমতা আমার নেই। ইতিমধ্যে সূর্য মাথার উপরে উঠে পড়ল; দূরে তুষারদিগন্তের দিকে তাকিয়েও কোন সান্ত্বনা মিলল না। বিপদ যখন আসে, আসে ভিড় করেই।

অবশেষে রামওয়াড়া চটিতে পৌঁছে :কিছুক্ষণের জন্যে হাল না ছেড়ে পারলাম না। ব্যথাজর্জরিত দুর্বহ পা দুটোকে দুই হাতে অতি সন্তর্পণে ধরে তুলে একটা বেঞ্চের উপর দেহ এলিয়ে বসে পড়লাম। চোখ বুজে পায়ের ব্যথায় আস্তে আস্তে হাত বুলোতে বুলোতে চা-ওয়ালাকে বললাম এক গেলাস চা দিতে। চোখ বুজতে, যেন স্বভাবতই, দুই ফার্লঙ দূর থেকে দেখা মন্দির-সমেত কেদার-পর্বতের সুস্পষ্ট দৃশ্যটা ফুটে উঠল চোখের সামনে। সেই বোধের অতীত তুষারাচ্ছাদিত মূক কেদার-পর্বত। যেন স্ফিংস, কিন্তু অবয়ব প্রসন্ন আর প্রচুর আলো। তবু অত আলো সত্ত্বেও কী যেন দেখেও দেখতে পাচ্ছি না। অমন নিশ্চ্ুপতার মধ্যেও কী যেন শুনতে বার বার ভুল হয়ে যাচ্ছে। বোধ-বেচারা অপ্রতিভ হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আশ্চর্য! কিন্তু পায়ের দুঃসহ ব্যথায়, দেহের অসহ্য অস্বস্তিতে মন তখন আমার এমনই আচ্ছন্ন যে, আশ্চর্য হবার প্রসারতাও আর ছিল না। তার ওপরে এই সকালেই আরও চার মাইল উৎরাই নামতে হবে। অগত্যা সব-কিছু ভোলবার চেষ্টায় একটা সিগারেট ধরালাম।

এমনটি আর কোনদিন হয় নি। চেষ্টা করে কোন কোন জিনিস মনে রাখা যায়; কিন্তু চেষ্টা করে সব কিছু যে ভুলতেও পারা যায় সেইটে সেদিন প্রথম জানলাম। চা পানের পর সিগারেট টানতে টানতে পথ ভুললাম, পথকষ্ট ভুললাম, পায়ের ব্যথা ভুললাম, কেদারনাথ ভুললাম, হিমালয় ভুললাম, এমন কি কলকাতার কথা পর্যন্ত মনে রইল না। অথচ আমি আদৌ ঘুমিয়ে পড়ি নি। চা-ওয়ালার অনর্গল বাক্যালাপ শুনছি, যাত্রীদের একে একে অতিক্রম করে যেতে দেখছি, পরিচিত যাত্রীদের

প্রতি হেসে সৌহার্দ্য জ্ঞাপন করছি, অথচ কিছুই ভাবছি না। কিচ্ছু না। মন একেবারে শূন্য।

একটু পরে দেখি, কর্নেল-পত্নীর সেই পারলৌকিক অভিভাবক ডাণ্ডিতে চেপে নেমে আসছেন। গরম-কাপড়-জড়ানো মাথাটা পেছন দিকে হেলান। চক্ষু মুদ্রিত, যেন অসুস্থ। ছয় জন কুলি অতি কষ্টে তাঁকে বহন করে নীচে নেমে গেল। আমি নিরুদ্বেগে সিগারেট টানতে থাকলাম।

খানিক পরে স্বয়ং কর্নেল-পত্নী সকন্যা নেমে এলেন, উভয়েই খোঁড়াতে খোঁড়াতে। এসে আমারই অদূরে একটা বেঞ্চে বসে চায়ের নির্দেশ দিলেন। অবশেষে কর্নেল-কন্যা বললেন, অত শীতে, অমন ঠাণ্ডা জলে গুরুজী অতক্ষণ স্নান না করলেই পারতেন। অতি ভক্তিতেই তো অসুস্থ হয়ে পড়লেন।

দেখ, যা বোঝ না তা নিয়ে কথা বলো না। বিশ্বাস যে মনে কত শক্তি দেয় তা তুমি জানবে কেমন করে?

যত শক্তিই দিক, অসুস্থতা রোধ করবার মত শক্তি অন্তত যে দেয় না তা তো দেখাই গেল।

কিন্তু কন্যার কথা হয়তো মাতার কানে গেল না, তিনি সম্ভবত অন্য কোন চিন্তায় তন্ময় ছিলেন। কিছুক্ষণ নীরবতার পর তিনি আপন মনেই আবার বললেন, এখন গৌরীকুণ্ডে ডাক্তার যদি গুরুজীকে সোজা নেমে যেতে বলেন, তবে—। বিড় বিড় করতে করতে অদূরে কেদারনাথের চূড়ার দিকে তাকিয়েই তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু কর্নেল-কন্যা খ্যাঁক করে উঠলেন—

তবে! তবে কি সবশুদ্ধ আমাদেরও নেমে যেতে হবে? না না, না না, সে হতেই পারে না। কেদারনাথ ওঁর সয় নি, আমাদের সয়েছে; বদরিনারায়ণ যদি ওঁর না-ও সয় তবে আমাদের অন্তত তা সইতেও পারে। আমরা কেন যাত্রা অসম্পূর্ণ রেখে নেমে যেতে যাব? আমি তো অন্তত—

সিগারেট শেষ হয়ে যেতে আমার আর বসে থাকবার কোন অজুহাত ছিল না। অগত্যা আবার উতরাই নামতে শুরু করলাম ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে। পা দুটো আবারও উদরে সেঁধিয়ে যেতে চাইল, উদর

আবার প্রতি পদক্ষেপে ডিগবাজি খেতে লাগল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি আবার নেমে আসতে লাগলাম। আবারও হিমালয়কে গাল দিলাম, আবার পথকে গাল দিলাম, আবার দূর তুষারসীমার দিকে বক্র কটাক্ষে চাইলাম, আবার ভাবতে চেষ্টা করলাম গত জন্মের কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমার এই পথে না এসে উপায় ছিল না। কিন্তু তবু থামবার উপায় ছিল না, অতএব নামতেই থাকলাম।

অবশেষে আমাদের সেদিনকার প্রাতঃকালীন গন্তব্য চটি গৌরীকুণ্ডে যখন মৃতপ্রায় দেহখানাকে নিয়ে পৌছনো গেল, তখন বেলা বারোটা বাজতে আর বেশী বাকি নেই। চটিতে আগে থেকেই শতরঞ্চি বিছানো ছিল। পা থেকে জুতো জোড়া খোলবারও বৃথা চেষ্টা না করে সটান শুয়ে পড়লাম। বিলিতী ফেল্টের টুপিটা টেনে দিলাম ক্লান্ত চোখের উপর। পৃথিবীর আলো তাতে ঢাকা পড়ল, প্রাণ বাঁচল। মুহূর্তমধ্যে অবসন্ন দেহ নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়ল।

কতক্ষণ পরে স্মরণ নেই, তেল মেখে স্নান করতে যাবার জন্যে নীলমণি আমায় ডেকে তুলল। এইটুকু বিশ্রামেই দেহ ইতিমধ্যে কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়ে উঠেছে, যদিও সজীব নয়; মন বেশ আত্মবিস্মৃত। তারাদাও দেহে তেল মাখছিলেন। সুশীল তার গরম র‍্যাপারের তলা থেকে এই উঠি-উঠি করছিল। আমাকে উঠে বসতে দেখে তারাদা তাঁর পুরনো রসিকতাটির পুনরাবৃত্তি করলেন: জানেন, আমাদের সুশীলচন্দ্র আজ ৯-কার হয়ে গেছে!

শুধু নন্দ ঘোষকে আর দোষ দিয়ে কি হবে! ডিগবাজি যে খাচ্ছে না সেই মহাপুরুষকে প্রথম ঢিল ছুঁড়তে বলুন। আমার অন্তত সেই অধিকার নেই।—বলে অতি সন্তর্পণে পায়ের পট্টি খুলতে লাগলাম।

আমার আছে। তবে, হে আওরঙ্গজেব, আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম। ঈশ্বরের অভিশাপের উপর আমি আর শাকের আঁটি চাপাইব না। জনান্তিকে, আমার স্মরণশক্তি বড় কম। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!—কথাগুলো নীলমণি তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে একাধিকবার নতজানু হয়ে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গীসহকারে এমনভাবে বলল যে, আমরা সবাই হতবাক হয়ে রইলাম। এর দেহ কি হাড়মাসের নয়, না, এ দেবতা বা দানব!

আর যাই হোক আমাদের মত মানুষ ও নয়, এবং ওকে ঘৃণা না করবার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট। ওর পেছনে পেছনে নির্ভয়ে উষ্ণকুণ্ডে চলে এলাম।

কেদারনাথ যাবার পথে যখন এই উষ্ণকুণ্ডে স্নান করেছিলাম, তখন তা আরামপ্রদ লেগেছিল; ফেরবার পথে আজ স্নান করতে গিয়ে মনে হল, এ ধন্বন্তরী। প্রথমে গামছা ভিজিয়ে একটু একটু জল তুলে গায়ে আস্তে আস্তে কিছুক্ষণ সেঁক দিলাম। তারপর পাড়ে নিথর হয়ে বসে, জলে পা ডুবিয়ে একাগ্রমনে অসাড় পা দুটোয় চেতনা ফিরে আসবার অনুভূতিটা অনুভব করবার চেষ্টা করলাম। চোখ বুজতে হল।

কিন্তু চোখ বুজতেই আবারও চোখের সামনে সেই কেদারনাথ —মন্দির, পর্বত, পর্বত-গাত্রে সেই বাঁকানো অনির্দেশ্য পথ। আর ঠিক সেই প্রভা! যেমনটি দেখেছিলাম ঠিক তেমনটি নয়, আরও অনেক বেশী স্পষ্ট, অনেক বেশী গম্ভীর, অনেক বেশী আগ্রাসী, অনস্বীকার্য ও অবিস্মরণীয়। চোখ ধাঁধিয়ে যায়, তবু চোখ ফেরানো যায় না। বোধশক্তি হার মানে, তবু হাল ছাড়তে পারে না। অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ, কিন্তু তবু থমকে দাঁড়াতেই হয়। আশ্চর্য!

সেদিন বুঝতে পারি নি। তারপরেও, যতই নীচে নেমে এসেছি কেদারনাথের সেই দৃশ্য ততই স্পষ্টতর হয়েছে যদিও, তথাপি এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার কোন তাৎপর্যই ধরতে পারি নি। সমতলে নেমেও, আজও কেদারনাথের সেই দৃশ্য স্পষ্টতর হয়ে উঠছে, কিন্তু এর অর্থ কী তা আজও জানি নে। চোখ বুজলেই, টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল ঘোরাবার পূর্ব-মুহূর্তে, বা দেশলাই জেলে সিগারেটটি ধরাবার ঠিক আগে হঠাৎ চোখের সামনে দেখি সেই কেদারনাথ। তারপরই অত্যন্ত নগণ্য কোন কাজে অতিব্যস্ত হয়ে পড়ি, উটপাখি যেমন বালিতে মুখ লুকোয়। এর অর্থ কী, এর কারণ কী?

শুধু সৌন্দর্য? হ্যাঁ, অস্বীকার করব না যে, অমন নৈসর্গিক সৌন্দর্য আমি আগে যেমন কোথাও দেখি নি, তেমনি পরেও কোথায়ও দেখবার সম্ভাবনা অতি সামান্য। কিন্তু সংজ্ঞানুযায়ী সৌন্দর্য দর্শকচিত্তে যে অনুভূতি সঞ্চার করবে তা তো বিশুদ্ধ আনন্দের। কেদারনাথ যদি শুধু

সুন্দরই হত তবে, আমার রসবোধের সসীমতার কথা স্মরণ রেখেই বলছি, অত সাত-তাড়াতাড়ি আমি কেদারনাথ থেকে পালিয়ে আসতুম না।

কেদারনাথ নিঃসন্দেহে সুন্দর, কিন্তু শুধু সুন্দর নয়। কেদারনাথ ভয়ঙ্কর সুন্দর। যাত্রীর চিত্তে কেদারনাথ যে অনুভূতি জাগায় তা ভয়মিশ্রিত আনন্দ নয়, তা বরং আনন্দমিশ্রিত ভীতির। কিছুক্ষণ চোখ খুলে বা চোখ মুদে একদৃষ্টে শুভ্র-সমুজ্জ্বল কেদারনাথের দিকে তাকিয়ে থাক, আরও একটু তাকাও, আরও একটু—প্রথম দর্শনে মনে যে আনন্দ উপজাত হয়েছিল ক্রমে তা অধিকতর শক্তিশালী, সম্পূর্ণ অপ্রতিরোধ্য এক নূতন অনুভূতির সঙ্গে নিঃশেষে মিলিয়ে যাবে, আর এক মুহূর্ত চোখ ফিরিও না,—ক্রমে দেহের শিরা-উপশিরায় রক্তের চলাচল স্তব্ধ হয়ে যাবে, ঠিক ভয়ে নয়, কিন্তু সমস্ত দেহ বার বার কণ্টকিত হয়ে উঠবে। স্থির উপলব্ধি হবে যে, এ আমার, এ তোমার এ জগতের নিয়তি। তারপর আর কেদারনাথ চোখে পড়বে না,—না পর্বত, না মন্দির,—তখন শুধু কেদারনাথের গা বেয়ে একটি বাঁকা পথ চলে গেছে, মহাপ্রস্থানের পথ। আর অপূর্ব প্রভা, আর তারপরই ভাস্বর শূন্যতা।

আমার বেলায় তার ঠিক পরেই ননী ও তারাদার বিবাদ বেধেছিল। আজও হয় ঠিকমত টেলিফোনে কানেক্‌সন পেয়ে যাই, নয়তো সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়ি। ওই অনুভূতির সম্পূর্ণ স্বরূপ আজও আমার অজানা।

নয়

গৌরীকুণ্ড থেকে নেমে আসছি। একঘেয়ে উতরাই পথ। উষ্ণ কুণ্ডে অবগাহন ও দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রায় দেহ যতটুকু বা সুস্থ হয়েছিল, মাইল খানেক অতিক্রম করতে না করতেই তার স্মৃতিটুকুও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেছে। আবারও দেহ ক্লান্ত, মন তিক্ত, প্রাণ অবসন্ন, আশা হত, পথ নির্দয়, মানুষ শত্রু, আমি ঘৃণ্য, পরিপার্শ্ব সমবেদনাহীন কুৎসিত হয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে তবু নিঃশব্দে পথ বেয়ে নেমে আসছি। কাকে গাল দেব, গাল শোনবার কে আছে ?

মনে পড়ছে, কেদারনাথে ওঠবার সময় এই শোণপ্রয়াগ কি অপূর্ব রমণীয় ছিল! মন্দাকিনী ও বাসুকী আজও সগর্জনে এসে মিলিত হচ্ছে, আজও দূর থেকে তুষার-শিখরের বিন্দুটি উঁকি দিচ্ছে; উপরের অনতিপ্রশস্ত আকাশ আজও মেঘমুক্ত আর শোণপ্রয়াগ ছায়াচ্ছন্ন। এমন কি চা-ওয়ালার সস্মিত আপ্যায়নটুকু পর্যন্ত অটুট আছে। তথাপি কী যেন হারিয়ে গেছে, যার অভাবে আজ আর কিছুই দু'বার দেখবার মত নয়, সব-কিছু শ্রীহীন। হিমালয় সেই হিমালয়ই আছে; যদি কিছু পরিবর্তিত হয়েই থাকে তো সে আমার দৈহিক অবস্থা, যদি কিছু পরিবর্জিত হয়ে থাকে তবে তা মানসিক প্রত্যাশা, যদি কিছু পরিবর্ধিত হয়ে থাকে তবে তা আমারই দেহ ও মনের অবসন্নতা। মানে, যা-কিছু বিকার সব ব্যক্তিগত, অথচ তবু হিমালয় যেন চুড়ো নীচের দিকে করে দাঁড়িয়ে আছে। ভাববাদের অনস্বীকার্য যুক্তিযুক্ততায় মর্মাহত হতে যাব, এমন সময় তারাদা ছুটতে ছুটতে উতরাই নেমে এলেন। মৃদু হেসে বললেন, কী হল, বসে পড়লেন যে ?

একটু ভেবে, ঠোঁট উলটে হাতের গেলাসটি দেখিয়ে বললাম: চা-পানার্থে।

আর কী, পায়ের ব্যথা?

পায়ের ব্যথাও; তবে সেটাও প্রাথমিক বা প্রধানতম কারণ নয়।

তবে প্রথম এবং প্রধান কারণটির কথা শুনতে পারি কি?

সেটি, সংক্ষেপে, কেদারনাথের প্রবঞ্চনা।

সে কি! কী থেকে?

কী থেকে তাই যদি জানব, তবে আর প্রবঞ্চিত হব কেমন করে!

কী থেকে প্রবঞ্চিত হয়েছেন তাই যদি না জানলেন, তবে আদৌ যে প্রবঞ্চিত হয়েছেন তা জানলেন কেমন করে?

মন বলছে, এবং মন হয়তো মিথ্যে বলছে না।

ওই বাচালটার কথা ছেড়ে দিন।

কিন্তু ওকে ছাড়লেই কি আর ও ছাড়ে!

কিন্তু হিমালয়ে এসেও নিজের ভাবনা নিয়েই থাকবেন?

ওই ভাবনার তাড়নাতেই হিমালয়ে এসেছি, আজ কি অকৃতজ্ঞের মত ওকে ত্যাগ করা চলে?

ও কিন্তু বড় সাংঘাতিক সহযাত্রী। কখন যে কোন্ অতলে নিয়ে যাবে জানতেও পারবেন না।

তা হয়তো ঠিক। তবু এইটুকু অন্তত নিশ্চয়ই জানব, এইটুকু সান্ত্বনা অন্তত নিশ্চয়ই থাকবে যে, নিজেকে কখনও হারাই নি।

নিজের মনের মধ্যখানটিতে নিজেকে বসিয়ে রাখলেন, কেদারনাথের আর সেখানে স্থান হল না।

কেদারনাথ যদি আমাকে মেনে নিতে না পারে, তবে কেদারনাথকেও আমার প্রয়োজন নেই।

এই মেনে নেবার ব্যাপারে কিন্তু দু পক্ষেরই আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। আমার ধারণা, আপনি বড় ক্লান্ত ছিলেন, কেদারনাথের দিকে মুখ তুলে চাইবার মানসিক সামর্থ্যটুকুও আপনার ছিল না।

আমি আদৌ ক্লান্ত ছিলাম না এ কথা বলা মিথ্যা অহমিকা হবে। তবে ওই ক্লান্তিটুকু, মানসিক অবসন্নতাটুকু অপনোদন করবার ক্ষমতাও যদি কেদারনাথের নেই, তবে এত পথকষ্ট সহ্য করে এতদূর আসা কেন ?

এরপর তারাদা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। একটা সিগারেট চেয়ে নিলেন। বার কয়েক টান দিলেন সিগারেটটায়। অনেকক্ষণ পরে আবার বললেন—একটা কথা বলব কিছু মনে করবেন না ?

মন বেচারার নড়ে বসবার সামর্থ্য নেই, তার পক্ষে কিছু করা আরও সুদূরপরাহত। যা মনে আসে বলতে পারেন। আমি একটু ম্লান হাসবার প্রয়াস পেলাম। ক্রমে ক্রমে অবস্থা এমন স্তরে এসে পৌছেছে যে নিরীহ একটু রসিকতা করতে গেলেও সঞ্চিত তিক্ততা তার কণ্ঠরোধ করে ধরে। সামান্য রসিকতা যেন আর্তনাদের মতো শোনাল। তবুও ম্লান একটু হাসলাম।

এ-ধরণের অভব্য রসিকতায় আমোদিত হওয়া তারাদার স্বভাব নয়। তিনি অভিজ্ঞ নাবিক ; গাম্ভীর্য বজায় রেখে সন্তর্পণে সিগারেটটার ছাই ঝেড়ে বললেন—দেখুন, আপনার ওই আত্ম-সচেতনতা আর বিশ্লেষণ-প্রবণতা সংজ্ঞানুযায়ী যত মহৎ গুণই হোক না কেন সে-মহত্ত্ব দেশ কাল নিরপেক্ষ নয়। সেই প্রচলিত প্রবচনটা জানেন তো যে, একজনের রুটি অপরজনের বিষ! কথাটা স্থান এবং কাল সম্পর্কেও সত্য। আপনার পক্ষে বিশ্বাস করা সম্ভব হবে না, তবু আপনি বলেই বলছি।—মানুষের সজ্ঞান চেতনার বাইরেও একটা জগৎ আছে। একটা বিরাট শক্তি। নিজেকে নিজের চেতনার গণ্ডিতে আবদ্ধ রাখলে সে-জগৎ অনাবিষ্কৃত থাকে, সে শক্তি সুপ্ত থাকে। আত্ম-সচেতনতার জীর্ণবাস ত্যাগ না করলে সে জগতের হাওয়া গায়ে লাগে না, সে শক্তি উদ্বুদ্ধ হয় না। তাছাড়া জানেন তো পশু জন্ম থেকেই পশু, আর মানুষ হয়ে উঠলে তবে মানুষ। সেই জগৎ যার অনাবিষ্কৃত রইল, সেই শক্তি যার সুপ্ত রইল তার দুটো হাত দুটো পা থাকতে পারে, কিন্তু সে মানুষ নয়। তার জন্ম বৃথা।

তারাদার সুসমাচার শেষ হতে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। আজ মনে হয় যে অমন গুরুগম্ভীর উক্তির উপযুক্ত প্রত্যুক্তি হ'ত যদি

বলতাম, আপনি এই বিবর্তনের কোন স্তরে আছেন, তারাদা? কিন্তু কী যে সেদিন হয়েছিল এই সহজ উত্তরটি মাথায় আসেনি। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার পর বললাম—নিজের সঙ্কীর্ণ জগৎটুকুই পুরোপুরি জরীপ করে উঠতে পারছি না, বৃহত্তর কোন জগৎ যদি থেকেই থাকে তাহলে সেই প্রবাসে এই অভাগা কী করবে। যেটুকু শক্তি আছে সেটুকুই নিয়োগের ক্ষেত্র নেই আরও শক্তি দিয়ে আমার কি হবে!

কিন্তু আমার একটি কথাও তারাদার কানে গেল বলে বোধ হল না। যেন পূর্বকথারই জের টেনে তিনি বললেন—সে জগতের পরিপ্রেক্ষিত ব্যতিরেকে এ-জগত অর্থহীন অন্ধকার। সে-শক্তি যদি সুপ্ত থাকে তবে মানুষের ক্ষুদ্র শক্তি কেবল মানুষকেই নিষ্পেষিত করে।

আমি হেসে উঠলেই সেটা প্রকৃতিস্থ হত। কিন্তু বিপর্যস্ত বোধ করলাম; অজানা সাগরে পাল ছেঁড়া হাল ভাঙা নৌকোর মতো।

দু-চারজন যাত্রী চড়াই বেয়ে উঠে গেল; দু-চারজন যাত্রী উৎরাই পথে নিরুদ্দেশ হল। কিন্তু তারাদার আবেগ তখনও নিঃস্ব হয়নি। তিনি আবার বললেন—আর আপনার ওই বিশ্লেষণ-প্রবণতা, চুল-চেরা বিচার করে প্রতিটি অভিজ্ঞতার মূল্য যাচাই করা—ওইটে আপনার দ্বিতীয় কালব্যাধি! একে তো নিজেকে নিজের সজ্ঞান চেতনার দুর্গ-প্রাকারে বন্দী করে রেখেছেন, তবু যদি কোন ছিদ্র পথে বাইরের আলো অনুপ্রবেশ করে তবে তার জন্যে মোতায়েন রয়েছে ওই বিশ্লেষণ-প্রবণতার অতন্দ্র প্রহরী! প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কোথাও কণামাত্র ত্রুটি নেই। চট্‌কে চট্‌কে হিমালয়কে পর্যন্ত তিক্ত করে ফেললেন, অথচ হিমালয়ের সঙ্গে আপনার ক'দিনের কতটুকু পরিচয়! আমার একটা কথা রাখুন, কয়েকটা দিনের জন্য নিজেকে একটু ছেড়ে দিন—দেখবেন আপনার কেদারনাথে আসা ব্যর্থ হয় নি, নিরর্থক হবে না। তাছাড়া জানেন তো যে শ্রদ্ধা সৌহার্দ্য প্রেম এই সব সহজভাবেই গ্রহণ করতে হয়, নইলে—

কিন্তু তারাদার মুখে ঐ 'প্রেম' কথাটি শুনেই আমি তখনকার মতো রক্ষা পেয়ে গেলাম। আর মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে ফিক্ করে হেসে

ফেললাম! কিন্তু সে-কথা যথাসময়ে। ইতিমধ্যে তারাদার কথা শুনতে শুনতে নানান চিন্তা মাথায় খেলছিল। সত্য কথা বলতে কি, বক্ষ্যমাণ বিষয়গুলো সম্পর্কে তারাদার সঙ্গে আমার মৌলিক কোন মতদ্বৈধতা ছিল না। আমার আত্ম-সচেতনতার গভীরতা, আমার বিশ্লেষণ-প্রবণতার মূল্য—সব কিছুই আমার ভালোভাবে জানা ছিল। সেই জানাটাকে বিশ্বাসের স্তরে উন্নীত করবার চেষ্টাও আমি হরিদ্বার থেকেই করে আসছি। কিন্তু তবু তারাদার সুসমাচার শুনতে শুনতে শেষ পর্যন্ত আমার বিরাক্ত ধরে গেল। বসে বসে এই সব শ্রুত-কথা শুনে আমার কী লাভ! এতে করে কি আত্ম-বিবর থেকে বেরিয়ে আসা সহজতর হবে? বাল্যের সেই প্রথমভাগ থেকে নীতি-বচন শুনে শুনে কান তো ঝালাপালা হয়ে গেল কিন্তু তবু আমি আজ এমন বিভ্রান্ত কেন? আপন সর্বজ্ঞতার ভ্রান্তি আমার অনেক দিন আগেই টুটে গেছে, পরিবর্তে এইটুকু অন্তত নিশ্চিতরূপে জেনেছি যে উপদেশে আর নীতি-বচনে জগতের কারুরই কিছু এসে যায় না! মানুষ হয়ে জন্মাবার—সেই আদিগতম অপরাধের যেমন পরিণতি, প্রত্যেককে প্রতিটি সত্য নিজের অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ধার করতে হবে। লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে নিজের পায়ে হেঁটে। এহেন যাত্রায় অপরের সাহায্য নিছক বিড়ম্বনা। তারাদার সঙ্গে আমার মতের এমন অমিল নেই যে প্রতিবাদ করে তাঁকে থামিয়ে দেব, কিন্তু তাঁর সুসমাচার শুনতে শুনতে আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল।

এমন সময় তারাদা হঠাৎ 'প্রেম' শব্দটি উচ্চারণ করতেই ফিক্ করে হেসে ফেললাম। বললাম—তবে আপনার প্রেসক্রিপশনটা কিন্তু খুব নিরাপদ নয় তারাদা। সজ্ঞান চেতনার প্রাকারে যদি নিজেকে সুরক্ষিত না রাখতাম তাহলে হয়তো নাগরিক সাচ্ছন্দ্যের অক্টোপাশ আমাকে রেহাই দিত না। আর ওই বিশ্লেষণ-প্রবণতাটুকু না থাকলে হয়তো ছোট্ট একটা ফ্ল্যাট ঘর ও তৎসহ ছোটখাটো একটি বউ নিয়েই তুষ্ট থাকতাম! হিমালয়ের সঙ্গে—আপনার অপর অনির্দেশ্য জগতের সঙ্গে তাহলে হয়তো এই মৌখিক আলাপটুকুও হত না!

তারাদা আমার এই শ্লেষোক্তির কোন জবাব দিলেন না। নিজে থেকেই আরেকটা সিগারেট ধরালেন; নিজে থেকেই

চা-ওয়ালাকে দু-গেলাস চা দিতে বললেন। আমিই আবার বললাম— আচ্ছা, আপনি কি এতক্ষণ কেবল এই অধমকেই পথ দেখাবার চেষ্টা করছিলেন, না অন্য কোন গূঢ়তর উদ্দেশ্য ছিল ?

গূঢ়তর উদ্দেশ্য !

হ্যাঁ, যেমন নিজেকে ভোলানো বা ঐ ধরণের কিছু।

তারাদা অমন পূর্ণাবয়ব তারাদা না হলে এ-কথায় হয়তো কথঞ্চিৎ মর্মাহত হতেন। পরিবর্তে তিনি হেসে ফেললেন। সেই সহজ সরল অকপট হাসি।—আমার চোখে আবারও যা অত্যন্ত অগভীর ঠেকল। হেসে তিনি বললেন—কি জানি, আপনার মত বাতিকগ্রস্ত তো নই, তায় আবার অতসী কাঁচটাও সমতলে ছেড়ে এসেছি। কখন যে কী বলি আর কেন বলি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। যা মনে আসে তাই বক্ বক্ করে বলে বসে থাকি !

এইবার আমিও হেসে ফেললাম। কিছুক্ষণ পরেই দেখি কিছুক্ষণ আগেকার সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত ভুলে দুজনে আবার নানান বৈষয়িক রসিকতায় মেতে উঠেছি ! কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেদিন সম্পূর্ণরূপে নজর এড়িয়ে গেছে। আমার ঐ সকল ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে অমন অকপট আলোচনা করবার কোন অধিকার তারাদার আছে কি না সেকথা সেদিন একবারও মনে হয়নি ! তারাদার রূঢ় আঘাতে আহত হয়েছি, কিন্তু সে আঘাত বৈধ কি অবৈধ তা একবারও ভেবে দেখিনি। একজন ব্যক্তির আভ্যন্তরীন ব্যাপারে অমন উদ্ধত হস্তক্ষেপে মদীয় রাজনৈতিক সতীর্থ হয়তো ভ্রূ-কুঞ্চিত করবেন। তাঁদের অবগতির জন্য বলা প্রয়োজন যে, আমাদের ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য হয়তো ততটা অনড় নয় !

এর পর দুজনে কিছুক্ষণ নীরবে চা পান করলাম। অবশেষে আবার যখন পথ ধরবার সময় আসন্ন হল, তখন তারাদা বললেন, একটা পরামর্শ দেব, কিছু মনে করবেন না।

অপর গালটি তো প্রসারিতই আছে, দিন না।

আপনার দেহের ক্লান্তি আপনার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আপনি বরং একটা ঘোড়া নিন।

না, ঘোড়া আমি নেব না। মনটা সম্পূর্ণরূপে দেহাতিরিক্ত কিছু বলে আমি বিশ্বাস করি না,—হিমালয়কে যদি গ্রহণ করতেই হয়, ভালবাসতেই হয় তবে তা সমগ্র সত্তা দিয়েই করব। অতএব যদি আমি যাই তবে পায়ে হেঁটেই যাব। তবে যাব কি না, সেইটি ভেবে দেখতে হবে।

আবারও ভাবনা ?

বলেছি তো, ও আমার স্বর্গের কুকুর।

দেখবেন, ও-ই শেষ পর্যন্ত আপনার স্বর্গ-প্রবেশের অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়!

দুজনে আবার পথ হাঁটতে শুরু করলাম। একটু পরেই তারাদা আমায় ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন। উৎসাহহীন মন ও অবসন্ন দেহের দুর্বহ বোঝাটিকে কোনক্রমে বহন করে ধীরে ধীরে আমি এগুতে লাগলাম। পথ আর এখন ক্রমাগত উতরাই নয়—মাঝে মাঝে চড়াইও। উতরাই পথে চিন্তা করবার অবকাশ মেলে না, চড়াই পথে চিন্তা অপরিহার্য। সুযোগ পেয়ে কুকুরটারও উৎপাত বেড়ে গেল।

যেমন আনন্দের বেলায়, অভাবের বেলায়ও ঠিক তেমনই। আনন্দের বিষয় ও কারণটিকে ভাষাবদ্ধ না করা পর্যন্ত যেমন আনন্দোপভোগ সম্পূর্ণ হয় না, তেমনই অভাবটা বা অভিযোগটা যতক্ষণ পর্যন্ত ভাষায় গ্রথিত না হয় ততক্ষণ তা দুঃসহ হলেও অসহ নয়। ব্যাধি মাত্রেরই আধি একটা আছেই। শোণপ্রয়াগে তারাদার সঙ্গে বাক্যালাপের পর আমারও মনের ভিতরকার সুপ্ত অভিযোগটি জেগে উঠল দেহের ক্লান্তিতে প্রশ্রয় পেয়ে।—যেতে কি আমাকে হবেই ? দাসখত লিখে দিয়েছি কি ? কিসের সন্ধানে কেদারনাথে এসেছিলাম তা আজও জানি না। তবে এইটুকু জানি যে, শুধু দেখতে বা ফিরে গিয়ে বন্ধু-মহলে বাহবা লুঠবার অভিপ্রায়ে আসি নি। আর জানি, যে অজানা উদ্দেশ্যে আমার আগমন তা সার্থক হয় নি। তা নিশ্চিত ব্যর্থ হয়েছে। তবে বদ্রীনাথে যাব কিসের আশায় ? বদ্রীনাথে যেতে হলে এই ক্লান্ত অবসন্ন দেহ বহন করে দুর্গম চড়াই-উতরাই পথে আরও প্রায় শ-দেড়েক মাইল হাঁটতে হবে, সেই একই পার্বত্য নৈসর্গিক দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। আর পৌঁছেও হয়তো দেখব কেদারনাথেরই মত সমাধিস্থ বদ্রীনাথ, ডেকে বসাবার, হেসে কথা কইবার সময় যাঁর নেই। তবে ?

চিন্তার গতি যতই দ্রুততর হচ্ছিল, চলার গতি ততই মন্থর হয়ে পড়ছিল। একে একে অনেকেই আমাকে অতিক্রম করে গেল। কর্ণেল-পত্নী গেল, কর্ণেল-কন্যা গেল; এবং অবশেষে ক্লান্ত কিন্তু রক্তিম হাসি হেসে আমাদের ননীবাবুও গেল। আরও কিছুদূর এগিয়ে দেখি, পথিপার্শ্বে সুশীল বসে আছে।

কী হল, বসে পড়লেন যে?—বলে আমিও ওর পাশেই একটা প্রস্তরে আসন গ্রহণ করলাম।

ঠোঁট উলটে, ভ্রূ-কুঁচকে, মুখ বিকৃত করে সুশীল জবাব দিল, হিমালয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখবার জন্যে যে নয় তা তো বুঝতেই পারছেন।

তবে?

নিজেকে দুটো গাল দিয়ে নিচ্ছি।

বেচারা তো এমনিতেই যথেষ্ট কষ্ট পাচ্ছে, আবার গালাগাল কেন?

কষ্ট পেয়েছে, কিন্তু শিক্ষা পায় নি।—আপনার হাল কী রকম?

তথৈবচ, হয়তো ততোধিক মন্দ।

সুশীলের নিষ্প্রভ চোখ দুটো হঠাৎ চকচক করে উঠল। আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, চলুন না দাদা, আমরা দুজনে দুটো ঘোড়া নিই। তারাদার মত পুণ্য করতে তো আর আমরা আসি নি যে আমাদের পাপ হবে। তা ছাড়া এতে লজ্জারই বা কী আছে? দেহকে কষ্ট দিয়ে যারা বাহাদুরি নিতে চায় আমরা তো তাদের দলে নই।—আর দেখে নেবেন, আমরা ঘোড়া নিলে একে একে সব শর্মাই খোঁড়া হবে। হেঁ-হেঁ।

না, ঘোড়া আমি নেব না। যদি যাই তবে পায়ে হেঁটেই যাব। তবে যাব কি না সেইটে ভেবে দেখতে হবে।

সে কি মশাই, শেষটায় আপনারও ধর্মে মতি হল দেখছি—জয় কেদারনাথ!

জয় কেদারনাথ! তবে ধর্মে মতি আমার হয় নি। আমি তো আর ব্যাধের মত সামান্য জীবহত্যাকারী নই, আমি হচ্ছি আত্মহন্তা; ধর্মে মতি আমার হবে কোথা থেকে?

তবে যে বড় বললেন, ফিরে যাবেন তবু ঘোড়া নেবেন না?

না, ঘোড়া আমি নেব না। যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, গাল বাড়িয়ে তাঁর হাতের চড় খেতে যাব কোন্ দুঃখে! অনস্তিত্ব ঈশ্বরকে এই অজুহাত দেখাবার সুযোগ কেন দেব যে, ঘোড়ায় চড়ে দর্শনী ফাঁকি দিয়েছ বলে আমার দর্শন পাও নি, আমার অস্তিত্বের স্পর্শ থেকে বঞ্চিত হয়েছ? না, আমি বরং ফিরে যাব।

মাঝপথ থেকে ফিরে গিয়ে সমাজে মুখ দেখাবেন কেমন করে?

নিজেকে অন্তত নিঃসঙ্কোচে দেখাতে পারব।

সুশীল বসে রইল। আমি আবার পথ ধরলাম। সূর্য পশ্চিম-গগনে হেলে পড়েছে। পথে পর্বতের ছায়া। মৃদু বাতাসে অরণ্যানী মরমর করছে, মাঝে মাঝে শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে পথের উপর। দূরে তুষারশিখর রঙিন হয়ে উঠেছে, সামনে পর্বতরাজি আদিগন্ত একের পর এক সজ্জিত। সাপের মত পাহাড়ের গা বেয়ে আঁকাবাঁকা উচুনীচু পথ চলে গেছে। পিপীলিকার মত যাত্রীরা পথ বেয়ে চলেছে,—একা কিংবা সহযাত্রীত্বের অছিলায়। মানুষ যে কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য, এই পর্বতের পটভূমিতে তাকে না দেখলে তা বিশ্বাস হয় না। মানুষ যে কত দুর্বল, কত অসহায়, তা বুঝতে হলে তাকে দেখতে হয় এই অন্তহীন পথের মধ্যে।

বেশ দ্রুত হাঁটছিলাম। সুশীলের সঙ্গে ওই বাক্যালাপের পর নিজের দেহকষ্টের প্রতি একটা নির্দয় ঘৃণা উপজাত হয়েছিল। অথর্ব পা দুটোর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেবার জন্যে বেশ দ্রুত হাঁটছিলাম। অসহ্য কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু তবু প্রতিহিংসার চরিতার্থতায় অদ্ভুত ক্রূর একটা আনন্দে মন ভরপুর। বাঁয়ে পড়ে রইল ত্রিযুগীনারায়ণের চড়াই, সকন্যা কর্ণেল-পত্নীকেও আবার পিছনে ফেলে ক্লান্ত-দেহ ও আশাহত মনটাকে চোখ-কান বুজে, টেনেহিঁচড়ে দ্রুতপদে এগিয়ে চললাম। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রশ্নটা চাপা পড়ল না, প্রতি পদক্ষেপে বার বার মনে হতে থাকল—যাব কি ফিরে যাব? যদি যাই, তবে আরও দেড় শো মাইল পার্বত্য পথ, আরও শতগুণ পথকষ্ট; পাও ফুলে কী হবে তা পা-ই জানে। এবং তারপরেও হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই—কেদারনাথের অনুরূপ ও তার চাইতেও সহস্রগুণ বেশী মর্মান্তিক হতাশা। কী হবে বদ্রীনাথে

গিয়ে! আর যদি না যাই, ভবিষ্যতে নিজেকে ক্ষমা করব কেমন করে? মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত কি কেবল এই কথাটাই বার বার মনে হবে না যে. শেষ পর্যন্ত যাই নি বলেই, দর্শনীটুকু পুরোপুরি দিই নি বলেই—নয়তো—! অতএব যাব, না, ফিরে যাব? আরও আরও তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকলাম।

আরও কিছুদূর এগিয়ে দেখি, ননীবাবু পথের পাশে একটি ঝরনার ধারে বসে বিশ্রাম করছেন। কুশল-জিজ্ঞাসা করবার মত অবস্থা তখন ছিল না, একটি পাথরের উপর অথর্ব দেহটিকে বসিয়ে আমি হাঁপাতে লাগলাম। একটু পরে ননীবাবুই ম্লান হেসে বললেন, দেখছেন পা দুটোর অবস্থা! কেমন মুখ গুমড়ো করে বসে আছে?

হুম্।

মনে হচ্ছে, পা দুটোকে কেটে বাদ দিয়ে দিতে পারলে হয়তো চলা সহজতর হত।

তার চাইতে পৈতৃক এই পা দুটোকে আরও ক্ষতবিক্ষত না করে, কোনক্রমে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই কি সমীচীন নয়?

প্রস্তাব শুনেই ননীবাবু চমকে উঠলেন, সে কি মশাই, কেদারনাথ দেখেই ফিরে যাবেন, বদ্রীনাথে যাবেন না?

কেদারনাথ দেখে কী এমন হাতী-ঘোড়া হয়েছে যে বদ্রীনাথে না গেলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

আপনি কি আশা করেছিলেন, কেদারনাথ থেকে সোজা স্বর্গে উঠে যাবেন?

না, তেমন আশা করবার স্পর্ধা নেই; তবে আবার নরকে ফিরে যেতে হবে এমন আশঙ্কাও করি নি। আপনি কি কেদারনাথ থেকে ফিরে নিজেকে একটু সমৃদ্ধতর বোধ করছেন?

অতিক্রান্ত পথের দিকে চেয়ে ননীবাবু চুপ করে রইলেন! একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে আমিও চুপ করে বসে রইলাম, তারপরে একটা সিগারেট ধরালাম। একটু পরেই কর্নেল-পত্নী ও কর্নেল-কন্যা আমাদের অতিক্রম করে গেলেন। ননীবাবু উঠে দাঁড়িয়ে, সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, আমিও চলি।

নির্বোধের মতো একটু হাসলাম। হাত নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আমি নির্বোধের মতো একটু হাসলাম।

ইতিমধ্যে কবে এবং কখন থেকে যেন আমাদের ননীবাবু ও কর্ণেল-তনয়ার মধ্যে একটা অনুচ্চারিত বোঝা-পড়া হয়ে গিয়েছিল। কেদারনাথের পরে আর ঘটনাটা কারো কাছে গোপন থাকেনি। সেই থেকে ননীবাবুর মেজাজ আর আগেকার মতো অনুক্ষণ তিক্ত-বিরক্ত থাকে না; মাঝে মাঝে তিনি একটু-আধটু উদাসও হন, কখনো হয়তো ফিক করে অকারণে একবার হেসেও ফেলেন। কবে যেন তিনি নীলমণির নিকট কবুলও করেছেন যে, আফটার অল কর্ণেল কন্যা না-কি দেখতে নেহাৎ মন্দ নয়! এই সকল রোমান্টিক ঘটনার জন্য কর্ণেল তনয়ার সাক্ষাৎ দায়িত্ব কতটুকু তা অনুমান করা অসম্ভব, তা অনুসন্ধান করাও বাহুল্য। তবে সে-প্রশ্রয় যতই নিরপেক্ষ হোক না, ভারত সরকারের স্থায়ী চাকুরে ননীবাবুর সেই সান্ত্বনাটুকুর প্রয়োজন ছিল। মাথা গুঁজবার এই দিবা-স্বপ্নটুকু না থাকলে, কে জানে—আমাদের আত্মনির্ভরশীলতার পরাকাষ্ঠা ননীবাবুর মাথাই হয়তো খারাপ হয়ে যেত। কেদারনাথের উদ্ধত রিক্ততায়, মুখর নৈঃশব্দ্যে আর নীরব অট্টহাস্যে হয়তো—, কিন্তু আরও কত কি যে আমাদের ননীবাবুর হতে পারত তা অনুমান করাই অসম্ভব! ঈশ্বরকে শুধু ধন্যবাদ যে সাধনার অতিরিক্ত কিছু পাবার সাধ্য আমাদের নেই। ননীবাবুর ইদানীন্তন তুষ্টিতে এই সিদ্ধি-লাভের নির্ভুল ছাপ ছিল। একমাত্র পরিতাপের বিষয় এই যে, কর্ণেল-কন্যা বিধবা নন—নিতান্তই কুমারী!

পর্বত-প্রদেশে সন্ধ্যা নেমে আসছিল। পর্বতের ছায়া দীর্ঘতর হয়ে কোথায় যে মিলিয়ে গেছে তা আর চোখে পড়ে না। হরিৎ অরণ্যানী কালো হয়ে উঠছে। উপত্যকার গভীরে গভীরে অন্ধকার জমেছে। দূরে তুষারশিখর যেন স্বপ্নে-দেখা আবছায়া স্মৃতি মাত্র। লাঠি হাতে নিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালাম। আজকের রাত্রিবাসের জন্যে নির্বাচিত চটি রামপুর পৌঁছতে আরও দেড় মাইল হাঁটতে হবে।

অবশেষে আমি স্থির করে ফেললাম: বদ্রীনাথ যাব না। যাত্রা আমার ব্যর্থ হয়েছে, এ যাত্রা সম্পূর্ণ হলে আমার ব্যর্থতাই শুধু সম্পূর্ণাঙ্গ হবে। ভবিষ্যতেও তা হলে আর কোন দিন এ পথে আসা হবে না।

আমি ফিরে যাব, তবে এ বিশ্বাস নিয়ে ফিরব না যে, তিনি নেই। এ কথা স্মরণ রাখব যে আমার সন্ধান সমাধা হয় নি, এবং সন্ধান আমায় করতেই হবে।

রামপুর চটিতে সেই রাত্রি আধো-ঘুম আধো-জাগরণে এক উদভ্রান্তির মধ্যে কেটে গেল। রাত্রিতে বার বার উঠে সিগারেট খেয়ে এই কথাটিই কেবল নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, ফিরে যাবার যে সিদ্ধান্ত আমি করেছি সেইটেই ঠিক। প্রভাতে যখন শয্যাত্যাগ করলাম তখন আপন সিদ্ধান্তের যুক্তিটা ঠিক বুঝেছি কি না বুঝলাম না, তবে অত্যধিক ক্লান্ত বোধ করলাম। বিছানাপত্র বেঁধে দিয়ে পথে নেমে এসে একটা চায়ের দোকানে বসলাম।

প্রভাত-আলোর প্রথম আনন্দরশ্মি তখন পর্বত-প্রদেশের শিরা-উপশিরায় অনুপ্রবিষ্ট হতে সুরু করেছে। দূরে তুষার-শিখর স্পষ্টতর হয়ে উঠল। উপত্যকার গভীরতম গভীরতা থেকে অন্ধকার কেটে চতুর্দিক আলোয় আলোময় হয়ে গেল। কিন্তু আমার মন তার চাইতেও গভীর আপন অন্ধকারে আচ্ছন্ন রইল। পর্বতসুন্দরীর পাশে আমি যেন পশু, পরিপার্শ্বের সৌন্দর্য উপভোগ করবার ক্ষমতা আমার আছে, কিন্তু উদারতা নেই। নাঃ, বদ্রীনাথ আমি যাব না।

আত্মক্ষোভে এবং আত্মগ্লানিতে পরিবৃত হয়ে সেদিন দুপুরে ফাটা চটিতে গিয়ে পৌছলাম, সন্ধ্যায় নালা চটিতে। এইখান থেকে বাঁয়ে চলে গেছে তুঙ্গনাথ হয়ে বদ্রীনাথের পথ, যে পথ আমার নয়। ডাইনে গুপ্তকাশী হয়ে রুদ্রপ্রয়াগের পথ, যেই পথ দিয়ে আসবার সময় ভেবেছিলাম বিশল্যকরণী আনতে চলেছি। ভগ্নদূতের মত কাল আমি সেই পথ দিয়ে ফিরে যাব। ফিরে যাব?

রান্নার তখনও অনেক বাকি ছিল। সাহায্য করে তারাদাকে ব্যস্ত করবার কোন প্রয়োজনই আজ আর বোধ করলাম না। চটি থেকে বেরিয়ে এসে একটা চায়ের দোকানের উননের সামনে বসে আগুন পোয়াতে লাগলাম। প্রজ্বলিত আগুনের দিকে চেয়ে সেদিন অনেকটা সময় মগ্ন হয়ে রইলাম, সাংঘাতিক কোন দার্শনিক চিন্তায় নয়, পুরনো সঞ্চয় নিয়ে আরও একবার ফিরে বেচাকেনায়! অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে দেখি, পাশে নীলমণি কখন এসে বসেছে।

স্থির করে ফেললাম নীলমণিবাবু, বদ্রীনাথ এবার আর আমি যাব না। এখান থেকে সোজা রুদ্রপ্রয়াগ গিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরব।

কিন্তু কথাগুলো যে ওকে বলা হয় নি, নীলমণি সম্ভবত তা বুঝল। আবার দুজনে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলাম। ধকধক করে উনুনের আগুন জ্বলতেই লাগল।

কী হবে গিয়ে? মনও বঞ্চিত হবে, দেহও কষ্ট পাবে। সঞ্চয় যদি বাড়াতে না-ই পারলাম, তবে কেন মিছামিছি এত মূল্য দিতে যাব? আপনি কী বলেন?

ঠিকই বলেছেন। তবু আপনাদের বেলায় শুধু সঞ্চয় কমিয়ে মূল্য দেওয়া, আমার বেলায় তো অর্থাগমের পথটিও বন্ধ করে সঞ্চয় থেকে মূল্য দেওয়া। আপনারা চাকুরি করেন, ছুটিতে আছেন, কিন্তু নামে মাইনে ঠিক জমা পড়ছে। আর আমি? শেয়ার বাজারের দালাল। ঘোরাঘুরি করলাম তো দুটো পয়সা এল, করলাম না এল না।—এবারের মত যথেষ্ট পুণ্যি হয়েছে বাবা, শুধু পুণ্যি চিবিয়ে তো পেট ভরবে না, বদ্রীনাথ রেখেও দেবে না পেটটিকে। আর থাকি হাওড়ায়, অত পুণ্যি রাখবই বা কোথায় মশাই! তার চেয়ে মানে মানে সরে পড়াই ভাল।—আপনি যদি ফিরে যান মশাই, তবে আমি আপনার সঙ্গী আছি জানবেন।

আমি কিন্তু তৎক্ষণাৎ সোৎসাহে 'চলুন' বলে লাফ দিয়ে উঠতে পারলাম না। নীলমণির সম্মতি পেয়ে মনটা যেন আরও দমে গেল। হাওড়ার নীলমণি ফিরে যাবে আমিও যাত্রাভঙ্গ করব? এ যে ননী ও সুশীলের মত সামাজিক কারণে পরিক্রমা সম্পূর্ণ করার চাইতেও হীনতর। নীলমণির প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে আমি চাওয়ালাকে দু-গেলাস চা দিতে বললাম। উনুনের আগুনটা যেন দপ করে আরও জোরে জ্বলে উঠল।

সে কি, অ্যাডভেঞ্চার করতে বেরিয়ে এ যে দেখছি একেবারে 'আরে আরে মারবি নাকি' ভাব! একেবারে হাল ছেড়ে দিলেন? দেও জী, মুঝকো ভি এক চা দে দেও।—বলে জনৈক অল্প-বয়স্ক সাধু হাসতে হাসতে আমার পাশে এসে বসলেন। সাধুর পরনে গৈরিক ধুতি ও ফতুয়া, মাথায় গৈরিক পাগড়ী। বয়স বেশী নয়, পঁচিশ কি ছাব্বিশ হবে; তবে

হঠাৎ দেখলে একটু বেশী বলেই মনে হয়। বর্ণ স্পষ্টই এককালে গৌর ছিল, এখন রৌদ্রে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে। শীর্ণাকৃতি দোহারা চেহারা, বড় বড় আয়ত চক্ষু। সাধু প্রিয়দর্শন। এর আগে এঁকে প্রথম দেখি রামপুর চটিতে, তার পরেও পথে একাধিকবার দেখা হয়েছে, কিন্তু কথা হয়নি। তিনি আবার একটু হেসে কৃত্রিম সমবেদনা জানিয়ে বললেন, পায়ে কি অসহ্য ব্যথা ?

সাধুর দ্বিতীয় প্রশ্নটাকে উপেক্ষা করে আমি ওঁর প্রথম অভিযোগটার জের টানলাম ; কেন না, অপর কোন নামে অভিহিত হবার অধিকার না থাকলেও স্রেফ অ্যাডভেঞ্চারার বলে নিন্দিত হতে আমি রাজী ছিলাম না। বললাম, আমাদের অ্যাডভেঞ্চারের কথা ছেড়ে দিন, যেমন কর্ম তেমন ফল পেয়েছি। থলেটা খুলে আপনার সঞ্চিত পুণ্যের পরিমাণটা একবার দেখাবেন কি ?

পুণ্য ! হাঃ-হাঃ, ঈশ্বরে কি আমি বিশ্বাস করি যে আমার আবার পুণ্য হবে ?

ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না ?

না-তো, করবার প্রয়োজনও বোধ করি নি কোনদিন।

তবে এই ভেক ধরেছেন কেন ?

ভেক বলেই। তা ছাড়া গেরুয়া রঙে চট করে ময়লা ধরে না।

তা হলে খাকী পরলেই পারতেন, ময়লা তাতে আরও কম ধরে।

কিন্তু খাকীর প্রতি দেশবাসীর যা শ্রদ্ধা মার খেয়েই মরে যেতাম। তার চাইতে গৈরিক পরাতে দু-বেলার ভাতের কথা আর ভাবতে হয় না—হয় এ ডেকে খাওয়ায়, নয়, ও ডেকে খাওয়ায়। হে-হে, ধর্ম জাহান্নমে গেছে বলে বুড়োরা যতই চেঁচাক, পরনে গেরুয়া থাকলে ভারতে ভাতের অভাব আজও হয় না।

তা নয় হল। কিন্তু আপনি যদি ঈশ্বরেই বিশ্বাস করেন না, তবে সাধু হতে গেলেন কেন ?

অসাধু কোন কালেই ছিলাম না বলে।

আপনি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেন। আমার জিজ্ঞাস্য ছিল—আপনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন কেন, যদি ঈশ্বরে আপনার প্রয়োজনও নেই ?

কিন্তু আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছি—এ কথা আপনাকে কে বললে? আমি তো সন্ন্যাসী নই।

তবে কি পরিব্রাজক?

না, তাও ঠিক নয়। আমাকে বরং—কিন্তু সেই শব্দটা বড় গুরু-গম্ভীর। উচ্চারণ করতে গেলে হয়তো দাঁতই ভেঙে যাবে। তাছাড়া আমার এই জীর্ণ শীর্ণ চেহারায় সেই রাশভারী পরিচয়টা ঠিক মানান সই হবে না!

কথা কয়টি বলেই সাধু হেসে ফেললেন, এবং সশব্দে চা-পান সুরু করলেন। মিষ্টতা বলতে যা বোঝায় সাধুর হাসিতে তার লেশমাত্র ছিল না; এমনকি একটু নম্রতা বা সরলতাও নয়। কেবল একটা বিচিত্র অন্তরঙ্গতা যার উষ্ণতায় উৎসাহিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার যার নৈর্ব্যক্তিক শীতলতায় স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। এ এক বিচিত্র সাধু। এঁর সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয়ের সুযোগই আমার হয় নি, তবে একে যতই দেখেছি বিস্ময়ে ততই হতভম্ব হয়ে গেছি। দৈনন্দিন জীবনের অকিঞ্চিৎকর কোন ঘটনার কথা বলতে বলতে অকস্মাৎ জীবনদর্শনের গূঢ়তম প্রদেশে অনায়াসে চলে যায়, আবার কখন যেন দৈনন্দিন জীবনের অকিঞ্চিৎকর ঘটনার কথা অত্যন্ত ঘরোয়া সুরে বলতে সুরু করে দেয়।—খুব সজাগ হয়ে না শুনলে এঁর কথার সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝে ওঠা সহজ নয়। স্মৃতি এবং শ্রুতি থেকে যে-সকল সাধুর চেহারা কল্পনা করতে পারি তাদের সকলের থেকে এ পৃথক। এঁর কাছে জীবনটাই মুখ্য, ধর্ম গৌণ; অভিজ্ঞতাই প্রধান, দর্শন একটা প্রয়োজনীয় হাতিয়ার মাত্র। ধর্ম ও দর্শন যেন নেহাৎই কষ্টি-পাথরের মতো; যার মৌলিক কোন মূল্য নেই। কেবল জীবন ও জীবনের অভিজ্ঞতার মূল্য নিরূপন করবার জন্যেই এই সবের যতটুকু প্রয়োজনীয়তা! এই বিচিত্র সাধুর সমস্ত কথা বুঝবার মতো পরিণত বুদ্ধি আমার সেদিনও ছিল না, তবে এইটুকু নিঃসন্দেহে বুঝেছিলাম যে, জীবনটাকে তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে বিবেচনা করেন। এতই গুরুত্বপূর্ণ যে সেই জীবনের চিন্তা পরিহার করে জীবনধারণও তাঁর কাছে একান্ত মূঢ়তা বলে মনে হয়েছে। কিন্তু কথায় কথায় ঘটনা অতিক্রম করে অনেকদূর চলে এসেছি।

সাধু সশব্দে গরম চা পান করছিলেন। মিটি মিটি হাসছিলেন, কিন্তু সে হাসিতে বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের অস্থির সন্ত্রস্ততা চাপা পড়ে নি। একটা নৈর্ব্যক্তিক সমবেদনা যেন বিকিরিত হচ্ছিল, একটা বন্ধনহীন অন্তরঙ্গতা, সুদূরাগত ঘনিষ্ঠতা! নিঃশেষিত চায়ের গেলাসটি নামিয়ে রেখে আমি আবার অনুনয় করলাম—সাধু নন, পরিব্রাজকও নন। বিষয়ী নন আবার উদাসীও নন। তবে আপনি কী?

সাধুর পাৎলা ঠোঁটে হঠাৎ একটু দুষ্টুমির হাসি খেলে গেল। আপনাদের শিক্ষিত সমাজের অতি-সচেতন ভাষায় যদি বলি, আমি সন্ধানী?

আমি চম্‌কে উঠলাম!

সন্ধানী! কিসের সন্ধানে ঘুরছেন?

সন্ধান না পেলে তো তার বিশদ বিবরণ দিতে পারব না। তবে সন্ধান-যোগ্য একটা কিছু যে আছে সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।—আস্থায়ী থেকে তিনি অনায়াসে আবার সমে উঠে গেলেন।

কিন্তু নালা চটি থেকে কাল সকালেই আমি আবার আমার ব্যর্থতার তিক্ত বোঝা নিয়ে রুদ্রপ্রয়াগে নেমে যাব; আমার বাঁয়ে পড়ে থাকবে বদ্রীনাথের পথ। অত সহজে মূর্চ্ছিত হবার স্বাস্থ্য আমার ছিল না। তাই আবার জিজ্ঞেস করলাম—

সেই পরশ পাথরটি কি হিমালয়ে লভ্য?

হিমালয়েও লভ্য। যেখানেই মানুষ আছে সেখানেই তা অল্প-বিস্তর লভ্য। তবে তার পুরোটা যে কবে কোথায় পাব বা আদৌ পাব কি না, তা আজও জানি নে; কোনদিন জানব কি না তাও অজ্ঞাত। ক্ষ্যাপার মত হয়তো তা পেয়ে সহস্রবার ছুঁড়েও ফেলে দিয়েছি।

এক গেলাস চা চলবে?

চলুক।

সিগারেট?

সানন্দে।

আচ্ছা, একটা অজ্ঞাত সত্যের সন্ধানে আত্মীয় স্বজন সংসার সব ছেড়ে এলেন, মনে তার জন্যে কোনও ক্ষোভ নেই? দোহাই আপনার, 'দেশে দেশে মোর ঘর আছে' বলে প্রশ্নটা এড়াবেন না যেন।

তা সত্যি আছে। কিন্তু তবু দেশের ঘরের জন্যে আমি যে বিশেষ ঘরটি ছেড়েছি সে কথা তাতে ঢাকা পড়বে না। আর ক্ষোভ? না, ক্ষোভ আমার নেই। যে ঘর আমি ছেড়েছি তা সম্পূর্ণ সজ্ঞানেই ছেড়েছি।

তাও একটা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত সত্যের সন্ধানে? যার আদৌ অস্তিত্ব আছে কি না তাই ঠিক নেই?

সন্ধান তো অজ্ঞাতেরই করতে হয়, জ্ঞাতের আবার সন্ধান কী?

কথায় কথায় সিগারেটের প্রথমার্ধ যথারীতি সেবন করা হয় নি, কথা থামিয়ে শেষার্ধটুকুর সদ্ব্যবহারে ব্রতী হলাম। চটির ব্যস্ততা এর মধ্যে স্তিমিত হয়ে এসেছে। অনতিদূর থেকে সেই বুড়ীর চাপা কান্নার রোল ভেসে আসছে। সেই হতভাগিনী বুড়ী প্রতি রাত্রে পরিত্যক্ত স্বামীর জন্যে কেঁদে মরে, সেই সৌভাগ্যবতী প্রতি প্রভাতে তীর্থোদ্দেশে স্বামী থেকে আরও দূরে সরে যায়। ধূসর আকাশের পটে কালো হিমালয়ের বক্ষে এরও সাক্ষ্য থেকে যাচ্ছে। মনে হয় অনন্তকাল ধরে থাকবে।

যেন অনেক কাল পরে, হিমালয়কে আজ অকস্মাৎ আবার বড় আপনার বলে মনে হল। আবার যেন সবাইকে খুঁজে পাচ্ছি, সবাইকে —সব কিছুকে অন্তরঙ্গ প্রিয়জন বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু আপনি আপনার বিশেষ গৃহ-সংসারটি কেন ত্যাগ করে এসেছেন সে কথা এখনও বলেন নি।

বলে শোনাবার মত রোমাঞ্চকর কাহিনী সেটা নয়। তার উপর সম্পূর্ণ নারীচরিত্রবর্জিত; এবং শিশুদের অভিনয়োপযোগীও নয়। সে কাহিনী শুনে কী করবেন?

আপনার আপত্তি থাকলে অবশ্য আর অনুরোধ করব না। তবে আমাদের রান্না শেষ হতে এখনও অনেক বাকী, আপনার দু-চারটে অভিজ্ঞতার কাহিনীই না হয় বলুন, শুনে সময়টা কাটাই।

ওরে বাবা, সে যে আরও শক্ত ফরমাশ! তার চাইতে আমার জীবনধারা পরিবর্তনের শেষ দিনটির কাহিনী শুনুন বলা সহজ হবে।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটল। কিছুক্ষণ মানে, ঘড়ির মাপে, বড় জোর মিনিট তিনেক। কিন্তু ইতিমধ্যেই কখন যেন সময়ের বিপর্যয় ঘটে গেছে; মনে হল, এই নৈঃশব্দ্য বুঝি অনাদি অনন্ত—হিমালয়েরই মত সমগ্র দেশকালপরিব্যাপ্ত।

আমি তখন কলকাতার এক সুবিখ্যাত আয়কর ব্যবহারজীবীর আপিসে সহকারীর চাকরি করি। নতুন চাকরি। মাস তিনেক মাত্র আগে বিহারের খনি-অঞ্চলের অন্য একটি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ভবিষ্যতের উন্নতির আশায় এসে যোগদান করেছি। মাইনে প্রথমটায় কম, কিন্তু ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি আছে। অতএব মনেপ্রাণে দিবারাত্র পরিশ্রম করি।

বিহারের জনহীন খনি-অঞ্চলে যখন চাকরি করতাম, তখন অবশ্যম্ভাবীরূপে কয়েকটি বদদোষ আমার চরিত্রে ঢুকে যায়। সেগুলোর প্রধানতম হচ্ছে আকাশ-বিচরণ। সমস্ত দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় নির্জন আবাসে ফিরে সম্ভব-অসম্ভব আকাশ-পাতাল কত কী যে ছাই ভাবতাম তার ইয়ত্তা নেই। তার মধ্যেও যার কথা তখন সব চাইতে বেশী ভাবতাম তিনি হচ্ছেন—হাসবেন না যেন—আমার অবিবাহিতা স্ত্রী।

বিহারের নির্জন খনি-অঞ্চলে পরিজনহীন ভাববিলাসী বাঙালী কেরানী, অবস্থাটা একবার বুঝে দেখুন। কল্পনায় সেই অবিবাহিত স্ত্রীর সাহচর্যে এক-একদিন রীতিমত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতুম। আবার এক-একদিন তার বিরহে মনে হত আমার জীবনই বৃথা, আমার মরণই ভাল। অথচ তাঁকে বিয়ের বাঁধনে বাঁধব এমন সামর্থ্য নেই। মাইনে মাত্র আড়াই শো টাকা। শুধু প্রেমসেবনে তো আর জীবন-ধারণ করা যায় না!

অতএব ওই চাকরি ছেড়ে নতুন চাকরি নিলাম। এখন না হোক, দু বছর পরে অন্তত বিয়েটা করা যাবে। এবং দু বছরে হয়তো একেবারে আইবুড়োও হয়ে যাবো না।

কিন্তু প্রায় বছর চারেক প্রবাসজীবনের পর আবার কলকাতায় ফিরে প্রাণ রাখা দায় হয়ে উঠল। বুঝতেই পারছেন, বিহারের জনমনুষ্যহীন খনি-প্রান্তরে অদৃষ্টপূর্ব, অবিবাহিত স্ত্রীর কথা ভেবে যে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে

উঠত, কলকাতার লক্ষ নারীর মধ্যে পড়ে তার কী অবস্থা? দিবানিশি—শয়নে জাগরণে আমার ওই এক চিন্তা, এক ধ্যান। যখনই সময় পেতাম, বা সময় করে নিতে পারতাম, তখনই হয় চৌরঙ্গীতে ঘুরে বেড়াতাম, নয় রাসবিহারী অ্যাভেন্যু ধরে ল্যান্সডাউন রোড ও গড়িয়া-হাটার মধ্যে ঘোরাফেরা করতাম। মনের মধ্যে সমস্ত সময় অস্বাভাবিক সব চিন্তা কীটের মত কিলবিল করত। কোন যুগল-দম্পতিকে দেখলে দেহের ভিতরকার শিরা-উপশিরায় রক্তধারা জ্বলে উঠত; কোন প্রেমিক-যুগলকে দেখলে নিজের ঈর্ষার বিষে নিজেই নেতিয়ে পড়তাম। তারই মধ্যে যখন মনে পড়ত যে, আরও কত বছর আমার সঙ্গীহীন ঘুরে মরতে হবে তার ঠিক নেই, তখন এক-একদিন আত্মহত্যার কথাও বিবেচনা করেছি।

তারই মধ্যে যখন আরও দেখতাম যে, যে যুবকটিকে চার বছর আগে পান চিবোতে দেখে গিয়েছি আজও সে সেই পানই চিবোচ্ছে মোড়ে দাঁড়িয়ে; যে যুবকটি ঘাড় বেঁকিয়ে সিগারেট কিনছিল তার সেই সিগারেট আজও কেনা হয় নি; চায়ের দোকানের সবাই এখনও সেই এক পেয়ালা করে চা নিয়েই বসে আছে; মন তখন একটা তিক্ত বিতৃষ্ণায় ভরে যেত।

আবার ওরই মধ্যে যখন হঠাৎ কখনও নজরে পড়ে যেত যে, দীর্ঘ চার বৎসরের অনুপস্থিতির পর ফিরে এসে আমি আবার সেই আমার অর্ধ-সমাপ্ত চায়ের পেয়ালাটি টেনে নিচ্ছি, অর্ধ-চর্বিত পানটি চিবোচ্ছি, তখন চমকে উঠে মনে হত, চলে যাই সব ছেড়ে দিয়ে। দেউলে সমাজে দেউলে হয়ে থাকার চাইতে ভবঘুরে জীবনও অনেক ভাল। এই সময়তে কলকাতা থেকে পদব্রজে বোম্বাই যাবার একটা বিশদ পরিকল্পনাও করেছিলাম,—একেবারে মানচিত্র সমেত।

কিন্তু এতকালের কামনা অচরিতার্থ থাকবে? অবিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয়টুকুও হবে না? দিন দিন ক্ষোভ বাড়তে লাগল, দিন দিন গ্লানি জমতে লাগল। কিন্তু তবু লেজে-গোবরে গড্ডালিকা-স্রোতে ভেসে চললাম।

এমন যখন অবস্থা, তখন একদিন—

তবে অবস্থাটার পূর্ণ পরিচয় কিন্তু আমি দিই নি। আমি শুধু অচলাবস্থাটির ব্যক্তিগত দিকটির কথাই বলেছি। এর সামাজিক,

অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক এবং সর্বশেষ কিন্তু সর্বপ্রধান ভৌগোলিক দিকগুলোর কথা বাহুল্য হবে বলেই আর বলি নি। কেন না, নিশ্চয়ই জানেন যে, কোন আদর্শের প্রতি জীবন উৎসর্গ করবার অধিকার আজকাল আর কোন বাঙালীর নেই। আজকাল বাঙালী শুধু পশুর মত সন্তানের জন্ম দিতে ও মরতেই পারে। আমার এমনই কপাল যে, এ দুটো অধিকারেরও প্রথমটা থেকে আমি বঞ্চিত, দ্বিতীয়টাও সুদূরপরাহত।

তা এমন যখন অবস্থা, তখন একদিন আপিসে এমন ভয়ানক কাজের চাপ পড়ল যে সকাল দশটা থেকে সন্ধ্যা পাঁচটা পর্যন্ত ডেস্ক থেকে একবার মাথা তোলবার সময়টুকুও পেলাম না। পাঁচটার সময় বেরুতে যাব, এমন সময় নতুন এক মক্কেল এসে উপস্থিত। মালিক হুকুম করলেন: কালকেই হিয়ারিং অতএব আজকেই, তা সে যত রাতই হোক, হিসেবটা দেখে রাখতে হবে। মনে আছে, মক্কেলের নাম—জে, এস, দেশাই; বোম্বাইওয়ালা কয়লাখনির মালিক। বসলাম তার হিসেব দেখতে। হিসেব দেখা যখন শেষ হল রাত তখন সাড়ে আটটা। দেহ ও মন তখন এতই ক্লান্ত যে তিক্ততা অনুভবের ক্ষমতাও আর নেই।

মক্কেল-সমভিব্যাহারে আপিস থেকে বেরিয়ে এলাম। মক্কেলেরও বাড়ি দক্ষিণ-কলকাতায়; আমাকে ওর গাড়িতে যাবার জন্যে অনুরোধ জানাল। বিনাবাক্যে উঠে বসলাম। দিনের বেলার ব্যস্ততার ঘূর্ণি তখন ডালহৌসি স্কোয়ার থেকে কেটে গেছে, কিন্তু স্থানটি যেন তখনও ঝিম ধরে আছে। রূপকথার মৃতপুরী ত্যাগ করে আমাদের গাড়ি অ্যাসেম্বলী হাউসের পাশ দিয়ে রেড রোডে এসে পড়ল। মক্কেল স্বয়ং গাড়ি চালাচ্ছেন, আমি পিছনের আসনে বসে আছি। গাড়িটার নাম আমি জানি না; তবে গাড়িটা যে অভিজাত সে তার চলন দেখেই বুঝেছিলাম। দূরে এসপ্ল্যানেডের আলোকসজ্জা ছবির মত দেখাচ্ছে; গঙ্গার শীতল হাওয়া হু-হু করে এসে চোখে মুখে লাগছে, প্রাণ-মন ঠাণ্ডা করে দিচ্ছে।—

কতটুকুই বা সময়! রেড রোড অতিক্রম করতে বড় জোর মিনিট পাঁচেক লেগে থাকবে। কিন্তু সময় যে কত সম্প্রসারণ ও সংকোচনশীল তা সেদিনই প্রথম জেনেছিলাম। বহু বৎসর ধরে শত চেষ্টা করেও যে

কথাটি ভেবে শেষ করতে পারি নি, ওই পাঁচ মিনিটকাল পরে সেই কথাটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে গেল।

গাড়িটি রেড রোডে পৌঁছতে দেহে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ লাগতেই প্রথমে মনে হল, নিজের একটা গাড়ি থাকা মন্দ নয়, বেশ হাওয়া খাওয়া যায়। তারপরেই মনে হল, তবে সঙ্গে স্ত্রীরও থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজন নয়, অপরিহার্য। বস্তুত স্ত্রী ও একটি গাড়ি ব্যতিরেকে নগর-জীবন তো অর্থহীন। তখনই আবার ভাবলাম, আচ্ছা, কবে আমার যুগপৎ গাড়ি ও স্ত্রী হবার সম্ভাবনা আছে? আগেই বলেছি, সেদিন অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম, অতএব আশাবাদীও। হিসেব করে দেখলাম শত চেষ্টা করেও সম্ভাবনাটিকে দশ বৎসরের এদিকে আনা যায় না। তাও যদি এই দশ বৎসর চোখ-কান বুজে মনে প্রাণে আয়কর স্বর্গ আয়কর ধর্ম মন্ত্র আওড়াই তবেই হয়তো তা সম্ভব।

বেশ, ধরে নেওয়া যাক, দশ বৎসর কাল অতীত হয়েছে। আরও না হয় ধরে নেওয়া যাক যে আমার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। এবং দশ বৎসর পরেকার আমি, আমার নবপরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে নতুন-কেনা গাড়িতে করে বেড়াতে বেরিয়েছি। স্মরণ রাখবেন, এই আমি কিন্তু দশ বৎসর পরেকার আমি, আর এই দশ বৎসর একমাত্র আপিসের কাজ ব্যতীত অন্য কোন দিকে নজর দেবার সময় আমার ছিল না। অর্থাৎ এখন আমার বয়স পঞ্জিকার হিসেবে পঁয়ত্রিশ হলেও আসলে পঁয়তাল্লিশ কিংবা তদূর্ধ্বে। বেশ কয়েকটি দাঁত পড়ে গেছে, চুল অধিকাংশই পাকা। চোখ দুটো অধিকতর কোটরগত হয়েছে, গাল দুটো গেছে তুবড়ে। চেহারায় আর সেই আগেকার সজীবতা নেই। উদরে অজীর্ণ মন্দাগ্নি অম্বল ইত্যাদি। সেই আমি চলেছি আমার নবপরিণীতা স্ত্রীকে নিয়ে!

অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম, তাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম না। ভেবে চললাম, মানে যখন আমার স্বপ্ন সার্থক হবে তখন আর চোখে কোন স্বপ্ন থাকবে না। মানে, যখন ভোগ করবার সামর্থ্য হবে তখন আর ভোগ করবার ক্ষমতা থাকবে না। হাতে যখন মূল্য সঞ্চিত হবে পণ্যের প্রয়োজন তখন ফুরিয়ে গেছে। তবে কেন মিছিমিছি মূল্য সঞ্চয় করতে যাব, বৃথা সাধনা করব? জীবন যদি না পেলাম তবে জীবন দিতে যাব কোন্ দায়ে?

সেদিন সমস্ত রাত্রি ঘুম হল না। বিছানায় একবার এ-পাশ একবার ও-পাশ করে ক্লান্ত হয়ে ছাদের ঠাণ্ডা হাওয়ায় গিয়ে বসলাম। একটু তন্দ্রা এসেছিল হয়তো। কিন্তু রাত্রির শেষ প্রহরে সেটুকু কেটে গেল। তখন দেখি, পূর্ব-গগন সূর্যোদয়ের আগে রক্তিম হয়ে উঠেছে। খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘ সূর্যরাগে রঙিন হয়ে পালতোলা নৌকোর মত স্বচ্ছন্দে বয়ে চলেছে। মাথার উপরে দেখি বিরাট আকাশ। সামনে সুদূর দিগন্ত। তক্ষুনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম, কাউকে কিছু না বলে।

আর বাড়ি ফিরি নি।

একটানা কথাগুলো শেষ করে বক্তা হঠাৎ থামলেন। ইনি সাধু নন, পরিব্রাজক নন, এমন কি আমাদের মতো ভব্য সভ্য ভদ্রলোকও নন; অতএব অন্তত যখন ইনি বলেন তখন এঁকে বক্তা বলাই নিরাপদ। একটানা আপন গৃহত্যাগের কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করে বক্তা অকস্মাৎ নীরব হলেন। মনে হল যেন অনন্তকাল থেকে তিনি কখনই কোন কথা বলেন নি। এই নৈঃশব্দ্য যেন নিশ্ছিদ্র নীরেট! বিনা জিজ্ঞাসায় একটা সিগারেট নিলেন, ধরালেন,—আস্তে আস্তে টেনে সিগারেটটি শেষ করলেন। তারপরে আবার যখন বলতে সুরু করলেন তখন আবার মনে হল যেন কোনকালেই কথার বিরতি ঘটেনি! নালা চটির চায়ের দোকানের উনানের আগুন ধক্ ধক্ করে জলতে থাকল। তিনি আবার বললেন—আমার জীবনের এই অন্তিম বাঁকটা সম্ভবত আপনার কাছে অত্যন্ত আকস্মিক মনে হবে—আসলে কিন্তু এর মধ্যে আকস্মিকতার লেশমাত্র নেই! এর আগে অনেক দিন থেকেই, সামাজিক জীবনের রুদ্ধ পরিবেশে যখনই শ্বাস বন্ধ হয়ে আসত তখনই ভাবতাম সব ছেড়ে বেরিয়ে গেলে কেমন হয়! আসলে এই সৃষ্টি ছাড়া চিন্তাটাই ছিল আমার সামাজিক ব্যাধির একমাত্র প্রতিষেধক। কিন্তু তখনও সেটাকে দিবাস্বপ্ন বলেই জানতাম; অবাস্তব কল্পনা বলেই বিশ্বাস করতাম! আর যেই সন্ধ্যার কথা আপনার কাছে এতক্ষণ ধরে এমন সবিস্তারে বর্ণনা করলাম, আসলে সেই সন্ধ্যায় নতুন কিছুই আবিষ্কৃত হয়নি! জানা কথাগুলোকেই কেবল সত্য বলে জেনেছি! এতদিন ভাবতাম যে এত ক্ষুধা এত তৃষ্ণা, এমন হতাশা ও বঞ্চনা—সব কিছু ছেড়ে

যাব বললেই কি সব কিছু ছেড়ে যাওয়া যায়, না ছেড়ে যাওয়া হয়! সব যে সব-কিছু পরিবৃত করে আছে, আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

কিন্তু একটি সন্ধ্যার সজ্ঞান অস্থিরতায় যখন সব কিছু পিছনে ছেড়ে বেড়িয়ে আসতে হল, তখন যেন এতকালের সমস্ত অনুসঙ্গ জীর্ণ বসনটির মতো অঙ্গ থেকে আপনি খসে গেল। আসলে আমরা যে-সব মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলোকে মনুষ্য-স্বভাবের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করে থাকি সে-গুলো যে কত অগভীর, কত ভিত্তিহীন তা ভাবলে হাসি পায়। কান্নাও পায়। একটি কোমল শয্যা, একজন শয্যা-সঙ্গিনী, দু-বেলার আহারের সংস্থান, একটু সামাজিক প্রতিপত্তি—এই সবই আসলে নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে মানুষের ভোজবাজী। সামান্য দূরে এসে দাঁড়ালেই সব ছায়ার মতো মিলিয়ে যায়।—একমাত্র প্রয়োজন আপন দুর্বলতাগুলো অতিক্রম করে একবার কেবল নিজের সঠিক অবস্থাটা দেখে নেয়া। তারপরে আর পথ খুঁজে মরবার দায় নেই। একমাত্র দায় নিজের পথটি ধরে এগিয়ে চলা।

বেশ আছি। অনুশোচনাও নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই। যখন যেখানে খুশী ভেসে বেড়াই। এখানে ভাল না লাগলে ওখানে চলে যাই।

কিন্তু ওখানেও যদি ভাল না লাগে?

ওখানেই তো পৃথিবীর শেষ নয়। তারও পরে অনেক জায়গা থাকে।

কিন্তু যেখানটা ভাল লাগল না, সেখানটায় কেন এসেছিলাম—সেই কথা ভেবে মনে অনুশোচনা হয় না?

তা কেন হতে যাবে? ওখানে তো আমি দায়ে পড়ে যাই নি, কোন কিছু প্রাপ্তির আশাতেও যাই নি তবে কেন আশাহত হব? আর দেখবেন, কোন কিছু আশা না করে গেলে সব দোরেই আশাতিরিক্ত পাওয়া যায়।

সেদিন সমস্ত রাত্রি চোখের পাতা দুটো এক করতে পারলুম না! শয্যায় একবার এ-পাশ একবার ও-পাশ ফিরে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে চটির চাতালে গিয়ে সিগারেট ধরালাম। রাত্রির সেইটে শেষ প্রহর। অনতিবিলম্বেই নবোদিত সূর্যের করসম্পাতে হিমালয়ের ধ্যানভঙ্গ হল।

গুপ্তকাশীর পথ ডাইনে ফেলে বাঁয়ে বদ্রিনারায়ণের পথেই আমি সেদিন নেমে এলাম।

দশ

যে সমস্যা নিয়ে এত চিন্তা এত ভাবনা এত গবেষণা, যে সমস্যা নিয়ে বিগত তিন দিন তিন রাত্রি ধরে নিজের সঙ্গে হিমালয়ের সঙ্গে এত বিবাদ, যে সমস্যাকে কেন্দ্র করে এত আত্মগ্লানি এত ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল, অবশেষে আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সেই সমস্যার নিশ্চিত সমাধান হয়ে গেল। নালাচটি থেকে আমি অনায়াসে বদ্রিনাথের পথ ধরলাম। আমার ডাইনে পড়ে রইল গুপ্তকাশী হয়ে রুদ্রপ্রয়াগে ফেরবার পথ। ক্রমে সে পথ পেছনে পড়ল, প্রতি মুহূর্তে দূরত্ব বাড়তে লাগল। অবশেষে সিদ্ধান্তটাকে পরিবর্তনেরও কোন সুযোগ আর রইল না। মন্দাকিনীতট পর্যন্ত উতরাই নেমে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহটাকে নিয়ে উখীমঠের চড়াইতে পাড়ি দিলাম নির্বিকারচিত্তে।

এই নির্বিকারচিত্ততার কথাটা বোধ হয় একটু ভাল করে বুঝিয়ে বলা দরকার। আমরা যাঁরা 'কোগিটো এর্গো সুম' এই সূত্রটিকেই আপন অস্তিত্বের একমাত্র অভ্রান্ত প্রমাণ বলে বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত, এই নির্বিকারচিত্ত শব্দটি শ্রবণমাত্র সেই বিদগ্ধজনদের ভ্রূ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বস্তুত আবেগহীন মানুষের কথা কল্পনা করাই শক্ত। মানুষ হয় সুখী নয় দুঃখী, হয় চিন্তিত নয় নিশ্চিন্ত, হয় রাগান্বিত নয় প্রীত, হয় রুষ্ট নয় তুষ্ট। জাগ্রতও নয় নিদ্রিতও নয়, বঞ্চিতও নয় পূর্ণও নয় এমন মানুষ কেমন করে সম্ভব? মানুষ তো শুধু আবেগজীবী নয়, আবেগসর্বস্বও। মানুষের চারিদিকে যেমন আবেগের দেওয়াল তেমনি আবেগনির্ভর মানুষের মুক্তিযাত্রা। এমন কি নির্বিকল্প সমাধি বলে যে বস্তুটির কথা শোনা যায়, যদি সম্পূর্ণ আজগুবি না হয় তবে তারও

এমন কিছু বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আছে, ভাষাজ্ঞান থাকলে নির্বিকল্প পুরুষ যা সহজেই বুঝিয়ে বলতে পারত। আমরা যে আছি সেইটে যদি অনুভব না করলাম, তবে আমরা যে আছি তার অপর প্রমাণ কই?

কিন্তু মানুষের ন্যায়শাস্ত্রই সব সত্যের আধার নয়। তার বাইরেও যুক্তি আছে, সত্য আছে। সেই যুক্তি যে একবার শুনেছে, সেই সত্যের স্পর্শ যে একবার পেয়েছে ন্যায়শাস্ত্রকে সে হেলায় উপেক্ষা করতে পারে। এই উক্তি থেকে কেউ যেন এমন অনুমান করবেন না যে, সেই লোকোত্তর অন্যতর যুক্তি আমার অধিগত হয়েছে। তবে নালাচটি ত্যাগের পরেকার চার ঘণ্টা কালের কথা স্মরণ করে এই কথা আজ নিঃসঙ্কোচে কবুল করতে পারি যে, 'কোগিটো এর্গো সুম' একমাত্র সত্য নয়, আর 'ডুবিটো এর্গো সুম' সর্বৈব মিথ্যা। মানুষ আপন মনুষ্যত্ব অক্ষুন্ন রেখেই আবেগমুক্ত ভাবমুক্ত হতে সক্ষম। আর সেই মুক্তির কথা অভিজ্ঞ যদি হাটের মাঝে বলতে না বসে তবে হয়তো তা তার ভাষাজ্ঞানের অভাবের কারণে নয়, সেই নিশ্চুপতারও হয়তো অন্যতর কারণ আছে।

চার ঘণ্টা সময়, দুটো একটা মুহূর্ত নয় যে ফসকে যাবে। অথচ আমার আত্মকেন্দ্রিক মনে কোন চিন্তা নেই, কোন ভাবনা নেই, কোন ভয় নেই, কোন আশা নেই, একেবারে শূন্য—অথচ কানায় কানায় পূর্ণ। পরে ওই চার ঘণ্টা সময়ের কথা অনেক ভেবেছি। পঞ্চ ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ করে স্মৃতির সাহায্যে বার বার ফিরে গিয়েছি সেই নালাচটি থেকে উখীমঠ হয়ে গোয়ালিবগড়ের পার্বত্য চড়াই-উতরাই পথে। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোঁজ করে দেখেছি যে, তখন আমার মনে রাগ হোক ভয় হোক আনন্দ হোক বিশ্বাস হোক, কোন পরিচিত বা অপরিচিত অনুভূতির অস্তিত্ব ছিল কি না? প্রতিবার আমার অনুসন্ধান ব্যর্থ হয়েছে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের বিশ্লেষণ করেও শূন্যতা ছাড়া আর যা মিলেছে তা পূর্ণতা। আর এই পূর্ণতাও আপেক্ষিক পূর্ণতা নয়। অতএব এ শুধু ভাষার অতীতই নয়, পুনরায়ত্তাতীতও।

তবে কেন একে সাময়িক মৃত্যু বা সম্মোহন বা অস্তিত্ব থেকে কিছুক্ষণের ছুটি বলব না? বলব না, কারণ, ওই চার ঘণ্টার প্রতিটি পলের কথা আমার এখনও সুস্পষ্ট মনে আছে। শিল্পী হলে ওই নালাচটি থেকে গোয়ালিবগড়ের সম্পূর্ণ পথটা প্রতিটি বাঁক সমেত আমি

নিখুঁতভাবে এঁকে দিতে পারতাম ! মৃত কি তা পারত ? সম্মোহিত কি তা পারত ? নিদ্রিত কি তা পারত ?

মনে আছে, মন্দাকিনীতীরে সংযুক্ত প্রদেশের সরকারী করুণায় নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যায়তনটি অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ফিরে দেখেছিলাম। কিন্তু প্রদীপ দিয়ে সূর্য দেখাবার এই বাতুল চেষ্টায় বা সত্যকে তথ্যের ভারে পীড়িত করবার এই অপচেষ্টায় তখন হাসি পেয়েছিল, না দুঃখ হয়েছিল তা স্মরণ নেই।

মনে পড়ে, উখীমঠে আমি যখন গিয়ে পৌছলাম দলের অন্য সবাই তখনও পিছনে পড়ে আছে। মন্দিরচত্বরের বাইরে বসে দূরে মন্দাকিনীর অপর পারে দিগন্তের কাছাকাছি গুপ্তকাশীর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। দিন কয়েক মাত্র আগে ওই চটিতে একটি দ্বিপ্রহর যাপন করেছি। তখন তা কত বাস্তব ছিল, আজ সে চটি দিগন্তে মিশে যাচ্ছে স্বপ্নবৎ ! আদিগন্ত বিশাল হিমালয়ের গায়ে দুটো রেখা মাত্র,—সমুদ্রতীরে শিশুর তৈরী বালুর দুর্গের মত। কিন্তু কলকাতার আকাশচুর্ণী অট্টালিকার পাশে ছোট ছোট নোংরা বস্তি দেখলে মানুষের অবশ্যম্ভাবী পরাজয়জনিত যে ক্ষোভ মনে জন্মে সেদিন তা মনে জেগেছিল বলে তো কই স্মরণ হয় না !

তারও পর, মনে আছে একে একে দলের সবাই এসে উপস্থিত হলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সবাই তখন একসঙ্গে গেলাম পুরাণখ্যাত উখীমঠ দেখতে। মন্দিরের ভিতরে বিগ্রহের অন্ত নেই; তেত্রিশ কোটির মধ্যে দুজন একজন হয়তো বাদ পড়ে থাকবেন। প্রস্তর মাত্রেই যেখানে বিগ্রহ, সেখানে বিগ্রহ সঞ্চয়ের তো বিশেষ অসুবিধে নেই—বিশেষত স্থানটা যদি হয় হিমালয়। আর মানুষ অর্থেই যেখানে দেবতা, সেখানে তেত্রিশ কোটি তো ন্যূনতম সংখ্যা ! একটা মন্দিরের মধ্যে দেখলাম পাশাপাশি উষা, অনিরুদ্ধ, চিত্রলেখা ও শক্তিমাতার চামুণ্ডামূর্তি। পাশাপাশি মানে প্রায় একের কোলে আর। এই চার মূর্তির মধ্যে যে অনতিক্রম্য বৈসাদৃশ্য আছে তখন সে কথা খেয়াল হয়েছিল বলে মনে নেই। না কি তখন এদের আপাত-বিরোধিতা ভেদ করে এদের মধ্যেকার গূঢ় ঐক্য আমার নজরে পড়েছিল ? তাও মনে নেই।

আরও মনে পড়ে, উখীমঠ থেকে গোয়ালিবগড় পর্যন্ত সেই পাদপহীন নির্দয় প্রস্তরময় সুদীর্ঘ পথ। প্রতিটি খুঁটিনাটি মনে আছে;—নিষ্করুণ সূর্যের ক্রমবর্ধমান তেজ, উত্তপ্ত অসমান প্রস্তরাকীর্ণ সঙ্কীর্ণ পথ, পথের পাশের ভয়ঙ্কর খাদ যার তলদেশ চোখে দেখা যায় না। শুষ্ক, তৃষ্ণার্ত গলাটির কথা, রুদ্ধশ্বাস বক্ষটির কথা, ব্যথাজর্জরিত পা দুটোর কথা—সব মনে আছে। কিন্তু সব চাইতে বেশী মনে আছে—আমি এই সব ধীরপদে অতিক্রম করে চলেছি—খুব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পদক্ষেপে নয়, কিন্তু অপ্রতিরোধ্যগতিতে। চোখ বুজলে এখনও দেখতে পাই সেই আমাকে। সম্মুখে সুদীর্ঘ পথ প্রসারিত। কিন্তু সেই পথের কথা ভেবে ভীত হবার সময় নেই। গায়ের গরম জামা-কাপড়গুলো ক্রমে দুর্বহ বোঝা হয়ে উঠছে, পথের উত্তাপে পা পুড়ে গেল; কিন্তু আমি তার কী করব? চলেছি কোথায়?—প্রশ্নটা অর্থহীন। মানচিত্র থাকলেও কোন কাজে লাগত না। কেন না সামনে একটি মাত্রই পথ। পথের শেষে কী পাব? —পেলে বোধ হয় তা জানব। যদি না পাই?—তবে পেলাম না। কিন্তু সেই হতাশা নিয়ে কি বাঁচতে পারব? কিন্তু আশা কই যে, হতাশ হব? চোখ বুজলে এখনও দেখতে পাই, একক আমি চলেছি। সেই যাত্রার অর্থ আমি বুঝি নে, কিন্তু মূল্য বুঝি। কার প্রতি জানি না, কিন্তু শ্রদ্ধায় মাথা আপনি নত হয়ে আসে। বুঝি যে, যতই বিকৃতি ঘটে থাকুক, যতই খাদ মিশে থাকুক—আসল যেটুকু, যেটুকু অকৃত্রিম সেটুকু আজও অমলিন আছে। একটু আগুনে পুড়লেই খাদ খসে পড়ে, যা অমর তা জল-জল করে ওঠে—দিঙ মণ্ডল উদ্ভাসিত করে দেয়।

গোয়ালিবগড় থেকেই তুঙ্গনাথের বহুশ্রুত চড়াইয়ের সুরু, যার ভয়ে অনেক যাত্রী নালাচটি থেকে রুদ্রপ্রয়াগে ফিরে আবার বদ্রিনাথের পথে যায়। মক্ষির কামড় থেকে আত্মরক্ষার্থে আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে ঘণ্টা দুয়েক দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের পর বেলাবেলি আমরা আবার পথ ধরলাম। রাত্রিটা ভুলকোণায় কাটিয়ে কাল সকাল সকাল তুঙ্গনাথে পৌঁছনো আমাদের বাসনা।

অরণ্যের মধ্য দিয়ে এইবার শুকনো পাতা-ঝরা পথ। গাছের ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত রৌদ্রের ঝিলমিল আলো এসে পড়েছে। কত অচেনা পাখী, অজানা গিরগিটি! নাম-না-জানা অজস্র রকমের ফুল গাছে গাছে।

তারই মধ্য দিয়ে চড়াই-উৎরাই পথ। পায়ে ব্যথা আছে, দেহে ক্লান্তি আছে, মনে আছে কেদারনাথের প্রবঞ্চনা। কিন্তু তবু এমন রমণীয় পথ আর কখনও দেখি নি, এমন ভাবে আর কোনদিন তরণী বাই নি। মাঝে মাঝে পর্বত সন্তানদের সঙ্গে দুটো একটা কথা হচ্ছে। মামুলী কথা। মাঝে মাঝে দুজন একজন পর্বতরমণীকে দেখছি ক্ষেতের কাজ সেরে ক্লান্ত দেহে ঘরে ফিরছে। তবু দেখেই মিষ্টি হাসছে। মাঝে মাঝে বসে একটু বিশ্রাম নিচ্ছি, সিগারেট খাচ্ছি। আবার আপন মনে পথ হাঁটছি। ছায়াঘেরা সঙ্কীর্ণ চড়াই-উৎরাই অরণ্যপথ। একেবারে নাক বরাবর। কার সাধ্য পথ হারায়!

কথা ছিল সন্ধ্যার আগেই ভুলকোণা চটিতে গিয়ে পৌছতে হবে। কিন্তু পথিবাসায় পৌছে দেখি, তন্মধ্যেই ঘরে ঘরে আলো জ্বলেছে; সন্ধ্যা ঘনায়মান। এর পর এই গভীর অরণ্য ভেদ করে দু মাইল পথ অতিক্রম করা সহজ নয়। তা ছাড়া কুলি ছড়িদার আরও কত পিছনে পড়ে আছে, কখন এসে পৌছবে কে জানে! এগুবো, না, অপেক্ষা করব—আমি আর নীলমণি ইতস্তত করছিলাম এমন সময় পথের উপরেরই একটা চায়ের দোকান থেকে সেই নাস্তিক সাধুজীর ডাক শুনলাম, যাঁর সঙ্গে নালাচটিতে পরিচয় হয়েছিল,—সেই রেনোয়াঁর তুলিতে আঁকা গগ্‌! আমরা যেতে একটু সরে আমাদের বসবার জায়গা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কী, চটিতে জায়গা পেলেন?

আমরা তো ভাবছি আজকেই আর এক চটি এগিয়ে থামব।

আর এক চটি এগিয়ে মানে কি একেবারে বৈতরণীর ওপারে! আপনাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে মশাই, এই রাত্রিতে এই পথে স্থানীয় লোকেরাও যায় না, তা জানেন? চা-ওয়ালা অবশ্য বলছে যে, যাত্রীদের বাঘেও খায় না, ভালুকেও ছোঁয় না; কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে পেলে এই ধর্মবোধ কতটা অটুট থাকবে তা বলা শক্ত। যদি যান, তো ভেবে যাবেন।

এর পরেও আবার ভাবনা? আমি আর নীলমণি একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে দু গেলাস চায়ের নির্দেশ দিলাম। বসতেই শীত ছেঁকে ধরেছিল, অবিলম্বে সশব্দে গরম চা-পানে ব্যস্ত হলাম—একটা করে সিগারেট ধরিয়ে।

তন্মধ্যে নাস্তিক সাধু যাঁর সঙ্গে পূর্বে বাক্যালাপ করছিলেন তাঁর সঙ্গে আবার কথা শুরু করেছেন। এই দ্বিতীয় যাত্রীও আমাদের পরিচিত। সেই মৃত্যু-রহস্যে দিশেহারা নব্য-নচিকেতা, কলকাতায় ক্লেদে জন্মলাভ করেও যে নিজের সত্য-পরিচয় গোপন করতে পারেনি। শাকম্বরীমাতার স্থানে বসে এঁরই বিষাদান্ত কাহিনীর প্রথম অংশ শুনেছিলাম। ক্ষণিক কান পেতেই বুঝলাম, এঁদের বর্তমান বাক্যালাপের বিষয়ও সেই কাহিনী। তাঁর যা বলার ছিল তা সাঙ্গ হয়েছে, এখন তিনি শুনতে চান, তাই চোখ বুজে নিঃশব্দে সিগারেট টানছেন। অবশেষে আমাদের নাস্তিক সাধু বললেন : কি বলব বলুন? কিছুই যে বলবার নেই। আপনার সমস্যার সমাধান আপনাকেই করতে হবে, আপনার জীবন বাঁচতে হবে আপনাকেই। সমবেদনা জানানো অর্থহীন। উপদেশ হবে নুনের ছিটে। আমার যিনি অজরামর, আপনার কাছে হয়তো তিনি জীবিতই নন। আপনার অজরামর শুধু আপনারই হবে। কী বলব বলুন?—তিনি চুপ করলেন, একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন বাইরে ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে। উনুনের আগুন ধিক ধিক করে জ্বলতে লাগল। চা-ওয়ালা আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে বসে রইল জড় পদার্থটির মত। হঠাৎ আমার মনে হল, আমি একা। শুধু আমি নই, নীলমণিও একা, সাধুও, ওই ভদ্রলোকও। যে যার আলাদা রুদ্ধ জগতে বসে হাত-পা ছুঁড়ে মরছি কেউ কারও কথা বুঝতে পারছি না। শুধু অর্থহীন কতকগুলো শব্দ। অধিকতর অর্থহীন অঙ্গভঙ্গী। শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে ক্রমে। এমন সময় তিনি—মানে নাস্তিক সাধু আবার শুরু করলেন—আপনার অবস্থা পুরোপুরি বুঝতে পারি এমন সাধ্য নেই, তবে কতকটা অনুমান করতে পারি। অমন কঠোর অভিজ্ঞতা আমার নেই, তবে মৃত্যু সম্বন্ধে এককালে আমিও কিছু কিছু ভেবে দেখেছি এবং হয়তো এক-আধবার তার মুখোমুখিও দাঁড়িয়েছি। এমন কে আছে যে একাধিকবার মরণের আমন্ত্রণ বা আর্তনাদ শোনে নি? কিন্তু তৎসত্ত্বেও অনেক দিন পর্যন্ত আমি মৃত্যুতে বিশ্বাস করতাম না। যদিও অপরের মৃত্যুতে করতাম। কিন্তু অপরের মৃত্যু কি মৃত্যু? অপরের মৃত্যুর পরেও তো দেখি পৃথিবী আপন অক্ষপথে ঠিক ঘুরে চলেছে। মৃত্যুতে বিশ্বাস করতাম না, কিন্তু মৃত্যুভয় ছিল ষোল আনা। যেমন

প্রেতে বিশ্বাস করি না, কিন্তু প্রেতকে ভয় করি। জীবনটাকে যে আঁকড়ে থাকতাম তা মৃত্যুর ভয়ে নয়, মিথ্যা ভয়ে, সংস্কারবশত। তারই মধ্যে হঠাৎ কখনও ভুয়ো জীবনের আড়ালে মৃত্যুর করাল চেহারা নজরে পড়ে যেত। হঠাৎ যেন বুঝতে পারতাম যে, জীবনটা যত বড় ফাঁকিই হোক মৃত্যুটা সত্য। অবিসম্বাদী সত্য। সেই সত্য এত ঠাণ্ডা যে হাড়ে কাঁপন লাগত। তখন তাড়াতাড়ি আরও মিথ্যা জড়ো করে সে ফাঁক বন্ধ করতাম, নিজের চোখে আরও একটা ঠুলি পরে সত্য অস্বীকার করতাম। কিন্তু অমন কত দিন সম্ভব? আরও কিছুদিন বাদে আস্তে আস্তে এই কথাটা অনস্বীকার্য হয়ে উঠল যে, আমি যে জীবন যাপন করছি তাই মৃত। কিন্তু সেই মৃত-জীবন ত্যাগ করব এমন সাহস নেই, এমন প্রত্যয় নেই। অগত্যা নিজেকে গাল দিই। ক্রমে সেই গালটাও মরে গেল। এর পরই লাগল মহামারী,—যেদিকে চাই, যার দিকে চাই সব মরে যায়। একের পর এক বিদ্যা মরে, শ্রদ্ধা মরে, ভক্তি মরে, প্রেম মরে, শক্তি ক্ষয়ে যায়, বুদ্ধি ভোঁতা হয়। এমন সময় অদূরে স্বয়ং নিজের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী দেখে এক সন্ধ্যায় দপ করে জ্বলে উঠলাম। চিরতরে নির্বাপিত হবার আগে ওইটেই ছিল প্রদীপের অন্তিম জ্বলে-ওঠা। এখনও সময় আছে, এর পরই বড় দেরি হয়ে যাবে। অন্ধকারে তখন আর আঁধারটুকুও দেখতে পাব না। কী করব, কী করব? সমস্ত রাত্রি ছটফট করে শেষ রাত্রিতে নতুন প্রদীপ জ্বেলে পুরনোকে দিলাম বাতিল করে। আমার সেই প্রদীপ আজও জ্বলছে, এবং এই বিশ্বাস নিয়ে আমি মরতে পারব যে তা অনির্বাণ জ্বলবে। তবে সেই প্রদীপের আলো অন্য কারও পথ আলোকিত করবে কি না বলতে পারব না।

মুখ্যত যাঁর উদ্দেশে কথাগুলো বলা তিনি এতক্ষণ উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রতিটি কথা গিলছিলেন। কথায় বিরতি পড়তেই তিনি ফস্‌ করে বললেন, কিন্তু আসল কথাটাই যে বাদ পড়ে গেল! মৃত্যু কী করে জয় করলেন, আর ওই প্রদীপটাই বা কে ও কী, তা তো কই বললেন না? আগের প্রদীপটা যে নিবে গেছে তা-ই বা জানলেন কেমন করে, আর কী করে নিশ্চিত হলেন যে দ্বিতীয় প্রদীপটা জ্বলছে এবং জ্বলবে?

এই সুবক্তা সাধুর চরিত্র আমাদের অজানা নয়। চেতনার গভীরতম প্রদেশ থেকে তিনি মুহূর্তমধ্যে আবার অভ্যস্ত সাবলীলতায় ভেসে

উঠলেন। ঈষৎ ম্লান একটু ঘরোয়া হেসে বললেন : অর্থাৎ কিনা, আমার এত কথার একটি কথাও বুঝতে পারেন নি। না পারাই স্বাভাবিক। অপরের মৃত্যু কি বোঝা যায়? আর তাই যদি না গেল, তবে অপরের মৃত্যুঞ্জয়ের কথাই বা বুঝবেন কী করে? তবু আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর আমার জানা আছে। প্রথমত, মৃত্যু আমি জয় করেছি মৃত্যু স্বীকার করে। মৃতকে আঁকড়ে থাকলেই মৃত্যুভয়টা কাঁধে চেপে বসে। দ্বিতীয়ত, আমার এই নতুন প্রদীপটা হচ্ছে স্বয়ং মৃত্যু। মৃতকে মৃত বলে জানলে তার সৎকার করতেই হয়। যখনই বুঝতে পারি একটা কিছু মরে গেছে, এবং একটু অনুচিন্তার অভ্যাস থাকলেই তা বুঝতে বিলম্ব হয় না, তক্ষুনি আমি তা ছেড়ে আসি। আগে এককালের অভ্যস্ত জীবন ছেড়েছি, তারপরে অনেক পথও পেরিয়েছি।

একটুও ব্যথা লাগে নি?—হাওড়ার নীলমণি উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করেছিল।

তা লেগেছে এবং এখনও লাগে। তবে তা ইঞ্জেকশনের পিঁপড়ের কামড়ের চাইতে বেশী নয়, আর অস্ত্রোপচার বা মৃত্যুভয়ের চাইতে অনেক কম।

কিন্তু ওই যে বললেন, মৃত্যুকে স্বীকার করে আপনি তাকে জয় করেছেন—ওই কথাটার অর্থ পুরোপুরি ধরতে পারলাম না। আর এক গেলাস করে চা খাবেন তো সবাই?

সবাই নীরবে সম্মতি জানালাম।

সেই কথাটার অর্থ অত্যন্ত সহজ, কিন্তু একটু ধরিয়ে না দিলে ধরতে পারবেন না। আগেই একাধিকবার বলেছি, সমস্যাটাই শুধু ব্যক্তিগত নয়, সমাধানটাও ব্যক্তিগত। আর সেই ব্যক্তির সঙ্গে আপনার পরিচয় তো মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তার সম্বন্ধে কতটুকু জানেন আপনি! আমি যা জানি তাও যথেষ্ট নয়, তবে ওই কথা কয়টির অর্থ কতকটা তাতে বোঝা যায়। আগে ভাবতাম, যে সমাজ আমি পরিত্যাগ করে এসেছি তার বাইরে কোন সমাজ নেই, মানুষ নেই, জগতের সেইটে শেষ সীমা। কিন্তু যখনই জানলাম সেই সমাজ মৃত, এবং যে মুহূর্তে সেই সমাজ পরিত্যাগ করে বাইরে এসে দাঁড়ালাম তখন দেখি, পৃথিবীও বিপুল আর জীবনেরও শেষ নেই। দেখে থাকবেন হয়তো কবিরা নদীর সঙ্গে জীবনের তুলনা

করে থাকে। সেইটে মিথ্যে নয়। জীবনেও হয় ভাটা বইছে, নয় জোয়ার। মৃতকে পরিহার করলেই জীবনের পরিধি বাড়তে থাকে। কিংবা যদি বিষয়টাকে অন্য দিক থেকে দেখেন তবে ধরুন গ্যেটে টলস্টয় বা রবীন্দ্রনাথের কথা। জীবনের কি বিশাল ব্যাপ্তি, সমবেদনার কি অসীম প্রসার, কল্পনার তো সহস্র অশ্বশক্তি। সেই তুলনায় কয়জন সামাজিক আদৌ জীবিত বলুন তো? দেশে দেশে জীবনের বিস্তার দেখলে মৃত্যু মরে যায়।...নাঃ, কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেল। এইবার উঠে দেখতে হয় আজ কার হাঁড়িতে আমার অন্ন! পেট তো দর্শনে ভরবে না, জীবনেও মরবে না! বেঁচে থাকাটাই হাঙ্গামা মশাই, মরলে হাড় জুড়ত!—গায়ের চাদরটা দিয়ে কান ঢাকতে ঢাকতে সাধুজী উঠে দাঁড়ালেন। এবং চারজনেই যুগপৎ অট্টহাস্যে ফেটে পড়লাম।

সেই ভদ্রলোকও হাসলেন। তার পর বললেন, আজ না-হয় এই দীনকেই কিছুটা পুণ্য সঞ্চয় করতে দিন।

উহুঁ, সেটি পারব না। জানেন তো রোজগার করে আমি খাই নে, অপরের উদ্বৃত্তে আমার পেট ভরে। আজ যদি আপনার মাথায় হাত বুলোই তা হলে আমার এমন মনে করবার আশঙ্কা থাকবে যে, আমি হয়তো সত্যি সত্যি আপনাকে কিছু দিয়েছি। কিন্তু তা তো দিই নি। তবে কেন আপনার পুণ্য বাড়াতে গিয়ে নিজের পাপ বাড়াব?

এইবারে আমি কণ্ঠক্ষেপ করলাম: তা হলে কিন্তু আমার আমন্ত্রণই আপনার গ্রহণ করতে হয়। হলফ করে বলতে পারি, আপনার এতগুলো কথার একটিও আমি বুঝতে পারি নি। গ্রীক আমি জানি না। অতএব আপনি যদি আজ আমার অন্নে ভাগ বসান তা হলে আমি অন্তত তা আপনার প্রাপ্য মূল্য হিসেবে গণ্য করব না।

তা তো করবেন না, কিন্তু কাল সকালে উঠে গাল দেবেন তো যে, ভণ্ডটা শয়তানটা কাল মাথায় কাঁঠাল ভেঙে গেল? ঠিক আছে, যদি করুণা করেন তো দেবেন না-হয় দুটো গাল। কিন্তু তখন স্মরণ রাখবেন যেন যে, ওই শয়তানটা আপনি নিজে ছাড়া আর কেউ নয়।

তথাস্তু।

আবার সমবেত হাসি। তারপর নীলমণি সবাইকে চা-পানে আপ্যায়িত করল। সিগারেট ধরিয়ে সবাই কিছুক্ষণ নীরবে ধূমপান

করলাম। আমার মনে হল, জীবনের সঙ্গে এই ভদ্রলোকের, এই সাধুজীর কি বিস্ময়কর ঘনিষ্ঠতা! কি আশ্চর্য স্বাভাবিকতার সঙ্গে এঁরা জীবনকে ভালবাসে, ঘৃণা করে। অথচ আমাকে জীবন চিরকাল এড়িয়ে গেছে। জীবন আমার কাছে একটা দুর্বোধ থিওরি বই আর কিছু নয়। আর তাও পরিহারযোগ্য। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপতে যাব, এমন সময় সাধুজী আবার ভদ্রলোককে উদ্দেশ করে বললেন, আচ্ছা, কেদারনাথে আপনি কী দেখলেন বলুন তো?

পূর্ণ বিবরণ দিতে পারব না, কারণ পুরোটা এখনও দেখা হয় নি।

বেশ তো, যতটুকু দেখেছেন তার মধ্যে প্রধান কী তাই বলুন?

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপরে বললেন—মৃত্যু।

সাধুজী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপরে বললেন—তার আগে কিছু চোখে পড়ে নি?

পড়েছে। অপূর্ব সৌন্দর্য।

আর পরে?

অসীম শূন্যতা।

এবং?

আরও শূন্যতা।

ও। কিন্তু সেই শূন্যতা একেবারে বিশুদ্ধ নয়, আশঙ্কা করি।

না, সে শূন্যতা দীপ্ত।

অত আলোতেও আর কিছু দেখতে পেলেন না? বুঝতে পারলেন না, ওই শূন্যতা সুন্দর, না কুৎসিত? কেবল দীপ্ত? সুন্দর নয়?

হয়তো সুন্দর।

কুৎসিত নয়?

বোধ হয় না।

না, কি নিরাকার?

কখনও কখনও তাও বটে।

বাকী সময়টা?

শূন্য।

এইখানেই সেদিনকার মত কথাবার্তা আপনি থেমে গেল—যেন সমে পৌঁছে। ভদ্রলোক আবার গুটিগুটি ডস্টয়েভস্কি'র পাতায় আত্মগোপন

করলেন। নাস্তিক সাধুর ভাবনার অভাব নেই, তিনি কোন অতলে নিমজ্জিত হলেন তা তিনিই জানেন। আমি কিন্তু নিজেকে অথর্ব, নির্বোধ এবং সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত বলে বোধ করতে লাগলাম। বোকার মত নিঃশব্দে একের পর এক সিগারেট টানতে লাগলাম। তারপরে সেদিন কখন কী খেলাম, খাবার সময় কার সঙ্গে কোন্ কথা হল কিছুই স্মরণ নেই। পরদিন সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠে দেখি, সাধুজী তৎপূর্বেই অদৃশ্য হয়েছেন—গত রাত্রির আতিথেয়তার জন্যে ধন্যবাদটুকু জ্ঞাপনের অপেক্ষা পর্যন্ত না করে।

অনতিবিলম্বে আমরাও পথে নেমে এলাম। চড়াই পথ, একটু এগিয়েই সামনে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। একটু এগিয়ে দেখি, অদৃশ্য হয়েছে বটে কিন্তু হারিয়ে যায় নি। তন্মধ্যে প্রাক্-সূর্যোদয়ের প্রথম আভায় বনদেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, পাখীদের ঘুম ভাঙছে, চারিদিকে আনন্দের আর অন্ত নেই। একটু পরেই তুঙ্গনাথের খাড়া চড়াই শুরু হবে, সকলেরই হৃদয় সে আশঙ্কায় ভারাক্রান্ত; কিন্তু তবু কেউই মাঝে মাঝে অকারণে হেসে না উঠে পারছিলাম না।

ভুলকোনা চটিতে পৌছতে তুঙ্গনাথের এক পাণ্ডা আমাদের পিছন ধরল। পাণ্ডা তো নয়, তারাদা বললেন, পাণ্ডা-কে আণ্ডা! বয়স ন-দশ হবে, কিন্তু বেশ ডাঁসা। মুখে অনর্গল খই ফুটছে। তাকে যতবার বলা হয় যে পাণ্ডার আমাদের দরকার নেই, পূজো আমরা দেব না, ততবারই সে জবাব দেয়, পূজো দেওয়া না-দেওয়া তো শেঠজীদের ইচ্ছা, কিন্তু তাই বলে সে কি পথটুকুও দেখাতে পারবে না, সঙ্গে সঙ্গে যেতেও পারবে না! পাণ্ডা-কে আণ্ডা যেন মূর্তিমান অমায়িকতা। তারপর সে আমাদের ভূগোল শিক্ষা দিতে লাগল। ওইটে অমুক পর্বত, সেইটে তমুক। অবশেষে তুঙ্গনাথ পর্বতের একেবারে পাদদেশে এসে চিনলাম কোন্‌টা তুঙ্গনাথ পর্বত।

বহু-আশঙ্কিত চড়াইপথের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেহমন ক্লান্তিতে হতোদ্যমে চুপসে একেবারে এতটুকু হয়ে গেল। এ চড়াইয়ের শ্বাসরুদ্ধকারী বিবরণ এর আগে একাধিক জনের কাছে শুনেছি, বহুজনকে আঠারো বা ততোধিক মাইল দূর থেকে এ চড়াইয়ের ভয়ে ভীত হয়ে পালাতে দেখেছি,—কিন্তু তবু এ চড়াই যে এমন ভীতিপ্রদ কোনকালে তার

অর্ধেকও অনুমান করে উঠতে পারি নি। নীচে থেকে, উপর থেকে, এ-পাশ থেকে, ও-পাশ থেকে ননী এবং সুশীল এই চড়াইয়ের অজস্র আলোকচিত্র নিয়ে এসেছে। সেই ছবিগুলোর দিকে তাকালে আজও এই কলকাতার গরমে দেহের রক্ত হিম হয়ে যায়। কেমন করে এ চড়াই পাড়ি দিয়েছিলাম? সত্যি কি দিয়েছিলাম?

কিন্তু ইংরেজীতে যাকে বলে 'অ্যাডাপ্টেবিলিটি', অর্থাৎ কিনা মানিয়ে নেবার ক্ষমতা—তা আমাদের দেহের যতখানি, মনের তার সহস্রাংশের একাংশও নয়। বাস্তবজীবনেও এর নিদর্শনের অন্ত নেই, কিন্তু তুঙ্গনাথ এই সত্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। মনে আছে, চড়াই ভাঙবার সময় মন যখন প্রতি মুহূর্তে নিজের ভারে নুয়ে পড়ছিল, প্রতি মুহূর্তে ভয় পাচ্ছিল এর পর আর এক পাও এগুনো যাবে না, এর পর ঘোড়া নিতেই হবে, তখন দেহ পায়ের ব্যথা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিয়ে গুটি গুটি ঠিক উঠে যাচ্ছিল। শুধু তাই নয়, এদিকে ওদিকে চেয়ে হিমালয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করছিল, খেয়াল করে দেখছিল—কোন্‌টা রাবণশিলা, যাত্রীদের উৎসাহ দিচ্ছিল হেসে। সূর্যকিরণের ক্রমবর্ধমান উত্তাপ যেন কিছু নয়।

তুঙ্গনাথ পর্বতের শীর্ষদেশে তুঙ্গনাথের সুবিখ্যাত মন্দির। সমুদ্ররেখা থেকে স্থানটির উচ্চতা অল্পবিস্তর তেরো হাজার ফিট। জীবনে এর আগে আর কোনদিন আক্ষরিক অর্থে এত উপরে উঠি নি। উঠতে তাই কিঞ্চিৎ গর্ববোধ করলাম। এইটে ন্যায্য পাওনা ছিল।

কেদারনাথ অপেক্ষা তুঙ্গনাথের উচ্চতা হাজার দেড়েক ফিট বেশী,—কিন্তু সেই তুলনায় শীত অনেক কম। বরফও। বিস্ময় প্রকাশের আগেই পাণ্ডা সাগ্রহে বুঝিয়ে দিল যে, এর কারণ কেদারনাথের মত তুঙ্গনাথের আশেপাশে কোন উচ্চতর শৃঙ্গ নেই। সূর্যের আলো এখানে সোজা এসে পড়ে। পাণ্ডা তারপর একে একে আমাদের মন্দির দেখাল, যে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শঙ্করাচার্য্য। কুণ্ড দেখাল, যেখানে নলপথে আকাশগঙ্গার জল অবিরত এসে পড়ছে। তারপর দূরদিগন্তের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে গড়গড়িয়ে বলে গেল, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, নীলকণ্ঠ, ত্রিশূল ইত্যাদি ইত্যাদি।—কোনটা কী কিছুই বুঝলাম না, শুধু বুঝলাম যা দেখছি তা আর কখনও

দেখি নি, আবার কখনও দেখব এমন আশা করাও উদ্ধত বাতুলতা। উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে যেদিকে চাই সেদিকেই সারিবদ্ধভাবে একের পর এক আদিগন্ত অশেষ অজস্র তুষারশিখর সূর্যকিরণে ঝকঝক করছে। দেখতে দেখতে চোখ আর ফেরানো যায় না। শ্রদ্ধায় চোখ আপনি নত হয়ে আসে।

এর পর আকাশগঙ্গার জল মাথায় নিয়ে পাণ্ডার পিছন পিছন মন্দিরে পূজো দিতে গেলাম উপচারের থালা হাতে। তুঙ্গনাথের মূল মন্দিরটি ব্যতিরেকেও এখানে একাধিক ছোট ছোট মন্দিরের মডেল আছে। প্রত্যেকটিতেই একটি করে বিগ্রহ। লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ ইত্যাদি। বিগ্রহগুলোর অবস্থা মুমূর্ষু, মন্দিরগুলোতেও ফাটল ধরেছে। কিংবদন্তী যাই হোক, কেদারনাথের মন্দির অপেক্ষা তুঙ্গনাথের মন্দিরাদির বয়স অনেক বেশী বলেই মনে হয়।

দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর সবাই যখন একটু করে বিশ্রাম নেবার আয়োজন করল তখন আমি আবার আস্তানা থেকে বেরিয়ে এলাম। ঘুরে ঘুরে দেখতে দেখতে একটা কথা ভেবে আর ঠাঁই পেলাম না। এখানে কে প্রথম এসেছিল? যে এসেছিল সে কি জানত, এখানে এসে কী পাবে? কবে কোন্ বিস্মৃত যুগে, পথে কোন চটি নেই একজনও লোক নেই, খাদ্য আর কতটুকু নিজের সঙ্গে বহন করা যায়, তার উপর জানা নেই—কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, গিয়ে কী পাব বা না পাব। অন্তরের মধ্যে শুধু অনির্বাণ একটি প্রদীপ জ্বলছে, সেই আলোতে পথ চলা। সেই আলোতে যুগ যুগ ধরে জগৎ আলোকিত করা। বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে একটি পাথরের উপর বসে দূর দিগন্তের দিকে চাইতে আমি হতচেতন হলাম। তুষারদিগন্ত তখন স্বচ্ছ মেঘের অচ্ছোদ ছায়ায় নীলাভ।

এই নির্জন স্থানটিতে এসে বসবার সময়েই অদূরে সেই সাধুজীকে বসে থাকতে দেখেছিলাম। উনিও আমাকে খেয়াল করেছিলেন। কিন্তু বলবার কিছু ছিল না বলে কেউই এতক্ষণ কিছু বলি নি। এখন একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে মনে পড়ল উনিও সিগারেট খান। সিগারেটটা ধরিয়ে দিয়ে সৌজন্যের খাতিরে জিজ্ঞেস করলাম, অমন নিবিষ্ট মনে কী ভাবছিলেন?

একটা অত্যন্ত শক্ত অঙ্কের সমাধান। অঙ্কটি হচ্ছে দুয়ে দুয়ে যোগ দিলে কী হয়? আর দুই থেকে দুই বাদ দিলেই বা কী হয়? ফল একই।

নাস্তিক সাধুর এই বিমূঢ় উক্তি আজ আমার কাছেও কেমন যেন বিদঘুটে হেঁয়ালি বলে মনে হচ্ছে। যতই চিন্তা করি কথাগুলোকে ততই যেন অর্থহীন মনে হয়। সেদিন যে এর মাথামুণ্ড কী বুঝেছিলাম আজ আর তা' শত চেষ্টা সত্ত্বেও স্মরণ করতে পারিনে। হয়তো কিছুই বুঝিনি; হয়তো বা কেবল এইটুকু বুঝেছিলাম যে আসলে কিছুই বুঝবার নেই। তবে এমন অবস্থায় আমি সচরাচর যেমন বিপর্যস্ত এবং অপ্রতিভ বোধ করে থাকি সেদিন কিন্তু তেমন কোন ভাবান্তর হয়নি। কণামাত্র না। বরং যেন মনে হল একটাও অপরিচিত অশ্রুতপূর্ব শব্দ কানে আসেনি, যেন ঠিক এই কথাগুলোই আমিও এমনি স্বাভাবিক কণ্ঠেই অনায়াসে উচ্চারণ করতে পারতাম।—অবিশ্বাস্যরকম সপ্রতিভ রইলাম। সম্ভবত কথাকয়টির স্থূল অর্থ এবং ক্ষুদ্র ব্যঞ্জনা অতিক্রম করে অন্যতর কোন ইঙ্গিত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। যে স্বতঃসিদ্ধ আমার পক্ষেও অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না।

আর কোন বাহুল্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করে আমি তুষার দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইলাম, যে দিগন্তে সব জিজ্ঞাসা স্তব্ধ সব বিক্ষোভ শান্ত সমস্ত সংশয় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আছে। নিকটের চূড়াগুলোর উপর ভাসমান মেঘের ছায়া পড়ছিল, সুদূর দিগন্ত আনন্দ আলোকে ভাস্বর। অমৃত-মন্ত্রে আত্মহারা। কিন্তু কথা কয়টি বলেই নাস্তিক সাধু সেই যে হাসতে সুরু করেছিলেন তখনও তেমনি অবিরত হেসেই চলেছেন!

তুষারদিগন্তের মেঘাবরণ আস্তে আস্তে অনচ্ছ হয়ে উঠছিল। দিগন্ত ক্রমেই সরে আসছিল আমাদের কাছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তুঙ্গনাথের চতুর্দিক ঘন সাদা মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল। অল্পক্ষণ আগেকার উদারতম বিশালতম পৃথ্বী তুঙ্গনাথের শীর্ষে এসে কেন্দ্রীভূত হল মুহূর্ত-মধ্যে। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-পরিব্যাপ্ত অকূল-পাথার মেঘ-সমুদ্রের মধ্যে তুঙ্গনাথ একমাত্র দ্বীপ। যেন নোয়ার নৌকো। নিজের সৌভাগ্যে ঈর্ষা হচ্ছিল।

কিন্তু যে-কোন মুহূর্তে বৃষ্টি আসতে পারে। আর নিজের কথা বিস্মৃত হলেও, নিজের দেহের বিলিতী শীত-বস্ত্রের কথা অবিস্মরণীয়।

অতএব কামিজের গলার বোতামটা আঁটতে আঁটতে তাড়াতাড়ি মুক্ত-প্রাঙ্গণ থেকে পালিয়ে এলাম। এসে দেখি, দলের অন্য সবাইও ব্যস্ত হয়ে ধৈর্য হারাতে বসেছে—তাড়াতাড়ি চলুন মশাই, তাড়াতাড়ি। আপনার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। যদি বৃষ্টি নেমে বসে, তবে? কিন্তু আমি কোন জবাব দেবার আগেই সবাই মিলে গড়গড়িয়ে উতরাই নামতে শুরু করে দিল। আমিও।

যে-চড়াই ভেঙ্গে আমরা তুঙ্গনাথে উঠেছিলাম, এই উতরাই ঠিক তার বিপরীত দিকে। এই অবতরণের বিশদ বিবরণ দেবার সাধ্য আমার নেই, তবে এইটুকু বলব যে, এই উতরাই কেদারনাথের সেই বহুনিন্দিত উতরাই থেকে শতগুণ বেশী কুৎসিত; এবং এই উতরাই অতিক্রমণে যদি আমার স্মরণীয় কোন কষ্ট হয়েও থাকে তবে তা অন্তত শতগুণ অল্প।

এর আগে ত্রিযুগীনারায়ণের উতরাই অবতরণের সঙ্গে আত্মোচ্ছল ঝরনার উপমা দিয়েছিলাম; কেদারনাথ থেকে প্রত্যাগমন যেন ছিল একটি গড়িয়ে-দেওয়া পাথরের নিজেকে এবং পথকে ক্ষত-বিক্ষত করে নেমে আসা। বর্ণনাতীত, অনুপম। কিন্তু তবু যদি কোন উপমা দিতেই হয় তবে বলব, এ হচ্ছে হরিদ্বারের গঙ্গা। অত্যন্ত বেগবতী, কিন্তু সম্পূর্ণ নিস্তরঙ্গ। একেবারে নিরুদ্বিগ্ন।

তুঙ্গনাথের পাদদেশ থেকেই আবার অরণ্যপথ শুরু। অরণ্য এইবার নিবিড়তর। হাঁটতে গেলে শুকনো পাতা দলতে হয়। মাঝে দু-চারবার বৃষ্টি নামল—কখনও গাছের গহ্বরে, কখনও পাথরের আড়ালে আশ্রয় নিলাম। বৃষ্টি একটু ধরলেই আবার প্লাস্টিকের চাদর গায়ে জড়িয়ে হাঁটা শুরু। সকালে যে-অরণ্যের সোল্লাস নিদ্রাভঙ্গ দেখে চঞ্চল হয়েছিলাম, বিকেলে দেখলাম সেই অরণ্য শান্ত নিদ্রার আয়োজন করেছে। সেই রাত্রি বালখিল্যতটে সমৃদ্ধ পার্বত্য গ্রাম মণ্ডলচটিতে কাটিয়ে, পরদিন সকালে গোপেশ্বর, যেখানে মন্দিরের সম্মুখভাগে ত্রিশূলের গায়ে রাজা অনেকমল্লের বিজয়বার্তা লিখিত আছে, পেরিয়ে বেলা বারোটা নাগাদ আমরা চমোলী এসে পৌঁছলাম। যাত্রার দ্বিতীয় পর্ব সমাধা হল।

চমোলী, ওরফে লালসাঙ্গা এই যাত্রাপথের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জংশন। তিন দিক থেকে পথ এসে অলকানন্দার তীরে এই রম্য

স্থানটিতে একত্রিত হয়েছে। বাজারের ব্যস্ততা ও পেট্রোলের গন্ধেও স্থানটির রমণীয়তা ক্ষুণ্ণ হয় নি আদৌ। মোটরের অনর্গল আর্তনাদ ছাপিয়েও অলকানন্দার চিরঞ্জীব সঙ্গীত অবিরত পর্বতপ্রদেশে প্রতিধ্বনিত হয়।

ইচ্ছা ছিল স্নানাহারের পর এইখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেলের দিকে পিপুলকোটির বাস ধরব। কিন্তু পৌঁছেই দেখি, বাস দাঁড়িয়ে আছে, যে-কোন মুহূর্তে ছেড়ে দিতে পারে। তাড়াতাড়ি টিকিট কেটে বাসে মাল তোল, নিজেকে তোল। তাড়াতাড়ি, আরও তাড়াতাড়ি। সব হল, কিন্তু বাস আর ছাড়ে না। ড্রাইভার বলে, ওদিক থেকে খবর না এলে গাড়ি ছাড়ব কেমন করে? সত্যই তো, পথ যে একমুখো!

জঙ্গম শকটে স্থাবর হয়ে থাকার মত শাস্তি বোধ হয় আর নেই। তবে এ ব্যাপারে আমার আজন্ম অভিজ্ঞতা। বাস থেমেই রইল, যাত্রীদের কোলাহলও অব্যাহত, কারা-প্রাচীরের মত চতুর্দিক হিমালয়াবৃত, দূর থেকে অলকানন্দার চাপা গর্জন ভেসে আসছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি সেটি টানতে ভুলে গেলাম।
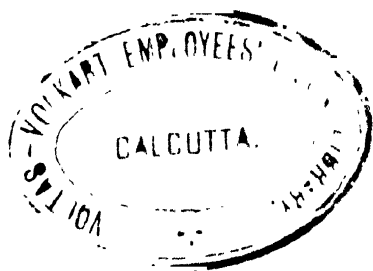
এগার

অপর প্রান্ত থেকে সংবাদের প্রতীক্ষায় বাসটিও থেমে আছে। সামনে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে খাড়া উঠে গেছে হিমালয়ের ছিদ্রহীন প্রাচীর। বাজারের কোলাহলটারও যেন আদি-অন্ত নেই, সুর-ছন্দহীন একঘেয়ে ক্রন্দন! মন একাগ্র করে কান পেতে উদগ্রীব হয়ে শুনলে দূর থেকে অলকানন্দার চাপা গর্জন একটু একটু ভেসে আসে। বোঝা যায় যে, বোঝা না গেলেও সময় ঠিক কাটছে, পৃথিবী ঠিক ঘুরছে, কিছুই অপরিবর্তিত অবিবর্তিত থাকছে না।

কলকাতা।—জীবনের অধিকাংশ কাল যেখানে কাটিয়েছি, স্মৃতির মানচিত্রে সেই কলকাতা আজ নগণ্য একটি বিন্দুমাত্র। কলকাতা-জীবনের আলো, চপলতা, ব্যস্ততা, হতাশা, শ্বাসরুদ্ধকারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা—সব কোথায় মিলিয়ে গেছে! তারপর কত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে একদিন—সে কয় যুগ আগে?—সকালবেলায় হরিদ্বারে এসে নামলাম। যেন নবজন্ম হল; হরিদ্বারের গঙ্গার সেই মৃদু কলরোল যেন বিস্মৃত শৈশব-পূর্বে শোনা মায়ের ব্যঞ্জনাময় হাসি। তারপর হ্রীষিকেশ, লছমনঝুলা, দেবপ্রয়াগ, কীরাতনগর, শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ—শৈশবের সুদীর্ঘ সুখস্বপ্নের মত কত তীর্থ অতিক্রম করে এলাম! সে সব স্থানের কথা আর স্পষ্ট মনে পড়ে না। যেটুকু পড়ে সেটুকুও স্মৃতি বা শ্রুতি, না কি নেহাতই কল্পনা বুঝতে পারি না। বিস্মৃতি সেই স্মৃতিটুকুকে অধিকতর উজ্জ্বল করে রেখেছে। রুদ্রপ্রয়াগ থেকে এক সন্ধ্যায় সত্যকারের যাত্রা শুরু করেছিলাম—যৌবনে পদার্পণ করে যুবক যেমন পিতার আশ্রয়পুট ছেড়ে নিজের পায়ে দাঁড়ায়। তারপর রামপুর, চন্দ্রাপুরী, গুপ্তকাশী, ত্রিযুগী,

রামওয়াড়া—যৌবনোচিত উদাসীনতায় চটির পর চটি পেরিয়ে গেছি বিজয়গর্বে—পথকষ্টের পরোয়া না করে, আপন অজ্ঞতাকে সর্বজ্ঞতা জেনে, হিমালয়ের তোয়াক্কা না রেখে। অবশেষে কেদারনাথ, সেই বিশাল জিজ্ঞাসাচিহ্ন। যৌবনের প্রান্তে পৌঁছতেই যে অজ্ঞেয় প্রশ্ন প্রত্যেক যুবকের অবশিষ্ট উৎসাহটুকু সমাহিত করে দেয়। তখন অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন উদ্দীপনার লজ্জায় মাথা আপনি নত হয়ে আসে। তারও পরে কেদারনাথ থেকে প্রত্যাগমন। সেই ক্লান্ত দেহ, ক্ষতবিক্ষত পদ, মুমূর্ষু মন নিয়ে অন্তর্ক্ষোভ ও আত্মগ্লানির বোঝা মাথায় পরাজিত আমি নিজের বিষে জর্জরিত হয়ে নেমে আসছি। গৌরীকুণ্ড, রামপুর, নারায়ণ, ফাটা চটির পর কত চটি চোখ বুজে পেরিয়ে এলাম; বায়ুশূন্য বেলুনটি যেমন আকাশ থেকে নেমে আসে। মনে তখন কণামাত্র আশা নেই। কী হবে বদ্রিনাথ গিয়ে? কেদারনাথের কাছে আমার অত প্রত্যাশা ব্যর্থ হয়েছে, বদ্রিনাথের কাছে আমি আশা করব কী? তীব্রতর আঘাত ছাড়া? কী করব, ফিরে যাব যাত্রা স্থগিত রেখে? যৌবনের মোহ শেষে প্রত্যেক যুবক যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, আমি তাই পালন করব? কিন্তু এই সকল প্রশ্নের জবাব পাবার আগে তুঙ্গনাথের চড়াই-উতরাই ভেঙে, একটুও বেশী ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে এই তো বেশ চমোলী এসে পৌঁছে গেছি। নিশ্চিন্তমনে বাসে উঠে বসেছি। এখন গাড়ি ছাড়লেই হয়।

কিন্তু গাড়ি ছাড়তে তখনও অনেক দেরি। দূর উপত্যকার গভীর থেকে, যেন অন্তরের অন্তঃপুর থেকে, অলকানন্দার প্রবাহগীতি শুনতে শুনতে আমার মনে হল, আসলে এই যাত্রাটাই বৃহত্তর জীবনের ক্ষুদ্রাকৃতি কিন্তু সামগ্রিক একটি চিত্র। এই যাত্রাপথের শৈশব আছে, আছে স্বপ্নশেষ; যৌবন আছে, আছে মোহমুক্তি; প্রৌঢ়ত্ব আছে, আছে তার তিক্ত অতৃপ্ত অক্ষম বাসনা; এবং প্রৌঢ়োত্তর শান্তি ও শান্ত বার্ধক্যও অবশ্যই থেকে থাকবে। তা ছাড়া কত কথা জানলাম, কত বিষয় বুঝলাম, বৃহত্তর জীবনে যা জেনেও জানা হয় না, বুঝেও বুঝতে বাকি থেকে যায়। পরিচয় হল কতজনের সঙ্গে। তাঁদের এক-একজন এক-এক রকম। কেউ হাসছে তো কেউ কাঁদছে, কেউ বাচাল তো কেউ মূক, কেউ ছুটছে তো কেউ খোঁড়াচ্ছে—সবাই বিভিন্ন, যেমন জীবনেও। কিন্তু মূলে যে সবাই এক, সবাই যে আসলে একই খুঁটিতে বাঁধা সেইটে এখানে

এসে জেনেছি। বৃহত্তর মনুষ্যের হাটে এইটে সর্বদা জানা হয় না। সেখানে যাকে খারাপ বলে জানি, সেই জানা নিয়েই মরি। এখানে গৌরীকুণ্ডে যাকে নির্দয় মনে হয়, তুঙ্গনাথে দেখি সে সদয়। উতরাইতে যে শশক, চড়াইতে আবার সেই কচ্ছপ। তারপর ভাল-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত, আস্তিক্য-নাস্তিক্য, ঘৃণা-শ্রদ্ধা—এই সব, ইংরেজীতে যাকে বলে 'অবজেক্‌টিভ ভ্যালুজ'—যে আসলে মূলহীন, এ যাত্রাপথের ক্ষুদ্রতর পটে তা বুঝতে খুব বেশী মেধা নিষ্প্রয়োজন। জীবনের বিস্তৃততর পরিধিতে যে যোগাযোগগুলো দূরাগত, এখানে তা পাশাপাশি। এই যাত্রাপথ যেন জীবনের সহজপাঠ।

জীবনে যেমন অভাব-অভিযোগের অন্ত নেই, এখানেও তেমনি পায়ের ব্যথা লেগেই আছে। অভাব-অভিযোগ সত্ত্বেও জীবন যেমন থেমে থাকে না, পায়ের ব্যথা টেনে টেনে এখানেও তেমনি পথ অতিক্রম করতেই হয়। কিন্তু ফিরে যেতে পারি, কে ধরে রাখবে? মরতেও পারি, কার সাধ্য রুখবে? মরি কি, যে ফিরব! জীবনের অভাব-অভিযোগ অতিক্রম করেও যেমন রোমাঞ্চ আছে, এ পথের পথকষ্টও তেমনি পুরস্কারহীন নয়। এবং অবশেষে জীবনের রোমাঞ্চ একদিন সব নিঃশেষ হয়ে যায়, এই পথকষ্টেরও হয়তো তখন বলবার মত কোন পুরস্কার মেলে না; কিন্তু তখনও চেতনাতীত কোন ঐশী আনন্দ অবশ্যই থাকে। নইলে মৃত্যু এসে কড়া-নাড়া পর্যন্ত সবাই কেন বাঁচে? কেদারনাথের প্রবঞ্চনার পরও কিসের আকর্ষণে আমি বদ্রিনাথের পথে পা দিই?

আরও দেখেছি যে, সিদ্ধির চাইতে সাধনা বড়, লক্ষ্যের চাইতে বড় পথ। কেদারনাথের প্রবঞ্চনা আমি ভুলতে পারি নি, কিন্তু কেদারনাথে যাওয়া-আসার পথের আনন্দ সেই প্রবঞ্চনাকেও ছাড়িয়েছে। বুঝেছি যে, কখনও কিছু আশা করতে নেই, কখনও কিছু দাবি করতে নেই। তা হলেই আশাতীত পাওয়া যায়, কখনোই প্রত্যাখ্যাত হতে হয় না। জেনেছি যে, কিছু পেতে হলে উচিত মূল্য দিতে হয়; ফাঁকির বদলে মেলে শুধু মেকী। যে সম্ভাবনাকে সম্ভব করতে হলে শুধু অতীত ভুললে চলে না, ভবিষ্যতের চিন্তাও ত্যাগ করতে হয়। কিন্তু এইগুলোর একটাও বোধ হয় মৌলিক শিক্ষা নয়, সব সেই শৈশবে-পড়া শিশুবোধের শিক্ষা। তবে এইটেও শিখেছি যে, কেদার-বদরিকার পথ পরিক্রমণের

পূর্ব পর্যন্ত আমি শিশুই ছিলাম। আর সব চিরন্তন সত্যই তো প্রচলিত সত্য।

নিথর বাসের জানলাপথে চিরস্থির হিমালয়ের ফাঁক দিয়ে যত দূর দৃষ্টি যায়, সেই অনন্ত পর্যন্ত জীবন ও এই পথ সমান্তরাল বয়ে গেছে। একটি রেখারও এতটুকু নড়চড় নেই। অবশেষে হাই তুলে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করতে হল।

সেই মুহূর্তে যুক্ত তর্জনী ও মধ্যমা ওষ্ঠে স্পর্শ করে একটি লোক জানলার বাইরে এসে দাঁড়াল। মুদ্রাটি আমার চেনা, তাকিয়ে দেখলাম লোকটিও পরিচিত। সেই প্রগলভা বাঈজী—রামওয়াড়ায় যাঁর সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম—তাঁর কুলি। এর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল ভীড়ি চটিতে এক নির্জন ক্লান্ত সন্ধ্যায়। হেসে ওকে একটা সিগারেট দিলাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, কী খবর? সেই রামওয়াড়া চটির পর তোমাদের আর দেখেছি বলে তো স্মরণ হয় না।

সিগারেটটায় প্রাণপণে ছুটো টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে লোকটি কপাল স্পর্শ করে বলল, শেঠজী, সব এই নসীব! এ সালে কেদারনাথ দর্শন কপালে নেই, রামওয়াড়া পর্যন্ত এগুলেই আর কী হবে? সকালবেলা সবাই যখন 'জয় কেদারনাথ' বলে চড়াই ভাঙতে শুরু করল, তখন মাঈজীর হুকুম হল—উতরাই নাম।

হঠাৎ এমন বিদঘুটে হুকুম করতে গেলেন কেন তোমার মাঈজী?

ওই যে বললাম, কপালে নেই কেদারনাথদর্শন। নইলে আগের দিন কত রাত পর্যন্ত খুশী মনে গান করলেন। আপনারা সবাই উঠে আসবার পরেও সেই সাধুজীকে একটার পর একটা কত গান শোনালেন। অথচ পরদিন সকালে দেখি, সমস্ত রাত কেঁদে কেঁদে মাঈজীর মুখ ফুলে উঠেছে। চেরা গলায় আমায় বললেন—ফিরে চল। তা চল, ভাগ্যের লিখন তো খণ্ডাবার নয়।— সিগারেটটায় আরও জোরে ছুটো টান দিয়ে লোকটি মুখ দিয়ে হতাশাসূচক একটা শব্দ করল।

আমার তখন মনে পড়ল, কর্নেল-পত্নীর পারলৌকিক অভিভাবক সাধুজীর সেই অস্বাভাবিক দ্রুত পথ-হাঁটা, সেই মন্দাকিনীর শীতল জলে আবক্ষ ডুবিয়ে সূর্যপূজা, সেই কাণ্ডিতে চেপে নতমস্তকে প্রত্যাগমন।

ব্যাপারটা যেন কতকটা আঁচ করতে পারলাম। মনটা বিষন্ন হয়ে গেল। বাইজীর আর কেদার-বদরী দর্শন হল না। সাধুজীরই কি হয়েছে!

একটু পরে লোকটি আবার এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে এক গাল হেসে বলল, কিন্তু এ যাত্রায় আমার বদ্রীনাথজী-দর্শন কেউ বন্ধ করতে পারবে না শেঠজী। সেও ভাগ্যের লিখন। রুদ্রপ্রয়াগে ফিরে এসে মাঈজীকে বলতে, তিনি আমার সব টাকা দিয়ে আমাকে ছেড়ে দিলেন। তখন রোজ প্রয়াগে স্নান করি, আর শিবজীকে ডাকি। এমন সময় রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছে এক শেঠজীর কুলি অসুস্থ হয়ে পড়ল, শেঠজী কেদারে যাবেন না, শুধু বদ্রীনাথ। তাই সই, শেঠজীর নৌকরি নিয়ে নিলাম। এবার আমাকে কে ফেরায়?

একটু হেসে বললাম, কিন্তু এবারও যে গতবারের মত কিছু ঘটবে না, তা কেমন করে জানলে?

নাঃ, এবারে আর তা ঘটতে পারে না।—সহাস্য বদনে লোকটি আঙুল তুলে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত একটি বাসের জানালা পথে ওর নতুন মনিবকে দেখিয়ে দিল। এবার আমিও আর হাসি চাপতে পারলাম না। কেন না, এই নতুন মনিব ও মনিবনী দুইজনেই সাক্ষাৎ দুটি গুড়ের নাগরী। বাইজী যে ফাঁদে তলিয়েছে, এঁদের দেখলে সেই ফাঁদ অন্তত আপনি রুদ্ধ হয়ে যাবে!

মহা-পরিতৃপ্তির সঙ্গে লোকটি ধোঁয়া ছাড়তে লাগল, এই সব অমার্জিত অশিক্ষিতদের সঙ্গে বাক্যালাপের সুবিধেই এই যে খুব বেশী বাক্যব্যায়ের প্রয়োজন হয় না, নির্বাক থাকলেই এদের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান সহজ হয়।

কিন্তু এই লোকটি এসে উপস্থিত হবার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত যে জীবন-জিজ্ঞাসায় আমি ব্যস্ত ছিলাম সে-টা ছিল কিঞ্চিৎ কড়া-পাকের। এই বাক্যালাপের ব্যাঘাত সত্ত্বেও সেই চিন্তার গতি কণামাত্র বিক্ষিপ্ত হল না। বরং অপরাপর উপকরণের অনুকূলতায় অচিরেই অত্যন্ত বেগবতী হয়ে উঠল। অতীতের অবোধ্য অর্দ্ধ-বিস্মৃত অভিজ্ঞতার অকূল সমুদ্র—তার উপর মানুষের কাম ক্রোধ লোভ, ত্যাগ তপস্যা তিতিক্ষা—অজ্ঞেয় নিয়তি যেন অনন্তকাল ধরে এক মর্মান্তিক গেণ্ডুয়া খেলায় মেতে আছে। এই ধরণের উন্মত্ত চিন্তার যা অনিবার্য পরিণতি—কিছুক্ষণের মধ্যেই

আর বাস্তব অবাস্তবের মাঝখানে ক্ষীণতম ভেদরেখা রইল না। অতীত ও বর্তমান যেন একই ভাবের দ্বিবিধ প্রকাশ! ভালো-মন্দ কর্তব্য-অকর্তব্য কার্য-কারণ সব মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেল। বিশ্ব-জগৎ যেন দূরে সরে গেল হাত দশেক, একটি নিঃসঙ্গ চেতনা আদিগন্ত শূণ্যতায় টিপ টিপ করতে থাকল। আমি সদাগরী অফিসের সাধারণ কেরাণী, এমন নেশায় কোন কালে অভ্যস্ত নই। এ-নেশা ছাড়াবারও কোন কৌশল জানা নেই আমার। আমার বেলায় তাই এমন ঐশী-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া আর মহারণ্যে পথ হারানো একই কথা। আপন অসহায়তায় আপনার দিকে ফিরে চাইতেও ভুলে গেলাম।

এমন সময় ননীবাবু ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলেন। যেমন হতেই হয়, যেমন চিরকাল হয়ে থাকেন। কেন না, যে আগ্রাসী শূণ্যতার মুখব্যাদানে আমি অমন অসহায় হয়ে পড়েছিলাম তারও অধিকারী অনধিকারী বিচার আছে। আমার সুদীর্ঘ সাতাশ বৎসরের নাগরিক জীবন এবং এম্পিরিসিস্ট শিক্ষা সেই ঐশী-ব্যাধির নিশ্চিত প্রতিষেধক। ননীবাবুর এই আকস্মিক আবির্ভাব যতই অপ্রত্যাশিত হোক সে-টা পূর্ব-স্থিরিকৃত ছিল! অপর ধার থেকে সংবাদের প্রতীক্ষায় বসে বসে ক্লান্ত বিরক্ত হয়ে ননীবাবু গিয়েছিলেন এক গেলাস চা পান করতে। তিনি এসে বসতে আমি উঠে দাঁড়ালাম।

বাস থেকে নামতেই সেই নাস্তিক সাধুর সঙ্গে হঠাৎ চোখাচোখি হয়ে গেল। অদূরে একটি চায়ের দোকানের বাইরে তিনি একা বসে ছিলেন। আমি এগিয়ে যেতে বললেন: এই যে আসুন, সিগারেট আছে নিশ্চয়ই!

আছে বইকি, সিগারেট না থেকে পারে, সে-যে আমার রক্ষাকবচ!

আমার স্বীকারোক্তি শুনে নাস্তিক সাধু আর হেসে বাঁচেন না। আমি দু' গেলাস চায়ের নির্দেশ দিলাম। হাসির দমকটা কেটে যাবার কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার প্রশ্ন করলেন: আচ্ছা আপনাদের ননীবাবুর কী হয়েছে বলুন তো?

এইবারে আমাকেও একটু বিমর্ষ হাসতে হল। অসহায়তা গোপন না করেই বললাম: দেবা ন জানন্তি, আমি কেমন করে বলব! তবে শুনছি না-কি ইদানীং প্রেমে পড়ছেন।

কিন্তু সে-টা কি কার্য না কারণ?

হয়তো দুটোই! খুব সম্ভব লেজে-গোবরে জড়িয়ে ফেলেছে।

আশ্চর্য, এবারে আর কেউ হাসলাম না। দুজনে নীরবে সিগারেট পান করতে থাকলাম। অবশেষে নিঃশেষিত সিগারেটটি দূরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে নাস্তিক সাধু আবার বললেন: আপনাদের ননীবাবুকে দেখে আজ হঠাৎ বহুদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। সামান্য ঘটনা, ভুলেই গিয়েছিলাম। সেই পিসিমাও বিগত হয়েছেন অনেক দিন। আমার সেই পিসিমার ছিল পাখী পুষবার সখ—সখ নয় প্রায় প্যাশন। ময়না, টিয়া, কাকাতুয়া কত অজস্র পাখীর খাঁচা যে তাঁর ঘরের দাওয়ায় ঝুলত তার ইয়ত্তা নেই। তিনি নিজে হাতেই সেগুলোকে খাওয়াতেন স্নান করাতেন সেবা-শুশ্রূষা করতেন, আবার অবসর মতো বসে কথা শেখাতেন। পিসিমার কাছ থেকে কোন সুবিধে আদায়ের তখন পন্থাই ছিল তাঁর কোন পাখীর প্রশংসা করা! যখনকার কথা আমি বলছি পিসিমার তখন বয়স হয়েছে, তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় তখন দুটি মাত্র পাখী প্রতিপালিত হয়। একটা ময়না আর একটা টিয়ে। দুটোই পারদর্শী বক্তা ছিল। হাসত কাঁদত ঠাকুরের নাম জপত আবার অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করত। কিন্তু বয়স হবার দরুণ পিসিমা সব-সময় এদের দেখাশুনা করতে পারতেন না; এদের শুশ্রূষার কতকটা দায়িত্ব তাই আমার উপর এসে পড়েছিল। আমি তখন বাচ্চা ছেলেমানুষ, প্রথম দিনই স্নান করাতে যেতে টিয়েটা উড়ে পালাল, সঙ্গে সঙ্গে আমি কেঁদে ফেললাম।—ততটা টিয়ের বিরহে নয় যতটা পিসিমার ভয়ে। পিসিমা কিন্তু ঘটনা শুনে হেসে ফেললেন, বললেন: আরে পাখী পালিয়েছে তো কাঁদবার কি হয়েছে! সন্ধ্যে হলে দেখবি আপনা থেকেই আবার ঠিক উড়ে আসবে। সত্যি তাই হল. বিকেল হতে না হতেই দেখি টিয়ে আবার ঠিক নিজের খাঁচাটিতে বসে আছে, অথচ খাঁচার দরজা তখন খোলা! সেই থেকে দ্বিগুণ উৎসাহে আমার শুশ্রূষা আরম্ভ হল। কিন্তু শুশ্রূষার ওই আতিশয্য ময়নার বেশীদিন সইল না। শোক সংবাদ শুনে পিসিমা আর্তনাদ করে উঠলেন,—তিনি না-কি চিরকালই বলে আসছেন যে ভগবানের জীবকে অমন খাঁচায় আটকে রেখে মারলে মহাপাপ হয়। টিয়ে পাখীটিকেও তক্ষুণি ছেড়ে দেবার আদেশ হল। আমারও তখন

শ্মশান বৈরাগ্য, দ্বিতীয় চিন্তা না করে খাঁচার দরজা খুলে দিলাম। মুহূর্তমধ্যে পাখীটা নীল আকাশে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

সন্ধ্যা বেলায় সেদিন মেজাজটা বিশেষ ভাল ছিল না। নম বিষ্টু নম বিষ্টু করে লেখাপড়া সেরে সন্ধ্যার পরই সোজা পিসিমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। অন্ধকারে পিসিমা একের পর এক পাখীর গল্প বলতে শুরু করলেন আমাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য।—হয়তো নিজেকেও। এমন সময় হঠাৎ পাখা ঝটপট করে আমাদের টিয়ে পাখীটা অন্ধকার ঘরে এসে ঢুকল। তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠতে দেখি দরজার সামনে একটা বেড়ালের দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে! বিষয়টা বুঝতে আদৌ বিলম্ব হল না। তবে রক্ষা এই পাখীটা খুব জখম হয়নি, একটা পাখায় কেবল সামান্য একটু আঁচড় লেগেছিল। অল্প শুশ্রূষাতেই আবার সুস্থ হয়ে উঠল।

কিন্তু পরদিন সকালে আর পাখীটার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। সূর্যোদয়েরও আগে কখন খোলা জানলা দিয়ে পালিয়ে গেছে। তারপরে কয়েক দিন পর্যন্ত সন্ধ্যা হলেই পাখীর খাঁচাটি আগলে বসে থাকতাম। কিন্তু পাখীটা ফিরেছিল ঐ একদিনই, আর কোনদিন ফেরে নি।

মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে নাস্তিক সাধু আবার মৃদু হেসে বললেন: খাঁচার নেশা জানেন তো, খুব সহজে কাটবার নয়। বড়ো রকমের কোন আঘাত না পেলে হয়তো কোনকালেই কাটে না। আপনাদের ননীবাবু হয়তো ছাড়া পাবার প্রত্যাশায়ও আসেন নি, নেহাৎই পালিয়ে এসে থাকবেন। ওঁকে দেখলে বড়ো কষ্ট হয়।

আমি চুপ করে রইলাম। পাছে ধরা পড়ে যাই সেই ভয়ে আর ভালমন্দ কিছুই বললাম না। অবশেষে প্রথম সুযোগেই উঠে পড়ে বাসে নিজের আসনটিতে এসে বসলাম। নিজেকে কেমন যেন অভিযুক্ত অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল, ভৎসিত ও দণ্ডিত।

অবশেষে বেলা তিনটে নাগাদ অপর পারের সম্মতি এসে পৌছল। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। বোঝা গেল যে, কোলাহলটা কথঞ্চিৎ স্তিমিত হয়েছিল। তাড়াহুড়া করে যাত্রীরা এসে বাসে বোঝাই হতে লাগল। আমাদের ঠিক সামনের বেঞ্চেই কর্নেল-পরিবার সমাসীন হলেন। কেবল তাঁদের পারলৌকিক অভিভাবকটি

অনুপস্থিত। অচিরেই যাত্রীদের সমবেত 'জয় বদরীবিশাললাল' ধ্বনি ছাপিয়ে আর্তনাদ করতে করতে বাস চড়াই ভাঙতে শুরু করে দিল।

এইবারে আমার আসন বাসের একদম বাঁ দিকে। আমার ডাইনে ননীবাবু, সামনে কর্নেলের ষোড়শী কন্যা, আর বাঁয়ে—ঠিক বাঁয়ে নয়, বোধ হয় তলায়—গভীর উপত্যকার তলদেশে উচ্ছ্বাসময়ী অলকানন্দা। কিন্তু বাসের কর্কশ আর্তনাদে অলকানন্দার সান্ত্বনাগীতি চাপা পড়ে গেছে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই যথারীতি আবার সবাই প্রাণভয়ে কণ্টকিত হয়ে উঠলাম। এবারে যেন আমার মত অন্য সবাইকেও অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায়—প্রায় মাত্রাতীত ভীত বলে মনে হল। অথচ যাত্রীদের কারুরই পার্বত্য পথে এই প্রথম বাস-ভ্রমণ নয়। এমনও নয় যে, এই রাস্তাটুকু অধিকতর বিপদসঙ্কুল, তবুও। যাত্রীদের সকলের মুখ সাদা কাগজের মত ফ্যাকাশে রক্তহীন। ধ্বনি দিয়ে বা বিড়ি টেনেও ভয় তাড়াবার সামর্থ্যটুকু কারও কণ্ঠে বুঝি নেই। পরে ভেবে দেখেছি ওই মাত্রাতিরিক্ত ভীতির কারণ সম্ভবত এই যে, বাসের যাত্রীদের সবাই সেদিন অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন, প্রত্যেকেরই পা ছিল অল্পবিস্তর ক্ষতবিক্ষত। পাশের পাতালগভীর প্রস্তরসঙ্কুল উপত্যকায় বাসসুদ্ধ একবার পড়লে কারোরই আর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতাটুকু দেহে নেই। অতএব ভয়। অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ভয়।

মনটাকে ব্যাপৃত রাখবার প্রয়াসে, প্রথমটায় চোখ বুজে—ভয়ের সময় যা করে থাকি—তাড়াতাড়ি ঈশ্বরের নামোচ্চারণ করতে লাগলাম। কিন্তু বঙ্গের প্রান্তরে চোখ মুদলেই যেমন চোখের সামনে ঈশ্বরের স্নেহময়ী মাতৃমূর্তি ভেসে ওঠে, এখানে তা উঠল না। কোন পুরুষমূর্তিও সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হল না, তবে কেমন যেন একটা কাঠিন্যে, নির্দয় নিয়মানুবর্তিতার পেষণে হাঁপিয়ে উঠলাম।

তখন বাইরের দিকে চাইলাম, অলকানন্দার গভীরতা পেরিয়ে—অপর পারের পাহাড়ের গায়ে যেন তুলির আঁচড়ে আঁকা চড়াই উতরাই পায়ে-হাঁটা পথটির দিকে। মাঝে মাঝে দুটো চারটে যাত্রীদলকে থেমে থেমে চলতে দেখা যাচ্ছে—পিঁপড়ের মত। অত্যন্ত ছোট, কিন্তু সর্বাঙ্গ সমেত একেবারে সুস্পষ্ট। ওদের চলার স্বচ্ছন্দ গতি, মনের আনন্দ, চিত্তের পূর্ণতা, পরিপার্শ্বের উদারতা, সমস্ত কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পথ

মোটেই দীর্ঘ নয়, বাসে ন মাইল, পায়ে এগারো। এক বেলার মাত্র পথ। দিনের পর দিন হেঁটে, এই সামান্য পথটুকু এড়াবার জন্যে নিজেকে কি মর্মান্তিক অপমানিতই করলাম! কিন্তু তখন নিজেকে বা বিজ্ঞানকে গাল দেবারও উৎসাহটুকু অবশিষ্ট ছিল না।

অন্য কোন বিষয়ের খোঁজে আবার বাসের ভিতর চোখ ফিরিয়ে আনলাম। সামনেই কর্নেল-কন্যার উপর প্রথমে চোখ পড়ল। বেচারীর কল্পনার্ধটুকুও যেন মিলিয়ে যেতে বসেছে। অবয়ব তো এমনিতেই রক্তহীন, এখন যেন আরও বেশী ফ্যাকাশে। ভয়ে একদম নীল। বড় বড় চোখ দুটো যন্ত্রণায় আরও বড় হয়ে উঠেছে। উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত চোখ দুটোর দিকে চাইলে ওর ভীতির পরিমাণ কতকটা অনুমান করা যায়। প্রশস্ত ললাটের উপর কয়েকগুচ্ছ রুক্ষ চুল এসে পড়েছে, বাতাসে এলোমেলো উড়ছে। বেচারী কখনও জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চাইছে এবং পর-মুহূর্তে চোখ বুজছে। কখনও দুর্বল মুঠিতে শক্ত করে নিজের আসনটাই চেপে ধরছে, একটু পরে হাল ছেড়ে হেলান দেবার জায়গায় মাথা এলিয়ে দিচ্ছে। এমন বীভৎস সৌন্দর্য যে সম্ভব কোনদিন কল্পনা করি নি। আমার পার্শ্বে ননীবাবুও ওর দিকেই উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে ছিলেন।

একটু পরে, হ্যাঁ, এই কথাটিও বলতে হবে, একটু পরে কর্নেল-কন্যা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলেন না। বমি করতে শুরু করলেন—মুহূর্তকাল আগে যাঁর ভীতিপ্রদ সৌন্দর্য থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না, তাঁর দিকে চাইতে এখন করুণা, প্রায় ঘৃণা বোধ হ'ল। চেয়ে দেখি, ননীবাবুর দু গালেও কে যেন দুটো চড় বসিয়ে দিয়েছে।

ক্ষণেক পরেই আর বাস রইল না, মৃত্যুভয় রইল না, কর্নেল কন্যা রইলেন না, ননীবাবুও নয়। শুধু দিগন্তাতীত শূন্যতা। মুদিত চোখের সামনে সমাহিত তুষারাবৃত কেদার পর্বত। বাঁকা পথটা কেবল স্পষ্টতর।

দূরতম বৈপরীত্যগুলোর মধ্যে কি আশ্চর্য ঐক্য!

বাঁধানো সাঁকোয় নাম-না-জানা একটি নদী পেরিয়ে অপর একটা পাহাড়ের অর্ধেকটা ঘুরে বেলা পাঁচটার সময় বাস পিপুলকোটি পৌঁছল। পিপুলকোটি বেশ বড় এবং ব্যস্ত চটি। চটি নয় চক। সারি সারি

দোকান, আপেক্ষিক বিচারে দোকানে পণ্যেরও অকুলান নেই। যাত্রীর ভিড়, কুলির ভিড়, ডাণ্ডি-কাণ্ডিওয়ালার ভিড়, ঘোড়ার ভিড়। দরাদরি হাঁকাহাঁকি হৈ-চৈ। একটার পর একটা বাস এসে থামছে, ধুলোর আবরণে হিমালয়ের মুখ আবৃত হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে হয় বুঝি বা চিৎপুরেই আছি। অমন অশ্লীল অবসাদও কেবলমাত্র চিৎপুরের পাশবিক সন্ধ্যায়ই সম্ভব বলে এতকাল জানা ছিল। বাস থেকে নেমেই আমরা হাঁটা পথ ধরলাম গরুড়গঙ্গার উদ্দেশ্যে। মাত্র চার মাইল। বেলাবেলি পৌঁছে রাত্রিটা স্বস্তিতে ঘুমনো যাবে।

কিন্তু গরুড়গঙ্গায় পৌঁছে সামান্য হতাশার সঙ্গে আবিষ্কার করতে হোল যে, জগতে আমরাই একমাত্র বুদ্ধিমান নই। আমরা আসবার অনেক আগে থেকেই যাত্রী সমাগমে চটি শুধু কানায় কানায় পূর্ণ নয়, ইতিমধ্যে উপছে পড়ছে। চৌধুরীজীকে অনেক তোষামোদের পরেও কালীকমলীওয়ালার ধর্মশালায় একটু স্থান সঙ্কুলান হল না। আরও দু-দশটা চটিতে বৃথা অন্বেষণের পর অবশেষে যদিবা একটু জায়গা পাওয়া গেল, তখন তা দেখে নিশ্চিন্ত হওয়া দূরের কথা, চোখের জল সামলানোই হল দায়। একে তো চটি অল্প পরিসর, তায় আবার উত্তর দক্ষিণ দুটো দিকই উদম খোলা। মেঝে চষা-জমির চাইতেও বেশী অসমান। সর্বোপরি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত এক মাদ্রাজী দম্পতি কুৎসিত ক্ষতগুলো অনাবৃত করে আমাদের অনতিদূরেই দেহ ছড়িয়েছে। সব দেখেশুনে আমার মনও রি-রি করে উঠল। কিন্তু তারাদার রাগান্বিত কর্মতৎপরতা ও ননীর খুঁতখুঁতুনি দেখে হেসে ফেললাম।

বাস্তব জীবনে অসুবিধে উপভোগ করা আমি আদৌ শ্লাঘাজনক মনে করি না। কেউ কেউ যেমন চা-সিগারেট পান না করে গর্বিত, বা কেবল কম্বল পেতে শুয়ে আত্মতুষ্ট, এবং শীতের সময় গায়ের চাদরটিও পরিহার করে প্রত্যূষে স্নান করে নিজেকে মহত্তর ভাবেন, আমি ঠিক তাঁদের দলের নই। বিলাসী বলে অভিহিত হলে আমি সেটাকে কুৎসা বলেই ধরে নেব, তবে তৎসহ সবিনয়ে স্বীকার করব যে আমি দ্বিতীয় ভাগের সুশীলও নই। সাধুসন্তদের অনাড়ম্বর জীবনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু তা অনুসরণের কণামাত্র অভিলাষ নেই। শুধু তাই নয়, খেতে বসবার আগে জল-লেবু পরিবেশিত

না হলে বা পোষাক পরিধানের পর যদি দেখি ট্রাউজারসের একটি বোতাম ছেঁড়া তাতেও জীবনের প্রতি আমার বিতৃষ্ণা জন্মে। জন্মে নয়, জন্মাত। কেন না—আবার হাসি পেল, এই যাত্রাপথে রওয়ানা হবার সেই প্রথম দিনটি থেকে আজ পর্যন্ত শুতে যাবার আগে কেউ শয্যা পেতে দেয় নি, খেতে বসবার জন্যে কেউ একবার ডাক দেয় নি। খেয়েছি যত্রতত্র, শুধু ডাল আর ভাত আর আলু; শুয়েছি হট্টমন্দিরে, লেপ নেই তোশক নেই খাট পর্যন্ত নেই, কেবল কম্বল সম্বল। কিন্তু খেয়াল করেছি কি? অসুবিধেগুলো গায়ে লাগলেও কখনও মনে লেগেছে কি? স্মরণ হয় না। তবে তারাদার মত কারও উপর অভিমান করি নি, রাগ করি নি, যেমন আজও করছি না। ননীবাবুর মত সদাসর্বদা খুঁতখুঁত করি নি, ভ্রূ কুঞ্চিত করে থাকি নি, যেমন আজও করছি না। এই অসুবিধেগুলো প্রত্যাশিত না হলেও একান্তই যে স্বাভাবিক সেই সহজ কথাটা এঁরা বোঝেন না কেন! বৈষয়িক ব্যবস্থাপনার গুরুভার নিপুণতর সহযাত্রীদের উপর অর্পণ করে আমি সন্তর্পণে একটু দূরে পালিয়ে এলাম। যেখানে অজস্র অগণ্য প্রস্তরখণ্ডের সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রতিকূলতার পাশ কাটিয়ে একে-বেঁকে ত্বরিৎ গতি স্ফটিকধারা গরুড়গঙ্গা বয়ে চলেছে অলকানন্দার উদ্দেশ্যে। সে নির্জনতায় দিবসের অবসাদটুকু অপনোদনের প্রয়াসে একটা পাথরের উপর বসলাম। যদি গরুড়গঙ্গার কলধ্বনিতে বাসের অবশিষ্ট আর্তনাদটুকু শুব্ধ হয়।

সূর্য ইতিমধ্যে পাহাড়ের আড়ালে ঢলে পড়েছে। হিমালয়ের গায়ে গায়ে জমে উঠেছে অন্ধকার। গরুড়গঙ্গা চটি যেন হিমালয়ের বিশাল পটে একটি রিলিফ চিত্র—কুঁদে কুঁদে আঁকা। সাদা আর কালো, আলো আর ছায়া, নদী পর্বত আর শান্তি।

অনেকক্ষণ অন্যমনা বসে থাকবার পর অবশেষে আবিষ্কার করতে হল যে, কখন থেকে যেন অনায়াসে বাসের সেই কর্ণেল-কন্যার কথা ভাবছিলাম। বেশ একাগ্রমনেই ভাবছিলাম সেই কৃশাঙ্গিনীর কথা। প্রায় যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখছিলাম—সেই বিদগ্ধ সৌন্দর্য আর সেই অসহায় বীভৎসতা। কিন্তু মনে আর সেই বিষাক্ত ঘৃণা নেই, সেই ক্লীব করুণা নেই,—এমন কি অভ্যস্ত 'সীনিসিজমের' আবরণেও নিজের দৃষ্টিরুদ্ধ করবার কোন প্রয়োজন অনুভব করলাম না। সমগ্র ঘটনাটি আর একবার বিশদভাবে চোখের

সামনে ঘটে গেল। সমবেদনায় সামান্য একটু আর্দ্রও হলাম না। যুক্তিবাদের সূত্রে ঘটনাটি ব্যাখ্যা করবারও উৎসাহ পেলাম না। ঘটনাটি ঘটল যেন আমার চেতনা থেকে পুরো দশ হাত দূরে এবং বাইরে। কিন্তু ঘটনাটি লক্ষ্য করছিলাম খুব উদ্‌গ্রীব নিষ্পলক দৃষ্টিতে। বিপর্যয়ের পরবর্তী দৃশ্যটা যেন তীক্ষ্ণতর রেখায় জ্বল জ্বল করতে থাকল। প্রথম আঘাতেই পর্যুদস্ত হবার পর অবস্থাটা কতক সামলে নিয়ে কর্ণেল কন্যা আসনের পেছনটায় মাথা এলিয়ে দিলেন। চক্ষু মুদিত রাখলেন। মুহূর্ত মধ্যে মুহূর্তকাল আগেকার সমস্ত কুৎসিত বীভৎসতা অবয়ব থেকে নিঃশেষে অপনোদিত হয়ে গেল। মনে হল যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন,—গভীরতম নিদ্রায়, যে নিদ্রা থেকে পুরানো মানুষ কখনো পুনর্জাগ্রত হয় না। ওষ্ঠে বা নাসিকায় বা ললাটে ক্ষীণতম রেখার কলঙ্ক নেই। কলঙ্কের স্মৃতিটুকু পর্যন্ত যেন মুছে গেছে।

অবশেষে পিপুলকোটির মিনিট কয়েক মাত্র আগে তিনি চোখ খুললেন। অশ্লীল অবসাদে আমি নিজে তখন সম্পূর্ণ নিমজ্জিত ; অভিশপ্ত বাস যাত্রার আসন্ন সমাপ্তিতে অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিত। কিন্তু তবু সেই উন্মিলন বুঝি কারোই নজর এড়াবার নয়। মহিলা চোখ মেললেন ; কিন্তু সে-চোখে কণামাত্র লজ্জা বা গ্লানি, সংকোচ বা সন্ত্রাস কোন প্রকার দুর্বলতারই চিহ্ন নেই। সামান্য একটু অবসাদ বা পরাজয়বোধও নয়। মহিলা যেন বহুদূরে সরে গেছেন,—সহযাত্রীদের থেকে চলমান বাস থেকে সবকিছু থেকে লক্ষ যোজন দূরে। আবার যখন তিনি সোজা হয়ে বসলেন তখন কেবল সামান্য একটু বলিষ্ঠ নম্রতা প্রকাশ পেল, একটু বিনীত স্বাতন্ত্র্য। মনে আছে, এর পর বাস পিপুলকোটি এসে থামতে স্বয়ং কর্ণেল সসব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন মেয়েকে হাত ধরে নামাতে। কিন্তু মহিলা মৃদু হেসে নিজে থেকেই ঋজু পদক্ষেপে নেমে পড়েছিলেন। তবে আমি তার আগেই তপ্ত কটাহ থেকে জ্বলন্ত চুল্লির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়ে পিপুলকোটির বিক্ষুব্ধ জনতায় নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছি!

কিন্তু দেব-প্রয়াগে একদিন অপরাহ্ন বেলায় যে কৃত্রিমতা-দুষ্ট কৃশাঙ্গিনীর প্রতি সজ্ঞান অনিচ্ছা সত্ত্বেও আকৃষ্ট হয়েছিলাম, এবং পরবর্তী কালে যে আমার অজ্ঞাতসারেই চেতনা থেকে অনায়াসে খসে গিয়েছিল—যার অস্তিত্বটুকুকেই একটা অসম্ভব বিকৃতি বলে উপেক্ষা করেছি—তার

এমন আকস্মিক পরিবর্তনের কথা দ্বিতীয় বার চিন্তা করেও কিছুমাত্র বিস্মিত হলাম না। এই পরিবর্তনের কোন কারণও গরুড়গঙ্গার পার্শ্ববর্তী অন্ধকার নির্জনতায় খুঁজে পাওয়া গেল না। এর গভীরতর স্বরূপও বহুলাংশে অজ্ঞাত রইল। অবশেষে এক গেলাস চায়ের প্রয়োজন অনুভব করে গরুড়গঙ্গার খাড়ি থেকে পথের উপর উঠে এলাম।

চটির ঘরে ঘরে তখন আলো জ্বলেছে। জগৎজোড়া অন্ধকার বুঝি মিটি মিটি চোখ মেলে আপন ব্যাপ্তি উপভোগ করছে নিঃশব্দে। দীপাবলীর আড়ম্বর এতে নেই, এ কেবল নক্ষত্রখচিত অন্ধকার আকাশের নিঃসীম নির্বাক বিস্তার।

এক গেলাস চায়ের প্রত্যাশায় একটা দোকানের বাইরে বসে ছিলাম। কিন্তু চা ওয়ালার করুণা হবার আগেই দোকানের ভিতর থেকে অকস্মাৎ সাড়ম্বর সম্ভাষণ বিস্ফারিত হল।—এই যে য়ুলিও য়ুরেনিটো! তারপর জীবনের নতুন কোন কোন ব্যাধি আবিষ্কৃত হল? আপন রসিকতায় নাস্তিক সাধু আপনিই আটখানা হলেন। আমারও না হেসে উপায় ছিল না। আমিও ভিতরে গিয়ে বসলাম।

কিন্তু হাসি থেমে যাবার পরেও বলবার মতো কিছু হাতের কাছে না পেয়ে চুপ করে রইলাম,—যদিও গরুড়গঙ্গার সেই নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধতার পর একটু উষ্ণ সান্নিধ্যের প্রত্যাশায় ভিতরে ভিতরে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছিল। অবশেষে গরম চায়ের গেলাসে একটা সশব্দ চুমুক দেবার পর নাস্তিক সাধুই আবার মুখ খুললেন।—কি মশাই, একবার বলুন না বসে বসে অতো কী ভাবছেন। সুসমাচার জমে জমে আমার যে পেট ফেটে যাবার দাখিল!

আবারও হাসতে হল। কিন্তু আবারও চুপ করে যেতে হল। নিস্তব্ধতার ঝিম যেন কিছুতেই কাটছিল না। সাধুজী আপনমনে নানান কথা বলে যেতে লাগলেন সেই অবিন্যস্ত একাগ্রতায়। আমিও কৌতূহল-ভরে শুনে যেতে থাকলাম। অনেকক্ষণ পরে সেই কথাটি মনে পড়ল যেই কথাটি কিছুতেই স্মরণ করতে পারছিলাম না বলে এতক্ষণ কোন কথাই বলা হয় নি। কথাটা গুছোবার তরও সইল না। বললাম: আচ্ছা তখন যে আপনি বলছিলেন, কোন কোন মানুষের সমস্ত জীবনেও খাঁচার নেশা কাটে না। সে কথাটা কি ঠিক?—তাহোলে আবার এমন

কথা বলা হয় কেন যে, শেষ বিচারে সব মানুষই জন্মাবধি মুক্ত! খাঁচার নেশা কথাটারই বা তবে কী অর্থ দাঁড়াল?

প্রশ্নটা যতই অগোছালো হোক তার উত্তরটা যেন বহুদিন আগে থেকেই স্থির করা ছিল। তিনি বললেন: দেখুন, শেষ-বিচার পর্যন্ত যে-সকল মহাপুরুষ প্রাণ-ধারণ করতে সক্ষম তাঁরা হয়তো জন্মাবধিই মুক্ত। কিন্তু আমার আপনার কাছে অমন মুক্তির মূল্য কতটুকু! এই পুঁথিগত মুক্তি দিয়ে তো আমাদের জীবনের বোঝা হাল্কা হবে না। আর খাঁচার নেশা শব্দটার অর্থ জানবার জন্যেই বা অভিধান দেখবার প্রয়োজন কি। আপনিই বলুন, আপনি কতটুকু মুক্ত!

এমন প্রশ্নের জবাবে কেবল নিরীহ একটু রসিকতা করাই সম্ভব। সেটুকু ঔদ্ধত্যও যদি অবশিষ্ট না থাকে তাহোলে চুপ করেই থাকতে হয়। আমি চুপ করে রইলাম। তিনি এইবার ঘনিষ্ঠতর হয়ে বললেন, আসলে গোল বাঁধে যখন মুক্তি বন্ধন এই সকল শব্দগুলো সাধারণ ভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করি। সাধারণভাবে মানুষকে মুক্ত বলার যে অর্থ তা'কে আবদ্ধ বলারও সে-অর্থ। সাধারণভাবে মুক্তি বন্ধন ইত্যাদি শব্দগুলোই অর্থহীন। তবে আমাদের বরাত ভালো যে অমন নৈর্ব্যক্তিক জীবন যাপন করতে আমরা বাধ্য নই। ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবেই ব্যক্তিগত জীবন যাপন করতে হয়; সে জীবনের কোন সমস্যারই নৈর্ব্যক্তিক কোন সমাধান নেই। যদি তা থাকতো তাহোলে মানুষ বহুকাল আগেই চিন্তা-ভাবনা ছেড়ে নিশ্চিন্ত হত। নীতিগত বা ধর্মগত এমন কোন সমস্যা মানুষের আছে যার নির্ভুল সমাধান জাতীয় গ্রন্থাগারে মরক্কো বাঁধাই হয়ে নেই। অথচ তবু দেখুন, মানুষ ঠিক বিভ্রান্ত হচ্ছে, যথা-সময়ে প্রকৃতিস্থতা পরিহার করছে—মাঝে মাঝে আত্মহত্যাও না করে পারছে না। অরণ্যে পর্বতে পরিভ্রমণ করে চলেছে কত লোক। মুস্কিল হয় যখন ব্যক্তিগত সমস্যা নৈর্ব্যক্তিক সমাধানে নিষ্পত্তির চেষ্টা করি, কিম্বা নৈর্ব্যক্তিক সমস্যার উপর ব্যক্তিগত সমাধান আরোপ করি। এমনি করে জট পাকিয়েই সেই সব সমস্যায় উদ্ভব হয়েছে যেগুলোর কোন সমাধান নেই বলে সমগ্র মনুষ্য জাতি সমস্বরে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে থাকি।

নাস্তিক সাধুর কথায় প্রয়োজনানুপাতিক বিরতি ছিল না। কথাগুলো বলছিলেন যেন অত্যন্ত সংযত উৎকণ্ঠা ভরে। কিন্তু এমন

দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকার গুরুত্ব তো দূরের কথা প্রাসঙ্গিকতাটুকুও আমি সঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আপাত সামঞ্জস্য সত্বেও আমার কেবলই মনে হচ্ছিল যে তিনি নানান দূরাগত বিষয় একই সঙ্গে গ্রথিত করে কী যেন বুঝাতে চাইছেন। কথাগুলোর মধ্যে অন্তর্নিহিত কোন যোগসূত্র থেকে থাকলেও তা নজরে পড়ছিল না। কেমন বিমূঢ় বোধ করছিলাম। হতাশ হয়ে একটা সিগারেট ধরাতে হঠাৎ যেন কথার মোড় ঘুরে গেল। তিনি কিন্তু একই স্বরে বলতে থাকলেন।—অথচ ঠিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখুন, কোন সমস্যাই নেই,—না জগতে না জীবনে। আছে কেবল সাধনার স্তরভেদ, সিদ্ধির বিভিন্ন পঁইঠা, এই চটি থেকে অগ্রবর্তী চটি। প্রশ্নটাকে ঠিকমতো উপস্থাপন করলে দেখবেন উত্তরটা তার মধ্যেই নিহিত আছে। ব্যক্তির পক্ষে অলঙ্ঘ্য ব্যক্তিগত সীমারেখার কথা বিস্মৃত না হওয়াই ভালো। সেদিক থেকে দেখুন, দেখবেন একদিকে খাঁচার নেশাটা যেমন সত্য, অপরদিকে মানুষ জন্মাবধি মুক্ত সে কথাটাও মিথ্যা নয়। রাসবিহারী এ্যাভেন্যুর ফুটপাথে যখন নির্লজ্জের মতো মাথা খুঁড়ে মরছিলাম তখন খাঁচার নেশাটাই বড়ো ছিল। অবশেষে একদিন যখন সব ছেড়ে বেরিয়ে এলাম সেদিন সবকিছু—প্রায় সবকিছু অনায়াসে খসে গেল। মানুষ মুক্ত কি আবদ্ধ এ প্রশ্নের জবাব কেবল ব্যক্তিই,—নিজের হয়ে নিজের জন্যে দিতে সক্ষম। ব্যক্তি যদি স্থির করে সে মুক্ত তাহোলে সে মুক্ত, যেই মুহূর্ত্তে স্থির করে সেই মুহূর্ত্ত থেকে মুক্ত! সেই মুহূর্ত্তে জন্মাবধি মুক্ত।

এরপর আমার বিমর্ষতার কারণানুসন্ধানে কোন গবেষণার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু নাস্তিক সন্ন্যাসীকেও যেন বিষণ্ন দেখাল। কেমন একটু ক্লান্ত অবসন্ন বিক্ষিপ্ত এবং চঞ্চল। কয়েক মিনিট মূঢ়ের মতো বসে থাকবার পর হঠাৎ হাসি পেল।

তিনিই জিজ্ঞেস করলেন : কী হ'ল ?

হঠাৎ ভুলে গেছি, সীতা কা'র পিতা!

আমার অসহায়তায় তিনি হেসেই প্রাণ সম্বরণের উপক্রম করলেন। হাসির তোড় একটু কমতে বললেন, দেখুন এই মুক্তি কিন্তু আপনার যা আমারও তাই। রামের যেমন শ্যামেরও তেমনি। তবে আমারটা আপনার নয়, আপনারটাও আমার নয়; রামেরটা রামেরই, শ্যামেরটা

শ্যামের। বিশেষ বিশেষ প্রতিবন্ধকতার ঊর্দ্ধে উঠতে পারলে সবায়েরই সমান অবস্থা। কারো ধর্মে মুক্তি তো কারো সঙ্গীতে, কারো সন্ন্যাসে মুক্তি তো কারো দৈনন্দিন পারিবারিক জীবন যাপনে,—কিন্তু আপন নিয়তির নির্দেশ যাদের দৃষ্টিতে একবার উদ্ঘাটিত হয়েছে তাদের মধ্যে আর কোন পার্থক্য নেই। নিজের সত্তায় কিছুক্ষণ কান পেতে রাখুন; পলো হাতে বিশ্ব-পরিক্রমা করলেও মুক্তির সন্ধান পাবেন না।

কথা কয়টি বলে তিনি চুপ করলেন, যেন আদৌ কোন কথা বলেন নি। যেন কোন দূর-সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে আছেন। সাধুর এই বিচিত্র আচরণের অর্থ সেদিন শত চেষ্টা করেও বুঝে উঠতে পারিনি!

অবশেষে দুজনে আরও কিছুক্ষণ নির্বাক বসে থেকে যে যার চটির উদ্দেশ্যে বিদায় নিলাম। অভব্য কৌতূহল সংযত করে চটির অধিকাংশ আলোই তৎপূর্বে নির্বাপিত হয়েছে। দূরে ও নিকটে দুটো একটা আলোর বিন্দু কেবল ঢিপঢিপ করছে,—অন্ধকার সমুদ্রে দিশেহারা নাবিকের মতো।

পরদিন সকালে শয্যাত্যাগের পরেই আবার তাঁবু ভাঙো। আবার পথ ধরো। নিশার আশ্রয় চটি ছেড়ে নতুন চটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হও। পথ গরুড়গঙ্গায় শেষ হয় নি, কুমার চটি ছাড়িয়েও সামনে চলে গেছে। বেলা পড়বার আগে আবার সেখান থেকেও পাততাড়ি গোটাও। ক্বচিৎ কখনও একটু বিরতির অবকাশ আর শুধু চরৈবেতি চরৈবেতি অক্লান্ত অবিরাম। ঠিক যেমন জীবনে। যেন একই সাধনার এপিঠ ওপিঠ!

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বৃহৎ ঘনবসতিপূর্ণ চটি যোশীমঠে গিয়ে পৌছলাম। এই পাহাড়েরই চূড়াদেশে ভগবান শঙ্করাচার্যের সহস্রাধিক বর্ষ পূর্বেকার সাধনার স্থান। স্থানটির নাম জ্যোতিষ্পীঠ। সামরিক আবাসিকের পাশ দিয়ে, পাকা সোনালী গম ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে আলপনার মত সরু সঙ্কীর্ণ পথ উঠে গেছে ফার্লং দুয়েক। এই পথেরই শেষে জ্যোতিষ্পীঠ। প্রবেশ পথের ডানদিকে একটি প্রস্তর-কুটিরের পাশে কীটদষ্ট জরাজীর্ণ এক বৃক্ষ। কিম্বদন্তী, এই গাছেরই তলায় বসে শঙ্করাচার্য সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। অদূরে দ্বিতল সংস্কৃত বিদ্যালয়। অট্টালিকাটির

চতুষ্পার্শে সুন্দর প্রশস্ত অলিন্দ। সম্মুখের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে অজস্র আখরোট-আপেল-ন্যাসপাতি গাছ। ছোট ছোট গাছ, কিন্তু ফলসম্ভারে প্রত্যেকটিই পরিপূর্ণ। তখনও সময় হয় নি, তবু এর মধ্যেই অধিকাংশ ফল রক্তিম হয়ে উঠেছে। মালীর টিকি মেলে না, আঁকসিরও প্রয়োজন নেই, তবু হাত বাড়িয়ে গাছ থেকে ফল পাড়তে সঙ্কোচ হয়।

জ্যোতির্মঠের প্রধান কক্ষে ভগবান শঙ্করাচার্যের বৃহদাকার একটি প্রতিকৃতি আছে—একটা চৌকির উপর বসানো। চৌকিটিও নাকি তাঁরই ব্যবহৃত। অতি সন্তর্পণে, পাছে ধরা পড়ে যাই সেই ভয়ে চোরের মত পা টিপে টিপে কক্ষে প্রবেশ করলাম। সমবেত অন্যান্য দর্শকদের অনুসরণে তারাদা নীলমণি ননাবাবু সুশীল সবাই নতজানু হয়ে প্রতিকৃতিটিকেই প্রণাম করল। বাইরের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও প্রণামী নিবেদন করল, ঠিক কেদারনাথ তুঙ্গনাথে যেমন করা হয়েছে। উক্ত দুই স্থানে আমিও বিনা-দ্বিধায় শুধু নয়, প্রায় স্বস্তির সঙ্গে প্রণাম এবং প্রণামী জমা দিয়েছি। কিন্তু এখানেও তাই করতে কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকল, এখানে কিছুতেই নিজেকে অমান্য করে নিজের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করতে পারলাম না। দরজার কাছে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

হয়তো সেইজন্যেই নয়, তবু কিছুক্ষণ পরে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। তখন যোশীমঠ থেকে ধীরপদে নেমে এসে বহিঃপ্রাঙ্গনে দাঁড়ালাম। মৃদু হাওয়ায় গাছের পাতা ঈষৎ কাঁপছে। দূরে নীল আকাশের গায়ে তুষাররেখা। আসমান জুড়ে পুঞ্জ পুঞ্জ তুষারশুভ্র মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। একটা আখরোট গাছের তলায় বসে একটা সিগারেট ধরালাম। এইতো সেই বহুশ্রুত, পুরাণ কীর্তিত প্রাচীন ভারতীয় তপোবন। সাধুদের সাধনস্থান। হিংসা নেই দ্বেষ নেই আইন নেই বিধিনিষেধ নেই। শুধু ফলভারে আনত বৃক্ষ আর মন্দমধুর হাওয়া। মর্তভূমির ঊর্ধ্বে, মেঘরাজ্য ছাড়িয়ে সহজ প্রশান্তিময় স্বর্গপুরী হৃষিকেশে পৌঁছে যে আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ আহত হয়েছিল, যোশীমঠে সে আশা পূর্ণ সার্থক হল। তবু সিগারেটে জোরে একটা টান দিলাম। এত সত্ত্বেও আমার দীন অঞ্জলি যেন অপূর্ণ রইল।

অদূরে অপর একটি গাছের তলায় বসে তারাদা স্ত্রীর কাছে পত্র লিখছিলেন। চিঠি লেখা শেষ হতে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে পুনরাবতরণের

আদেশ দিলেন : প্রায় আড়াই ফার্লং পথ হাঁটতে হবে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে, বেলাও আর বিশেষ বাকি নেই। আমিও কি জানতাম না যে এই তপোবন আমার জন্যে নয়, তবু এই পরদেশ ত্যাগ করবার সময় কেমন ব্যথা অনুভব করলাম।

কলকাকলীতে পর্বতপ্রদেশ উচ্ছল করে সবাই ঝিরঝির করে নেমে চলেছে। প্রাণের উচ্ছ্বাস মনের আনন্দ আর কেউ চাপতে পারছে না। যে কোন রসিকতাই অট্টহাসের উপযোগী, যে কোন কথাই কান পেতে শোনবার মত। আমি কিন্তু সকলের পিছনে আপনমনে হাঁটছিলাম। একটু পরে তারাদা হয়তো আপন আচরণের অনভ্যস্ত চপলতা খেয়াল করলেন এবং আমার গাম্ভীর্যে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হলেন। পিছিয়ে পড়ে জিজ্ঞেস্ করলেন, অত কি ভাবছেন মশাই ?

স্বর্গে মর্ত্তে কি ভাবনার অভাব ! ভাবছিলাম আপন দুর্ভাগ্যের কথা। নিজের অজান্তে কখন যেন উপেন হয়ে গেছি !

কোন্ উপেন ? দুই বিঘা জমির ?

হুঁ।

তারাদা আর কিছু বললেন না, ওঁর ভ্রূ কুঞ্চিত হল। আমি আবার ভাবতে লাগলাম, আশ্চর্য্য ! এমন নিশ্চিত ভিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে আজ কি করুণ ত্রিশঙ্কু অবস্থা ! শঙ্করাচার্য যে অর্থে ভারতীয় ছিলেন সেই অর্থে আমিও পুরোপুরি অভারতীয় নই। অথচ তিনি বিত্ত মর্যাদা বিদ্বৎসমাজ সব ত্যাগ করে যেখানে এসে পূর্ণ শান্তি পেয়েছিলেন, তাঁর উত্তরাধিকারী হয়েও সেই স্থানের মহিমা উপলব্ধি করেও আমি সেখান থেকে ফিরছি ক্ষুব্ধ মন নিয়ে বিষণ্ণ চিত্তে। যেন প্রত্যাখ্যাত হয়েছি, যেন নিমন্ত্রিত হয়েও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবার সাহস হয় নি। এ কেমন করে ঘটল, এই ভুলের কি সংশোধন নেই ? কিন্তু এ প্রশ্নের স্পষ্ট কোনও জবাব দেবার বিশ্বাস আমার নেই, শোনবার সামর্থ্যের অভাব। তাড়াতাড়ি তাই খানিকটা পথ নেমে এসে নীলমণির বহুবারশ্রুত একটা গ্রাম্য রসিকতায় সহস্রতমবার বোকার মত খলখল করে হেসে উঠলাম। প্রশ্নটা তবু রয়ে গেল : পারি কি পারি না ? সমাজ ছেড়ে, সংসার ছেড়ে, আপিসের বড়বাবু হবার আজন্ম উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছেড়ে, এমন কি চা-সিগারেট ছেড়ে সেই একের সন্ধানে—যে সন্ধান ব্যর্থ হলেও জীবন সার্থক হবে—কোনদিন

কি বেড়িয়ে আসতে পারব, না পারব না? একটা অক্ষম আবেগে মনটা গুমরে গুমরে আর্তনাদ করতে লাগল।

যোশীমঠে চটির ব্যবস্থা আগে থেকেই করা হয়েছিল। জ্যোতির্মঠ থেকে নেমে দলের সঙ্গে স্থানীয় মন্দির দেখতে যেতে হল। বেশ প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বেশ বড় মন্দির। বহিস্থানে কয়েকটি কুণ্ড আছে এবং বসবার বাঁধানো জায়গা। ক্লান্তির অজুহাতে মন্দিরাভ্যন্তর পরিদর্শনে আমি আমার অক্ষমতা জানালাম, এবং কুণ্ডের পার্শ্ববর্তী একটি আসনে পা ছড়িয়ে বসে ক্লান্ত উদাস মনে ভাবতে লাগলাম। ভাবনার বিষয় ছিল, ভগবান শ্রীশঙ্করাচার্য আর অভিশপ্ত স্বয়ং আমি। বিষয় দুটোর মধ্যেকার দূরত্ব যেমন অপরিমেয় ছিল, চিন্তাটার চেহারাও তেমনি আদৌ স্পষ্ট ছিল না। অনেকটা ওই চাঁদের চতুর্দিককার আলোকমালাটির মত।

সমগ্র জগৎটাই কেমন যেন সম্ভব ও অসম্ভব, বাস্তব ও কল্পনার মাঝামাঝি একটা অজগুবি শ্রুতি, স্মৃতি কিংবা স্রেফ অনুভূতি বলে মনে হল। দূরত্ব যেন একটা কুহক, স্থানভেদ ও কালভেদ নেহাতই কৃত্রিম বিকৃতি। অতীত ও ভবিষ্যত যেন এক বর্তমানেরই এ-পিঠ আর ও-পিঠ। বোধ হল যেন সমস্ত মনুষ্যজাতিই আসলে একটিমাত্র মানুষ। —প্রাগৈতিহাসিক 'এ্যামিবা' থেকে আজকের জ্যোতিষ্পিঠ থেকে এই পশ্চাদপসরণ পর্যন্ত যেন একটিমাত্র মুহূর্তে বিধৃত। উঁচু-নীচু নেই, তর-তম নেই—সব একাকার। সময় আবর্তিত হয়েছে, ভাবাদর্শ বিবর্তিত হয়েছে—সেই রামও নেই, সেই অযোধ্যার প্রত্যাশাও ব্যর্থ বাতুলতা—এই সব অকাট্য যুক্তিও ছেলে-ভুলানো গল্পকথা বলে মনে হল। আসলে যেন সেই রামও আছে সেই অযোধ্যাও আছে, আর সেই লঙ্কাও আছে সেই রাবণও আছে। আমি যেন চির-পরাজিত; দেড় হাজার বৎসর পূর্বে শঙ্করাচার্যের যুগে জন্মগ্রহণ করলেও এর অন্যথা হবার উপায় ছিল না। চিরকাল আমাকে এমনি নতমস্তকেই ফিরে আসতে হত। শিক্ষার দোষ ধরা নিরর্থক, পশ্চিমেরও কোন অপরাধ নেই,—যা ঘটবার তা-ই ঘটেছে ঘটছে ঘটবে।

তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র। ঢেউ উঠছে নামছে, আবার উঠছে—না নামলে উঠবার সম্ভাবনা থাকে না। কে-কার দোষ ধরবে!

হ্যাজাক লাইট জেলে যাত্রাভিনয় সুরু হয়েছে। কারো বা রাজার ভূমিকা, কারো বা রাজদ্রোহীর। ভূমিকা বণ্টন ও নাটক নির্বাচনের অধিকারও একমাত্র অধিকারীর। কে কা-কে ঈর্ষা করবে!

সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড জীব-জগত যেন একটি স্বচ্ছ চেতনা,—সৃষ্টি-রহস্য একটি উন্মুক্ত পুস্তক। একে স্বীকার করে নেয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। অন্য কোন পথ নেই মুক্তির।

মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গনে নিথর হয়ে বসে রইলাম। আকাশে চতুর্দশীর চাঁদ সত্ত্বেও অজস্র তারকা নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল। বিমুগ্ধ হিমালয়; দূর থেকে একটা ভজনের রেশ ভেসে আসতে লাগল। যেন অশ্রুতপূর্ব, তবু বহু-পরিচিত। যেন অনেক কাল আগে থেকে অন্তরীক্ষে অনুরণিত হচ্ছিল:

> পাণ্ডিত্য কিয়ু হায় চাহতা, তু তো মহা বিদ্বান হায়।
> সব শাস্ত্র তু নে হি রচে, সৎ শাস্ত্র বাক্য প্রমাণ হায়॥
> জো সহজ হায় বিদ্বান কো, ওহি মূর্খ কো অতি ক্লিষ্ট হায়।
> হায় শ্রেষ্ঠ সে ভি শ্রেষ্ঠ তু, পর চাহ্ করকে ভ্রষ্ট হায়॥

একটার পর একটা সিগারেট ধরালাম। নিথর বসে রইলাম।

অনতিদূরের পর্বতশীর্ষে তখন বাঁকা চাঁদ শোভা পাচ্ছে। আকাশটা নেমে এসেছে অনেক নীচে। খণ্ডচাঁদের ফ্যাকাশে আলো যেন কুজ্ঝটিকার সমতুল। একটু পরে কর্ণেল-কন্যা একা মন্দির থেকে ধীরপদে বেড়িয়ে এসে অদূরের অপর একটি আসনে সোজা হয়ে বসলেন। উদাস নয়নে নিকটস্থ আকাশের চাঁদটির দিকে তাকালেন। তাকিয়ে রইলেন।

সমতলের সঙ্কীর্ণ সজ্ঞান সচেতনতায় ফিরে এসে আজ সেই যোশী-মঠের উদার বিস্মৃতির কথা লিখতে বসেছি। সেই কথা বুঝাবার চেষ্টা করছি যেই কথা প্রকাশ করবার নয়। লজ্জায় অপমানে হীনমন্যতায়—সংশয়ে এবং সন্দেহে রসনা প্রতিমুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে আসছে। নাগরিক বাতিকগ্রস্ততায় কেবলই উৎকণ্ঠা বোধ করছি যে, হয়তো অন্তরঙ্গ এই অকুণ্ঠা নেহাৎই বাতুল বেহায়াপনা বলে বোধ হবে, অনাবৃত আত্ম-স্ফুরণের অন্তরালে গভীরতর কোন দুরভিসন্ধি আবিষ্কৃত হবে। সহজাত এই সঙ্কীর্ণতার কারণেই কুমার-চটিতে দ্বিপ্রহর বেলায় যখন কর্ণেল-কন্যার মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলাম তখন ভরসা করে তাঁর চোখের দিকে

তাকাইনি। পাছে লজ্জা পান, পাছে অপমান বোধ করেন। তবে মনে আছে তিনি কিছুক্ষণ নিষ্পলক আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। তখন সে-টা তাঁর সংবেদনশীলতার অভাব বলেই নিজেকে প্রবোধ দিয়েছিলাম।

যোশীমঠের অবিশ্বাস্য চন্দ্রালোকে কিন্তু এই মধ্যবিত্ত সামাজিক সন্ত্রস্ততার লেশমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। না লজ্জার না সঙ্কোচের না সংশয়ের না সন্দেহের। দূরাগত ভজনের সুর যেন শিরা-উপশিরা প্লাবিত করে দিতে থাকল :

> অন্তর বনাকর আরসি যব রূপ দেখা আপনা।
> পায়া উসে অত্যন্ত নির্মল মিট গই সব কল্পনা॥
> ময়লা সমঝ ময় থে দুঃখী, মিথ্যা হি য়হ্ অনুমান থা।
> হত্যা লগী নিষ্পাপ কো ইসকা ন মুঝকো জ্ঞান থা॥

মনে হল যেন কর্ণেল-কন্যা আমারই কল্পনায় গড়া। আমারই বিকৃতি থেকে প্রসূত কিন্তু আমাকে অতিক্রম করে বহুদূরে বিস্তৃত। ওই সংযত বলিষ্ঠতা আজ আমার পক্ষে কেবল ঈর্ষা করা সম্ভব, ওই দুঃসাহসিক অসহায়তা আমার আয়ত্বাতীত। এককালে আমার পক্ষে যা-কিছু সম্ভব ছিল, আমার পক্ষে যা আর কোনকালেই সম্ভব হবার নয়—মনে হল সেই সব কিছু যেন চোখের সামনেই বিধৃত হয়ে আছে। একবার মনে হল যে, এখন একটু অন্তরঙ্গতায় হয়তো জটিলতর সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে যেত, কিন্তু সব কিছু এত দূরে ছেড়ে এসেছি যে কিছুতেই আর নিজের নাগাল পেলাম না। সব কিছু যেন কর্ণেল-কন্যার মতো আকাশের ঐ চাঁদের সঙ্গে লীন হয়ে গেছে—চন্দ্রালোকে চন্দ্রাভিভূত হয়ে আছে।

অমন আঘাতের বরাত আমার নেই। আমার পিছনে থেকে কর্ণেল-কন্যা আমাকে অনেক-দূর ছাড়িয়ে গেছে। এবারে আমার আমি অতিক্রম করে গেছে আমাকে। অদূরে কর্ণেল-কন্যা বসে রইলেন ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, আপন নিঃসঙ্গতায় আমি আমার চিন্তার জীর্ণ ঝুলি হাতড়াতে থাকলাম। অবুঝ অন্ধের মতো।

এর আগে একাধিকবার কবুল করেছি যে, ঈশ্বরে আমি বিশ্বাস করি নে। এই অবিশ্বাসের অজস্র কারণের মধ্যে প্রধান একটি হচ্ছে জগতের দুঃখ। একাধারে সর্বশক্তিমান এবং করুণাময় যদি সত্যই কেউ থেকে

থাকেন তবে কেন বিধবার একমাত্র সন্তানের মৃত্যু ঘটে? কিন্তু আজ যেন মনে হল, আমার অবিশ্বাসের এই প্রধান ভিত্তিটা তত সুদৃঢ় নয় আমি যত ভেবেছিলাম। এর আগে এই কর্ণেল-কন্যাকেই তো আরও কতবার দেখেছি। দেখে প্রতিবারই হয় কৌতুক বোধ করেছি, নয় করুণা। জলীয় বুদ্বুদটির চাইতে যে ও কোন অংশে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এমন সন্দেহও কোনদিন মনে জাগে নি। অথচ কাল সন্ধ্যায় বাসের ওই করুণ পরীক্ষাটুকু অতিক্রম করেই আজ তাঁর গুরুত্ব কত বেড়ে গেছে! দুঃখের আগুনে পুড়ে কালকের চপল কর্ণেল-কন্যা আজ সমাহিত হিমালয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। রাত্রির গভীরতার সঙ্গে চন্দ্রালোকের রহস্যও বুঝি গভীরতর হচ্ছিল। আমার যেন স্পষ্ট প্রতীত হল যে দুঃখই জীবনের পরশপাথর।—যার স্পর্শ ব্যতিরেকে মানুষ প্রস্তরের মতোই অচলায়তন; কর্ণেল-কন্যা নিতান্তই নগরের অশ্লীল কল্পনা। মনে হল যিশু বুঝি ক্রুশবিদ্ধ হয়েই তবে যিশু।

ইতিমধ্যে রাত বাড়ছিল। চন্দ্রালোক উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছিল এবং পর্বতপ্রদেশ অধিকতর ভাস্বর। রহস্যান্ধকারে উপত্যকাগুলো কানায় কানায় ভরে উঠল। একটু পরে ননীবাবু একাকী মন্দির থেকে বেড়িয়ে এলেন। উদ্যানমধ্যে দাঁড়িয়ে, হয়তো চন্দ্র ও পর্বতের নৈসর্গিক সৌন্দর্যে অভিভূত হয়ে মুহূর্তকাল কী ভাবলেন। তারপর এগিয়ে এসে আমার পাশে বসে বোধ হয় কিছু একটা বলবার উপক্রম করলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে নিথর কর্ণেল-কন্যার দিকে তাকিয়ে থমকে গেলেন। ক্ষণেক পরে দেখি, তিনি উঠে পড়ে ধীরপদে চটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আমরা দুজন চন্দ্রাহত হয়ে বসেই রইলাম।

রাত ক্রমে বাড়তেই লাগল। চন্দ্রের আকৃতিও। কাকজ্যোৎস্নায় পর্বতপ্রদেশে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পরে কখন যেন কর্ণেল-কন্যাও উঠে গেলেন। অবশেষে আমাকেও উঠতে হল। খাওয়াদাওয়া সেরে সেদিন যখন নিদ্রার আয়োজন করলাম রাত তখন দশটা, চটির তখন মধ্যরাত্র। মুহূর্তমধ্যে, বুঝতে পারবার আগেই, ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লাম।

কি বিস্ময়! ভেড়া তাড়ানো নেই, সংখ্যা আওড়ানো নেই, আদিগন্ত জলের কথা ভাবা নেই, স্রেফ শোয়া আর ঘুমনো। কী আশ্চর্য! তবে ভেবে

দেখলে এতে বোধহয় আশ্চর্যান্বিত হবারও তেমন কিছু নেই। কেন না এ যে একেবারে হিমালয়ের ক্রোড়। বোমার ভয় নেই, ডাকাতের ভয় নেই, দিবসের গ্লানির দংশন নেই, আছে উদার ক্লান্তি আর তাছাড়া নাগরিক জীবনের হট্টগোলে আপন ব্যক্তিত্বের হারিয়ে-যাওয়া ভুলে-যাওয়া সেই অবিচ্ছেদ্য অপরাধের্রও অনেকাংশ হয়তো পুনরুদ্ধার করা গেছে। এখানেও যদি শুয়ে পড়া মাত্র নিদ্রাভিভূত না হব তবে ওই বিশেষ বাক্যরীতিটি ব্যাকরণে স্থান পেয়েছে কোন্ যুক্তিতে?

কিন্তু সেই ঘুমও হঠাৎ ভেঙে গেল। রাত্রি শেষ হতে তখনও প্রহর দুয়েক বাকি। চটির অপর কোণে বসে বসে কোন এক মহিলা যেন আপন মনে একঘেয়ে সুরে কেঁদে চলেছে। মহিলাকে আগে দেখে থাকলেও চটির অন্ধকারে এখন ঠিক চিনে উঠতে পারলাম না। কান্নার অর্থটাও কি পায়ের ব্যথা, না দেশের গাই—ঠিক বোধগম্য হল না। তবে কান্নাটা বুক-ভাঙা ছিল; মনে হল হিমালয়ও বুঝি মহিলার শোকে মুহ্যমান হয়ে আছে। সুর নেই, হয়তো শব্দও নেই, শুধু একটানা গোঙানি। যেন বিশ্বের আদিম ক্রন্দন।

কিন্তু হয়তো তা নয়। অনেকক্ষণ শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে কান্নার কারণ অনেকটা আঁচ করা গেল। তার আবেগবর্জিত শীতল ভাষারূপ কিছুটা এই প্রকার: ওরে আমার রামুরে জন্মের সময় কেন তোর মুখে নুন দিই নি, তোর গলা টিপে ধরি নি রে? হায় নারায়ণ, তুমি কি ঘুমিয়েছিলে, তুমি কেন এমন হতে দিলে? কেন তুমি রামুকে সামলালে না?…রামু, এই দেবভূমিতে তুই এমন হীন কাজ করলি, পূর্বপুরুষের কথা মনে করে তোর একটু হাত কাঁপল না?…আমার মত হতভাগিনী আর কে আছে, এমন পাপী আমি গর্ভে ধরেছি, আমার যে শত জন্মেও মুক্তি নেই!…তোকে কি আর কোনদিন এই চোখ দুটো দিয়ে দেখতে পাব রামু? যতি নেই বিরতি নেই, উত্থান নেই পতন নেই, আশা নেই আক্রোশ নেই—কেবল একাধারে একঘেয়ে বেদনার্তি।

সব বুঝেও প্রথমটায় যেন কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। হতভম্ব হয়ে অসাড় দেহে শুয়ে ছিলাম। চোখে যদিও আর নিদ্রার লেশমাত্র ছিল না। কে এই রামু? অবশ্যই এই ক্রন্দনরতা নারীর সন্তান। কিন্তু কে এই নারী? কী এমন হীন কাজ করেছে রামু। কোথায় করেছে? তার

কি প্রায়শ্চিত্ত নেই ? দুর্জয় আবেগে উত্তরহীন প্রশ্নগুলো বুকের মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়তে লাগল। দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরা রুদ্ধ ক্রন্দনে আকুল হয়ে উঠল। আমি বিমূঢ়ের মত শুয়ে রইলাম। মহিলা কেঁদে চললেন।

একটু পরে অপরা এক নারীর চাপা তর্জনস্বর শোনা গেল : চুপ কর্ রামুর মা, চুপ কর্। আর তো মাত্র কয়েকটা দিন, তারপর কাঁদিস যত খুশি। খুনে ছেলের জন্যে দিন রাত কাঁদিস। এখন চুপ কর্। কেউ যদি জেনে ফেলে তবে কি আর আমাদের বদ্রিনাথ দর্শন হবে ভেবেছিস ? এতদিন সহ্য করেছিস রামুর মা, আর দুটো দিন মুখ বুজে থাক্। যাত্রা পণ্ড করিস না। তার চাইতে বড় পাপ আর নেই।

আমি নির্জীবের মত নিথর হয়ে পড়ে রইলাম। সর্বশেষ শক্তিটুকুও যেন চুঁইয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। রামু খুন করেছে ? কাকে, কবে, কোথায় ? তখন আস্তে আস্তে স্মরণ হল। সেই রুদ্রপ্রয়াগ থেকে রওয়ানা হবার দিন রামপুর চটিতে ছড়িদার ও কুলির বিলম্বে পৌছবার কথা। ওদের মোট নাকি খানাতল্লাশ করা হয়েছিল। তারপর মনে পড়ল সেই ভীড়ি চটির চটিওয়ালা ভ্রাতৃদ্বয়ের উত্তপ্ত বাক্যালাপ। জ্যেষ্ঠর নিষেধ সত্ত্বেও কনিষ্ঠ মৃত বৃদ্ধার দেহতল্লাশ করতে যাবে, যদি কিছু পাওয়া যায় ! কোথায় যেন শুনেও ছিলাম যে, পলাতকদের সঙ্গে কোন আত্মীয়তা নেই বলে দলের দুজন মেয়ে এগিয়ে গেছে কেদারনাথের পথে। এই ক্রন্দনরতা নারীই কি পলাতক খুনীর মাতা ? সম্ভাবনাটি কল্পনা করে আমি শিউরে উঠলাম। কিন্তু আমি কেন মাতার এই গোপন ক্রন্দনের সাক্ষী হতে গেলাম ? আর কি কেউ ছিল না ?

ছিল। আমাদের ননীবাবু। পাশ ফিরে শুতে গিয়ে দেখি, তিনি উদাস নয়নে চটির চালের দিকে তাকিয়ে শুয়ে আছেন। ওঁর মধ্যেও কেমন যেন একটা পরিবর্তন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শেষ পর্যন্ত হিমালয় আমাদের ননীবাবুকেও রেহাই দেয় নি। কা'র যে কোনদিক থেকে আঘাত আসে অনুমান করা শক্ত। তবে ননীবাবুও আজকাল একটু আধটু অসহায় বোধ করতে সাহসী হচ্ছেন, আপনার দুটো একটা দুর্বলতা স্বীকার করে নেবার বলিষ্ঠতা অর্জন করেছেন। ননীবাবুও আদৌ নিদ্রিত ছিলেন না।

কিন্তু ওঁর উদাস চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে একবারও মনে হোল না যে, সদ্য-অনুষ্ঠিত বিষাদান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যটি সম্পর্কে উনি আদৌ সচেতন। উনি যেন অন্য কোন জগতে বিচরণ করছিলেন। কে জানে সে জগৎ কোন্ জগৎ!

পরদিন সকালে খুব তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করলাম। প্রায় ব্রাহ্ম-মুহূর্তে, রাত্রির আবেশ অন্ধকার তখনও পুরোপুরি কাটে নি। চটি থেকেও কোন যাত্রী রওয়ানা হতে পারে নি তখন পর্যন্ত। বিছানাপত্র বেঁধে নিয়ে বার বার খুঁজে দেখবার চেষ্টা করলাম কাল রাত্রির সেই নারী আসলে কে! কিন্তু কারও চোখে কোন চাঞ্চল্য নজরে পড়ল না, কারও চোখে এতটুকু বিষাদ নেই, বা রাত্রি জাগরণজনিত ক্লান্তি। দুর্জয় পথাতিক্রমের প্রস্তুতিতে সকলেরই দৃষ্টি সমাহিত।

দিনের শেষে আরও একদিন লক্ষ্যের সমীপে এগিয়ে যাব, সে প্রতিশ্রুতিতে প্রতি জোড়া চোখই সমুজ্জল।
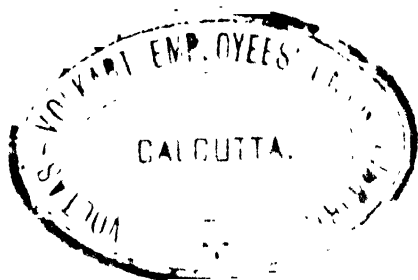
বারো

শব্দটাই শুধু কেদার-বদরিকা নয়, যুগাতিযুগের রীতিও কেদারনাথ-দর্শনান্তে বদরিনারায়ণদর্শন। এই রীতিটা যে সংস্কারমাত্র নয়, বরং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ—কেদার-বদরি তীর্থ পরিক্রমণের সৌভাগ্য যাঁর হয়েছে তিনি তা অস্বীকার করতে পারবেন না, লঙ্ঘন তো দূরের কথা।

যোশীমঠের আশেপাশে কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত পথের ধারে ধারে বেশ পত্রবহুল গাছ ছিল। গাছে ফুল ছিল, মাঝে মাঝে ফল ছিল। কখনও কখনও কর্ষিত মসলার ক্ষেত নজরে পড়ত। পত্রপুষ্পশোভিত ছায়াচ্ছন্ন পথ—চলতে মন্দ লাগছিল না। ক্লান্ত দিনের শেষে যেন দাওয়ায় বসে বিশ্রাম। কিন্তু একটু পরেই আর সেই সব বিলাসের বাষ্পমাত্র অবশিষ্ট রইল না। সূর্যের নির্দয় কিরণ সরাসরি চোখে এসে পড়ল, পথে পর্বতে প্রতিফলিত হয়ে চোখ ধাঁধাল। ঠিক যোশীমঠের আগেকার পথের মত। বৃক্ষের প্রবোধ নেই, ছায়ার সান্ত্বনা নেই, ঝরনার উৎসাহ নেই। শুধু টানা টানা পথ আর পথ। দূর পর্বতের গায়ে, গভীর উপত্যকার তলদেশে ছোট ছোট সবুজ গাছ দেখা যায়। কিন্তু তাদের পাতার মর্মরধ্বনি কানে বাজে না, তাদের ছায়াও এতদূর এসে পৌছয় না। গাছগুলো যেন গাছ নয়, গাছের স্মৃতি।

সেই কেদারনাথের দুর্গম পথের কথা মনে পড়ে। গুপ্তকাশীর ত্রিযুগীর সেই শ্বাসরুদ্ধকারী চড়াই, গৌরীকুণ্ডের তুঙ্গনাথের নিশ্বাসহরণকারী সেই উৎরাই। সেই একের পর এক উন্মত্ত ঝরনা, সেই আদিগন্ত সবুজের বন্যা। এই পথে সেই সবের কিছুই নেই। কেদারনাথের পথ ছিল শক্তির পরীক্ষা, বদ্রিনাথ যেন ধৈর্যের পরীক্ষা। শুধু পথ আর পথ,

দিগন্তজোড়া একটানা পথই এ-পথের একমাত্র সত্য। উৎরাই এখানে উৎরাই নয়। এখানকার চড়াইকে চড়াই নামে অভিহিত করলে কেদারনাথের চড়াই লজ্জায় সমতল হয়ে যাবে। এ যেন প্রৌঢ়োত্তর অক্ষম বাসনাক্লিষ্ট নিষ্ফল দিনাতিপাত। না আছে যৌবনের উদ্দাম প্রতিদ্বন্দ্বিতা, না আছে বার্ধক্যের নিষ্কাম উদারতা। কেদারনাথের পথ ছিল চড়াই-উৎরাই-সমন্বিত জিজ্ঞাসাচিহ্ন। বদরিনাথের পথ ইতিচিহ্নের মত সহজ সরল বৈচিত্র্যহীন।

যাত্রীদের চলার গতিও যেন শ্লথ হয়ে আসছে ক্রমশ। সবাই চলছে শুধু থামছে না বলেই। কারও চলনেই উৎসাহের উচ্ছ্বাস নেই, কারও মুখেই অকারণ স্বতঃস্ফূর্ত হাসি নেই, সকলেরই চোখ থেকে আশার শেষ আলোটুকু নির্বাপিত হয়ে গেছে। তবু সবাই এগিয়ে চলেছে। কেবল অভ্যাসবশে নয়, হয়তো থামবার সাহস নেই বলেও নয়, সব কিছু শেষ হয়ে যেতেও সবাই এগিয়ে চলেছে সম্ভবত এই কারণে যে, উচ্ছ্বাস বা হাসি বা আশাই জীবনের একমাত্র মূলধন নয়, এ-পথের একমাত্র পুরস্কার নয়। বহির্জগৎ ছাড়াও অন্যতর জগৎ আছে। গভীরতায় যা অগাধ, বিস্তৃতিতেও যা অসীম। বাইরে থেকে আহরণের পালা শেষ হয়েছে, এখন সবাই ঘর গুছতে ব্যস্ত।

আমি অন্তত কখন থেকে যেন অন্তর্জগৎ মন্থনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এবং যদিও তখন পর্যন্ত কোন পনীর উত্থিত হয় নি—নীরটুকুই শুধু অধিকতর ঘোলাটে হয়েছে, তবুও মন্থনকার্যে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট ছিলাম। সেই নিবিষ্টতায় পথের শুষ্কতার কথা তলিয়ে গিয়েছিল। আমি কে, এবং কেন? আমি যা, তা কি আমি না হতে পারতাম? যা আমি হব তা কি না হতেও পারি? এরা সব কারা—এই তারাদা ননী নীলমণি সুশীল। জগতের সঙ্গে, হিমালয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? তা কি বিচ্ছেদ্য, পরিবর্তনীয়? আজ লিখতে বসে প্রশ্নগুলোকে এমন উন্মত্ত ভাববিলাসিতা বলে মনে হচ্ছে যে কলম জড়িয়ে আসছে। কিন্তু সেদিন এগুলো নিয়ে অবলীলাক্রমে নাড়াচাড়া করেছি, এবং সেদিন এ কথাও মনে হয়েছে যে, প্রশ্নগুলোর জবাব হয়তো ততটা দুষ্প্রাপ্য নয় যতটা আশঙ্কা করে আমরা সন্ধানের আগেই হাল ছেড়ে থাকি। কোন প্রশ্নটারই সুস্পষ্ট একটি জবাব সেদিন আমি পাই নি। কিন্তু যদি পেতাম

আর যদি তা আজও স্মরণ থাকত তবে কি প্রশ্নটির মত উত্তরটিকেও আজ উন্মত্ত ভাববিলাসিতা বলে মনে হত? তবে কি স্থানান্তরে জীবনেরও জীবনান্তর ঘটে, জীবন কি বহুবচন? আমিও কি তা হলে একবচন নই? কিন্তু এও হয়তো আবার ভাববিলাসিতা হচ্ছে। তার চাইতে পথের দিকে নজর দেওয়া ভাল।

কিন্তু পথের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা সহজ নয়,—সেই নির্বিকল্প বিনয় এখনও আয়ত্তাতীত। পথে রূঢ়তা আছে রুক্ষতা আছে, চড়াই আছে উৎরাইও আছে কিন্তু সুদীর্ঘকালের পরিচয়ে সবকিছুই কেমন যেন নিরপেক্ষ, নির্বিষ, প্রায় নিরীহ হয়ে গেছে। এমন কি হাঁটুর ব্যথাটি পর্যন্ত শেষ অবধি নির্বিবাদে মেনে নিয়েছি। সব গিয়ে অবশিষ্ট আছে কেবল অপরিহার্য অনুসঙ্গগুলো,—প্রতিবাদ করা বৃথা জেনে ক্রমে অভিযোগগুলোই বিস্মৃত হয়েছি। পথক্লেশে আর এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই যা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারে, চিন্তা বিক্ষিপ্ত করতে পারে। দীর্ঘ পথাতিক্রমণের ক্লান্তিতে ছেলেমানুষী উচ্ছলতা স্তব্ধ হয়েছে, অপরিণত কৌতূহল মূক হয়ে গেছে। একমাত্র দায় এখন বাকী পথটুকু অতিক্রম করা। সম্ভব হলে হিসাব নিকাষ করে রেওয়া-মিল মিলিয়ে দেওয়া।

পথও আর বিশেষ বাকী নেই। কয়টা দিনই বা আর হাতে আছে। তারপরেই আবার সঙ্কীর্ণ মধ্যবিত্ত জীবনের আবর্তে ফিরে যাব, জনতার ভীড়ে নিশ্চিহ্নে দিশাহারা হব। অধিকারী-অনধিকারীর সূক্ষ্ম ভেদাভেদ বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবার ধৈর্য আর অবশিষ্ট ছিল না। আপন ক্ষমতার পরিধি, সাধনার সীমা নজরে রাখাও অসাধ্য হয়ে পড়ল। শত প্রতিরোধ সত্ত্বেও বার বার নানান অনির্দেশ্য চিন্তায় জড়িয়ে পড়তে থাকলাম; নানান সৃষ্টিছাড়া অনুভূতিতে অভিভূত বোধ করলাম। বিভিন্ন অজুহাতে এক একবার নিজেকে টেনে-হিঁচড়ে সজ্ঞান চেতনায় নামিয়ে আনি, আবার মুহূর্ত পরেই হারিয়ে দিই অব্যক্ত চিন্তার অরণ্যে, অস্ফুট অনুভূতির গভীরতায়।

আপাত অস্পষ্টতায় শাস্ত্রকাররা যাকে নাম-রূপ বলেন,—অর্থাৎ কিনা পদ ও পদবী—সেই কৃত্রিম আবরণের আড়ালে নিজের সত্য পরিচয় যেন কতকটা অনুমান করতে পারছিলাম। অনুমানটুকু প্রায় সম্পূর্ণই বোধগ্রাহ্য। অক্ষম ভাষায় সে পরিচয় প্রকাশ করতে গেলে যতটা কৃত্রিম

শোনাবে সে-পরিচয় কিন্তু ততটাই মৌলিক। যতটা অস্পষ্ট মনে হবে তার চাইতে অনেকগুণ বেশী পরিচ্ছন্ন। জাগ্রৎ চেতনার প্রথম মুহূর্ত থেকে যত শত স্তর একের পর এক অতিক্রম করে এসেছি,—প্রতিটি ঘটনা এবং বিক্ষোভ,—বিশদভাবে ও সামগ্রিকরূপে যেন চোখের সামনে ভাসছিল। প্রত্যেকটি ঘটনা ঘটে গেছে, প্রত্যেকটি বিক্ষোভ বিক্ষুব্ধ করেছে—কিন্তু সব সত্ত্বেও সত্তার গভীরতায় কোন আলোড়ন পৌছয়নি; আঁচড়টুকু লাগেনি কোনদিন। সুখ-দুঃখ, নিন্দা-স্তুতি, আশা-হতাশা সব সত্ত্বেও যেই আমি সেই আমিই আছি, হবও সেই আমি! এর চাইতে পরিষ্কার করে বিষয়টা বুঝিয়ে বলবার বিদ্যা আমার নেই, তাগিদও সামান্য। বহুরূপী চেতনার অন্তরালে এই একক অব্যয় স্পন্দন যে অপরের স্বীকৃতি-সাপেক্ষ নয়, বহির্যুক্তির উপর নির্ভরশীল নয় সেইটুকুই যথেষ্ট।

আত্মতুষ্ট অনুসন্ধিৎসায় এর পর অপর প্রাসঙ্গিক সমস্যাটির সমাধানে প্রবৃত্ত হলাম। পথ চলতে চলতে অনায়াসে,—যেন প্রথম-ভাগের পর দ্বিতীয়-ভাগ, আস্থায়ী থেকে অন্তরা, যোশীমঠ পেরিয়ে বিষ্ণু-প্রয়াগ।

মনে হল এত অজস্র চটি, এই সুদীর্ঘ পথ, এমন ক্লেশকর পথাতিক্রমণ, ঘটনার দু'হাত উর্দ্ধেই যদি সদা-সর্বদা ভেসে চলা তাহোলে এ সকলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কতটুকু? এই ননী নীলমণি তারাদা সুশীল,—এত অসংখ্য প্রিয় অপ্রিয় ও নিরপেক্ষ ঘটনা, এই সুখ-দুঃখ, প্রীতি-ঘৃণা—এ সবের উৎস কোথায়, ভিত্তি কী, প্রাসঙ্গিকতাই বা কতটুকু? এই যে হাসছি কাঁদছি আবার নির্বিকার থাকছি এরই বা অর্থ কোথায়? কিন্তু নাগরিক ভব্যতা পরিহার করে স্পষ্টতর ভাষায় ব্যক্ত না করলে সমস্যাটা পরিষ্কার বোঝানো যাবে না। নিজের পরিচয় নির্ভুলরূপে জানবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল বহির্জগতের সঙ্গে এই আমার সম্পর্ক কতটুকু? সেই সম্পর্ক কি আরোপিত না সহজাত?

বাহুল্য বলে প্রতীত হবার আশঙ্কা থাকলেও এই মুহূর্তেই আবার কবুল করা প্রয়োজন যে আমি দার্শনিক নই, মিশনরী নই। আমি আজন্ম কেরাণী; কেরাণীরূপেই দীক্ষিত, কেরাণীরূপেই সংবর্দ্ধিত। সর্ব্ব-প্রকার দার্শনিক ভণিতা থেকেও আমি মুক্ত। কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে সেদিন যখন সাপ বেরিয়ে পড়ল তখন আর পলায়নের কোন পথ নেই, পলায়নের

প্রয়োজনও বিশেষ অনুভব করলাম না। অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ অবস্থায় যেই সমস্যাকে দুর্বোধ দার্শনিক বিলাস বলে কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস সহকারে উপেক্ষা করতাম, এখন অনায়াসে তার সমাধান করে ফেললাম। চোখের পলকে।

এমন এক একটা সময় সম্ভবত প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এক-আধ বার এসে থাকে। তখন কোন সমস্যাই আর সমাধানের অতীত নয়, কোন বেদনাই দুঃসহ নয়, কোন হতাশাই মর্মান্তিক নয়। প্রবঞ্চনার অশান্ত আর্তনাদ ছাপিয়ে তখন যেন মন্দ্রস্বরে ধ্বনিত হতে থাকে, আছে আছে। পাশ্চাত্যের দ্রষ্টারা বোধ হয় একেই 'ফাইনাল এ্যাফারমেশন' বলে থাকেন। সব কিছুকে মনে হয় যেন একটা উন্মুক্ত পুস্তক,—সব কিছু অতিক্রম করে যেন সব কিছু স্পষ্ট চোখে দেখা যায়,—সব মিলে যেন একটি স্বতঃ প্রতিষ্ঠিত প্রস্তাবনা!

বিস্মৃত অতীতের প্রতিটি ঘটনা নিখুঁত পুঙ্খানুপুঙ্খতায় একযোগে নজরে ভাসছিল। এতকাল তার অধিকাংশই বিস্মৃতির তলায় গোপন ছিল, বাকী অংশটুকু ছিল অবোধ্য। অবোধ্য বলে অর্থহীন। অজস্র অর্থহীন ঘটনার একটি নিবিড় অরণ্য,—কোন পরিকল্পনা নেই, সামঞ্জস্য নেই, কার্য-কারণ নেই, লক্ষ্য নেই পথ নেই। কেবল ক্ষুদ্র সুখ ও ক্ষুদ্র দুঃখের কয়েকটা জোনাকি একের পর এক জ্বলেছে আর নিভেছে। কিন্তু আজ হঠাৎ পিছন ফিরে একবার চাইতে সব কিছু যেন মুহূর্তমধ্যে অর্থময় হয়ে উঠল। জীবনের ছোট বড় প্রতিটি ঘটনা, প্রত্যেকটি বিক্ষোভ যেন একই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আছে। এই মলিন-বসন রুক্ষ-কেশ বিগত-আবেগ শ্লথপদ উৎকণ্ঠিত যাত্রীটির দিকে। সব যেন একই কাহিনীর বিভিন্ন পরিচ্ছেদ, একই নাটকের বিভিন্ন অঙ্ক। বিচ্ছিন্নভাবে যত অর্থহীনই হোক, সামান্যতম ঘটনাংশটুকুও বাদ পড়লে এ-নাটক বুঝি এমন জমত না। সামগ্রিকভাবে প্রতিটি বিক্ষোভেরই আবশ্যকতা ছিল। শুধু তাই নয়, নিজের অজ্ঞাতসারে আমি নিজেই প্রতিটি ঘটনা নিয়ন্ত্রিত করেছি। নিজেকে আশা দিয়েছি, আবার হতাশ করেছি; সৌহার্দ্য ও শত্রুতা, প্রীতি ও ঘৃণা সব ঐ একটিমাত্র উদ্দেশ্যে।—আজকের আমি পর্যন্ত পৌঁছবার জন্য, আজকের আমিকেও অতিক্রম করে যাবার জন্য। এই জীবন আমার, এই জগত আমার কল্পনা; এই ননী নীলমণি তারাদা,

এই চটি এই পথ—আপন প্রয়োজনে এই সব কিছুই আমার উদ্ভাবনা। এই বিশাল বিশ্বের বিস্তার ততটুকুই আমার সমবেদনার যতটুকু প্রসার। নাগাসাকির অসংখ্য জনতার অবলুপ্তিতে সেই বিশ্ব তেমন বিক্ষুব্ধ হয় না, যতটা বিচলিত হয় একজন মাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধুর বিয়োগ-বেদনায়। যত বিরোধীতা যত দ্বন্দ্ব—যত আঘাত এবং অভিশাপ সব আমি আপন সমবেদনায় আপনার বিশ্বে গ্রহণ করে নিয়েছি। একটি মাত্র উদ্দেশ্যে—আমাকে সর্বাংশে আমি করে তুলবার জন্য। সবকিছু অবিশ্বাস্য রকম সহজ এবং সরল মনে হতে লাগল। কোন সমস্যার বা সন্দেহের বা সংশয়ের বাষ্পমাত্র নেই কোথায়ও, ছিল না কোনকালে। জীবন যেন একটা ঋজুপথ,—পূর্ব থেকেই যার জরীপ হয়ে আছে।

সেদিনের সেই উদার স্বীকৃতি আজকের নাগরিক জীবনের কোলাহলে সম্পূর্ণ মূক হয়ে গেছে। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির উর্দ্ধে,—স্থান কাল নিরপেক্ষ,—কোনকালেই আর মিথ্যা হবার নয়। নাগরিক জীবনের বাহুল্য-বিধায় আজ সেই অভিজ্ঞতা শিকেয় তোলা থাকতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনের সময় হাত প্রসারিত করলেই তা আবার পেয়ে যাব। প্রয়োজনের সময় আর বৃথা হাতড়ে মরতে হবে না। বস্তু-কেন্দ্রিক জীবনের ভস্মাবশিষ্ট দিগন্ত ছেড়ে পলায়নের সমস্ত প্রয়াসই হয়তো একদিন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে কিন্তু সেদিনের সেই দ্যুতি জ্বল জ্বল করবে চিরদিন। সুদীর্ঘ সাতাশ বৎসরের অনবচ্ছিন্ন একঘেয়ে নিরর্থকতা অতিক্রম করে একদিন মুহূর্তের জন্য জেনেছিলাম আমি কে এবং কোথায় আর কেন,—সেই জানা যদি অতঃপর অনন্তকালের জন্যেও বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে যায় তবে ক্ষোভ অবশ্যই থাকবে, কিন্তু সেই আনন্দ কণামাত্রও ম্লান হবে না।

সেদিনের সেই অভিজ্ঞতার কথা চিন্তা করতে গেলে আজ একটি কথা ভেবে আর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। আপন মূর্খতায় সম্পূর্ণ হতবুদ্ধি বোধ করি।—ওইটুকুতেই কেন সেদিন তুষ্ট হলাম। অপরাপর প্রশ্নগুলো কেন উপস্থাপিত করিনি, অপরাপর সমস্যাগুলোর কেন নিষ্পত্তি করে নিইনি!—জীবনের মঞ্চে বিভিন্ন ভূমিকায় বার বার প্রবেশ ও প্রস্থানের তাৎপর্য না হয় বুঝা গেল, কিন্তু চূড়ান্ত নিষ্ক্রমণের পর, যার পরে আর ফিরে আসবার দায় নেই উপায় নেই তখন? তখন এমন কষ্টার্জিত

দেহাতিরিক্ত আমিত্বটুকুর কেমন অবস্থা হবে? আলেয়ার মত মিলিয়ে যাবে, না-কি অপর কোন সার্থকতায় গৌরব-মণ্ডিত হবে? জানি নি, জানি না।—এই বিচিত্র বিশ্ব না হয় আমার লক্ষ্যে পৌঁছবার দায়ে আমারই উদ্ভাবনা, কিন্তু এই স্বোদ্ভাবিত জগতের উপর আমার অধিকার কতটুকু? বুঝে নিইনি, বুঝি না। বিনা প্রার্থনাতেই সেদিন যা পেয়েছিলাম তারপরে আর কিছু চাইবার গৃধ্নুতা অবশিষ্ট থাকেনি। নিজের মূর্খতায় তাই ক্ষোভ হয়। নিরীহ ক্ষোভ।

অবশ্য মূর্খের কখনও অজুহাতের অভাব হয় না। আমিও মাঝে মাঝে নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি যে, অপর কোন প্রশ্ন উত্থাপন করবার অবকাশই সেদিন আর ছিল না। অনতিবিলম্বেই পথের গতি বিষ্ণুপ্রয়াগের জল-কল্লোলে দিশেহারা হয়েছিল। সত্য হলেও সেইটে যে পুরো সত্য নয় নিজের কাছ থেকে সেইটুকু গোপন করবার কেবল কোন অজুহাত জানা নেই!

দূর থেকে বিষ্ণু-প্রয়াগের লোকালয় নজরে পড়তেই আমার স্পর্শ-কাতর আত্মচিন্তা মুহূর্তমাত্র দ্বিধা না করে চেতনার ত্রিসীমা ছেড়ে পালাল। পরিচিত অনুসঙ্গের সুদূরতম উপস্থিতিও এর সহ্যের অতীত। দীন ক্লান্ত যাত্রীটির মতো আবার বিষণ্ণ পদক্ষেপে পথাতিক্রমণ করতে থাকলাম। ক্ষণেকের মধ্যে আবার পায়ের ব্যথাটি এসে জুটল, অস্খালনীয় জৈবিক দুর্বলতার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে সংশয়বাদও মুহূর্তমধ্যে সবকিছু আচ্ছন্ন করে ধরল। স্বচ্ছন্দে আবার নিজেকে প্রবঞ্চিত যাত্রী বলে অনুভব করলাম। প্রবঞ্চিত এবং তিক্ত!

অবশেষে একটা ঝুলন্ত কাঠের সাঁকো পেরিয়ে পথ বিষ্ণুপ্রয়াগে পৌঁছল। ছোট চটি, দুটো চারটে দোকান, মাছিতে মৌ-মৌ করছে। এঁকেবেঁকে পাথরের সিঁড়ি অনেকদূর নীচে নেমে গেছে, যেখানে বিষ্ণুগঙ্গা আর অলকানন্দার সঙ্গম। স্থানীয় পরিভাষায় বিষ্ণুগঙ্গাকে বলে ধলীগঙ্গা। প্রশস্ততর নদীটির বর্ণ কর্দমাক্ত বলে সত্যই ধবল। কিন্তু অলকানন্দা এখনও সেই ক্ষীণাঙ্গী নীলিমা। দেহ বড় শ্রান্ত ছিল, কল্পনাশক্তিও ক্লান্ত, পথের উপর থেকে দূর সঙ্গমের দিকে তাকিয়ে একটা প্রচলিত উপমা আমার মনে এল। বিষ্ণুগঙ্গা যেন পুরুষ, অলকানন্দা যেন প্রকৃতি; যুগনদ্ধ অবস্থায় পুরুষের মধ্যে প্রকৃতি সম্পূর্ণ মিশে গেছে। সংযুক্ত নদীটির

বর্ণও ধবল, নাম যদিও অলকানন্দা। সত্যের দিক থেকে নামাকরণটি হয়তো যুক্তিযুক্ত হয় নি, কিন্তু সৌন্দর্যের দিক থেকে হয়েছে।

কি হল ? আসুন, সঙ্গমের জল অন্তত স্পর্শ করে যাই।

অবসন্ন হাসি হেসে আমি মাপ চাইলাম। তারাদা তরতর করে নীচে নেমে গেলেন। ঘাটের রেলিঙ পেরিয়ে সঙ্গমের উপর একটা পাথরে বসলেন। আরও অনেকে স্নান করছিল ঘটি ঘটি জল তুলে, লজ্জাশরম বিস্মৃত হয়ে। আমি উপরেই দাঁড়িয়ে রইলাম। ওদের তৃপ্তি দেখে অভ্যাস অনুযায়ী ঈর্ষা হচ্ছিল। এক-একবার এমনও মনে হচ্ছিল যে, ওই সঙ্গমে নেমে গেলে হয়তো তা পাব যা চাইতে কোনদিন সাহস হয় নি। কিন্তু তখন কিছু গ্রহণ করবার সামর্থ্য আমার ছিল না, অঞ্জলি পেতে নীচে নামব কোন্ ভরসায় ? শত যোজন দূরে দাঁড়িয়ে আমি জলকল্লোল শুনতে লাগলাম, কিন্তু শত চেষ্টা করেও সমবেত কোলাহলের মধ্য থেকে সেই একক সুরটি ধরতে পারলাম না, দেবপ্রয়াগ-রুদ্রপ্রয়াগে যা অন্তরের আর্তনাদ ছাপিয়ে বেজেছিল। আশ্চর্য মানুষের আত্ম-বিস্মৃতি ! মানুষের আত্ম-ছলনা অধিকতর বিস্ময়কর !

নিঃশেষিত সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার পথ ধরলাম; আমাদের আজকের দ্বিপ্রাহরিক লক্ষ্য পাণ্ডুকেশ্বরের উদ্দেশ্যে। সকাল থেকে এতক্ষণ পূর্যন্ত প্রায় একা-একা হেঁটেছিলাম। ইচ্ছা করেই। কেননা এতটা পথ হেঁটে এইটুকু অন্তত আর বুঝতে বাকি ছিল না যে, জীবনেরই মত এ পথ একার পথ, একাগ্রতার পথ। সম্মিলিত ভ্রমণে পথকষ্ট লাঘব হয় বটে, কিন্তু পুণ্যফলও লঘু হয়ে যায়। কত চিন্তা অচিন্তিত থাকে, কত বোধ ভিড়ের ভয়ে পালায়, কত সৌন্দর্য কানে কানে ডেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় ! কিন্তু বিষ্ণুপ্রয়াগে পৌঁছেই বুঝেছিলাম যে, নতুন কিছু সংগ্রহের ক্ষমতা আমার আর নেই, অতএব হারাবার ভয়ও না। এবার আর তাই সঙ্গপরিহারের কোন প্রযত্ন করলাম না।

এবারে আমার সঙ্গী হল নীলমণি—সেই হাওড়ার, কিন্তু যেন ঠিক সেই হাওড়ার নয়। চলতে চলতে ও আপন মনে বক বক করতে লাগল, আমিও অন্য কিছুতে কান বিক্ষেপের অবকাশ না থাকায় ওরই কথা শুনে যাচ্ছিলাম। ক্রমে বেশ নিবিষ্টচিত্তে। নীলমণি ওর পারিবারিক জীবনের কাহিনী প্রতিবেদন করছিল।—স্ত্রীর কথা, মেয়ের কথা, ছেলের কথা।

সে কাহিনীতে মৌলিক কিছু ছিল না, চমৎকারিত্বও নয়, সাধারণ গৃহস্থ-পরিবারের ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ জড়ানো সাধারণ অম্ল-মধুর কথা। সহজাত বীতশ্রদ্ধা সত্ত্বেও সেই গার্হস্থ্যকথাই বিস্ময়কর একাগ্রতায় শুনতে শুনতে পথ চলছিলাম। মাঝে মাঝে সমবেদনাও জানিয়ে থাকব। যেন এই কাহিনীর সঙ্গে আমার আজন্ম অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠতা!

অথচ একটু পরেই নীলমণি যখন কাহিনী অর্ধসমাপ্ত রেখে হঠাৎ গান ধরল: 'তোমার উপরে তুলসী নীচে তুলসী, জল খাও বাবা কলসী কলসী; ও বাবা শালগ্রাম! ও বাবা শালগ্রাম'!—তখনও কণামাত্র আহত বা গতিহত হলাম না। বরং উদ্‌গ্রীব হয়ে সামনে পিছনে তাকিয়ে গানটার সঠিক অর্থ বোঝাবার চেষ্টা করলাম। আর অচিরেই বুঝলাম। বুঝে আর হাসি চাপতে পারি না। পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরতেই হঠাৎ সামনে দেখি, অশ্বারোহী এক দম্পতি চলেছেন। দম্পতি তো নয় যেন দুটো প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জালা। দুটো পলস্তূপ। নীলমণির সঙ্গীতে, হয়তো বা মুগ্ধ হয়েই, জালা দুটোর শীর্ষদেশ পিছন ফিরে সঙ্গীতজ্ঞকে দেখবার বৃথা চেষ্টা করল। কিন্তু ওই সামান্য আন্দোলনেই অশ্বজোড়া বেসামাল হবার উপক্রম করায় সজীবতা পরিহার করে মাংসপিণ্ড দুটো আবার নিশ্চল শালগ্রামশিলায় পরিণত হল। কণ্ঠ সপ্তমে তুলে নীলমণি গেয়েই চলল: তোমার যেমনি শোয়া তেমনি বসা—ব-অ-অ-অ-সা। হাসির দমকে আমার চোখে জল এল, পেটে খিল ধরল। অবশেষে গুমড়োমুখো শালগ্রামশিলাদ্বয়কে অতিক্রম করে এসে দেখি, এঁরা আমার পূর্বপরিচিত। সেই বাঈজীর কুলির নূতন মনিব, চমৌলিতে বাসের জানলা-পথে যাঁদের দেখেছিলাম।

অবিশ্বাস্য, কেন না চলেছি সে কথা আদৌ স্মরণ ছিল না। একটা গন্তব্য লক্ষ্য যে আছে সে কথাও সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছিলাম। মনের মধ্যে এতদিন যে গতির স্পন্দন নিয়ত স্পন্দিত হত তাও যেন চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু তবু বেলা বারোটা সাড়ে-বারোটা নাগাদ পাণ্ডুকেশ্বরে গিয়ে পৌছলাম, বদ্রিনাথের দূরত্ব সকাল থেকে মাইল নয়েক কমিয়ে। অবিশ্বাস্য, কিন্তু বড়ই বিমর্ষকর যে, কিছু দেখি আর না দেখি, বুঝি বা না বুঝি বাল্যে পড়া সেই নদী-স্রোতের মত জীবন ঠিক বয়ে চলে, জীবন

কী তা জানবার আগেই জীবনের দিন ফুরোয়। অবিশ্বাস্য, কিন্তু অপ্রতিরোধ্য। কোন ক্রমেই আর অস্বীকার করা যাবে না যে, পাণ্ডুকেশ্বরে পৌঁছে গেছি।

পাণ্ডুকেশ্বর বেশ বড় চটি এবং বর্ধিষ্ণু। স্থানটির ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক গুরুত্বও কম নয়। চটিতে প্রবেশ-পথের ডান ধারেই পর পর দুটো প্রাচীন মন্দির আছে। কিন্তু নিকটেই বদ্রিনারায়ণ বলে স্থানীয় বিগ্রহরা যাত্রীদের শ্রদ্ধা আকর্ষণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সম্পূর্ণ পরাভূত। ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করলে পুরোহিত হ্যারিকেন নিয়ে এসে দুটো পয়সার বিনিময়ে বিগ্রহ দেখিয়ে যায়। চটির পাশেই রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রশস্ত উপত্যকায় উচ্ছ্বাসময়ী অলকানন্দার ধারে যাত্রীদল কাপড় কাচছে, স্নান করছে, রোদ পোয়াচ্ছে।

কিন্তু বেলা পড়বার আগেই আবার পাততাড়ি গোটাও। সময় নেই। বসে দুটো কথা কইবার অবকাশ নেই, চোখ বুজে শুয়ে দুটো কথা ভাববার অবসর নেই, ঘুরে দেখে মন্দির দুটোর বয়স স্থির করবার ধৈর্য নেই। চটিতে পৌঁছে তাড়াতাড়ি চারটি আলুসেদ্ধ-ভাত মুখে গুঁজে একটু দম নিয়েই আবার পথ ধর। সময় নেই। সুদীর্ঘ সাতাশ বৎসর অনায়াসে কেটে যায়, কিন্তু সময় ঘনালে আর একটু বিলম্ব সয় না। সময় মত বেরিয়ে পড়তে না পারলে পল তখন যুগ।

এমনিতরো কয়েকটা যুগ আমাদের অতিবাহিত করতে হল পাণ্ডুকেশ্বরে। অপরাধটা পুরোপুরি কুলির, সে আর এসে পৌঁছয় না—একটায় না, দুটোয় না, অবশেষে তিনটেও বেজে যায়। খাওয়া-দাওয়ার পর গা এলাবার যদিবা সময় মিলল, কিন্তু চোখ বোজবার সোয়াস্তি মিলল না। উঠে বসে তখন সবাই সিগারেট সহযোগে যুগপৎ চিন্তা করতে লাগলাম। উম্মায় তারাদা মূক হয়ে গেলেন। সুশীল মুখর হয়ে উঠল : ব্যাটাকে আজই ভাগাতে হবে। ও বেটা নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও জোর ঘুম লাগিয়েছে।

এমন সময় বেলা সাড়ে-তিনটে নাগাদ ঘর্মাক্ত কলেবরে কুলি এসে পৌঁছল। আমরা যখন বিরক্তির চাইতেও বেশী শীতে ঠকঠক করে কাঁপছিলাম, ওর জীর্ণবস্ত্রাবৃত দেহ তখন স্বেদে চকচক করছিল। দেড়মণ ওজনের ভারে শরীরটা বেঁকে গেছে, কপালে দড়ির দাগ নির্দয়ভাবে

অঙ্কিত। দেশীরাম সামনে এসে দাঁড়াতেই আমরা অপরাধীর মত অপ্রস্তুত হয়ে একসঙ্গে ঢোক গিললাম। কারুর মুখে আর রা'টি নাই। সবাই মিলে যেন চুরি করতে গিয়ে হাতে হাতে ধরা পড়ে গেছি!

কিন্তু বাগবাজারের সুশীল ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে। দেশীরাম পিঠ থেকে মালের বোঝাটা নামিয়ে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই সুশীল গর্জে উঠে অমুদ্রণযোগ্য ভাষায় বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগল যে, ও ব্যাটা ভেবেছেটা কী? দেশীরাম স্থির হয়ে কিছুক্ষণ বকুনি শুনল, তার পর কোন কারণ পর্যন্ত দেখাল না, কপালের ক্ষত-চিহ্নটায় হাত বুলোতে বুলোতে অবিক্ষুব্ধ শীতল দৃষ্টিতে—সেই দৃষ্টির শীতলতায় হৃদ্‌স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যায়—সুশীলের দিকে একবার তাকিয়ে নীরবে চটির ভিতর ঢুকে গেল।

সেই নীরবতায় সুশীলও হতবাক্ হয়ে গেল। সেই নীরবতার নিরুদ্বিগ্ন নির্দয়তায় হিমালয় নিথর হয়ে রইল—মুহূর্তের জন্য একমাত্র অলকানন্দার একস্বরগুঞ্জন ছাড়া আর কিছুই কানে এল না। আমরা সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

কিছুক্ষণ পরে বাগবাজারের সুশীলই আবার প্রথম মুখ খুলল। প্রহারের পরেও অবাধ্য সন্তান যেমন গোঙাতে গোঙাতে নিম্নস্বরে নিজের নালিশ জানাতে থাকে তেমনই করে বলল, না মশাই, এর ভরসায় আমি আর এক পাও এগুচ্ছি না। এক ঘণ্টা নয়, দু ঘণ্টা নয়, একেবারে তিন তিন ঘণ্টা দেরি।

প্রাপ্য শাস্তিগ্রহণে বাধা দিয়ে আমি ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললাম, তিন ঘণ্টা আর এমন কি! দেশীরামও তো মানুষ।

বলেন কি দাদা, তিন ঘণ্টা নগণ্য হল?

না, নগণ্য নয়।—ওইটুকু বলেই চুপ করতে হল কিন্তু তন্মুহূর্তে থামতে পারলাম না।—কিন্তু তিন বছরের চাইতে কম, ত্রিশ বছরের চাইতে কম, অন্তত তিন শ বছরের চাইতে অবশ্যই কম। আর অত দেরি করেও কি আমরা ছাই যে-মাল নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলাম সেই মাল নিয়ে এসে পৌছতে পেরেছি। সে সব মহামূল্যবান সামগ্রী যে কোথায় ছুঁড়ে ফেলেছি তা নিজেরাও জানি না, শুধু আবর্জনার ভারে আজ মেরুদণ্ড ভাঙছি। দেশীরামের হয়তো অপরাধ হয়েছে, কিন্তু তার জন্যে শাস্তি

দেবার অধিকার আমাদের নেই। অবশেষে শুধু বললাম, তা নিয়ে বকাবকি করে নিজের শান্তি বাড়াবার কী অর্থ হয় বলুন?

এইবারে আর সুশীল কোন স্পষ্ট প্রত্যুত্তর করল না। আরও কিছুক্ষণ চাপা ফোঁসফোঁসানির পর ভ্রূহীন ভ্রূস্থানটি কুঞ্চিত করে নিজের দেহটি নিয়ে একাই পথে নেমে পড়ল। নীলমণি চা-ওয়ালাকে বলল আরও দু গেলাস চা দিতে।

অবশেষে আমরাও উঠতে যাব এমন সময় মর্মাহত বেচারী দেশীরাম এসে মুখ কাঁচুমাচু করে জিজ্ঞেস করল, আমাদের কারও কাছে কিছু খুচরো পয়সা আছে কি না? আমার পকেটে ছ আনা ছিল তা-ই দিলাম। নীলমণি হেসে জিজ্ঞেস করল, কেয়া, ফিন কৌড়ি খেলোগে?

নাহি বাবু।—বলেই দেশীরাম সলজ্জ বিনয়ে সনম্র হাসল। সরল সহজ স্বতঃস্ফূর্ত হাসি! আমরা পথে নেমে এলাম। বেলা তখন পাঁচটা।

সন্ধ্যা হতে তখনও আড়াই ঘণ্টা বাকি। কিন্তু দিঙ্‌মণ্ডল ইতি-মধ্যেই বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। ফার্লং দুয়েক অতিক্রম করতে না করতেই হাওয়া উঠল। প্রথমে মন্দমধুর। পথের পাশের গাছগুলো হেলেদুলে হাওয়ার তালে নাচতে লাগল। পাতায় পাতায় মর্মরসঙ্গীত উঠল। কিন্তু অচিরেই হাওয়ার বেগ তীব্রতর হল, গাছগুলো তখন আর্তনাদ করে উন্মাদের মত নুয়ে পড়ে একে অপরকে চেপে ধরবার প্রয়াস পেল। হিমালয় দুষ্ট ছেলের মত ভালমানুষটি সেজে নির্বোধ বিস্ময়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল—যেন কিছু জানে না। আকাশের মেঘ আরও নীচে নেমে এল। অবশেষে অদূরে যখন বিনায়ক চটি দেখা গেল তখন নামল বৃষ্টি। ছুটে গিয়ে আমরা ছোট্ট চটির ছোট একটি চায়ের চালায় আশ্রয় নিলাম। ক্রমেই বৃষ্টির বেগ বাড়তে থাকল, এবং হিমালয়ও যেন আপন অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে পেরে লজ্জায় মেঘ-মলমলের আড়ালে আত্মগোপনের প্রয়াস পেল। অবশেষে অবিচ্ছেদ্য ভাবে মেঘভারাক্রান্ত ধূসর আকাশের পটে সম্পূর্ণ মিশে গেল। তখন যোজন জুড়ে মুষলধারে বৃষ্টি ঝরছে। যে যার চায়ের গেলাস ও জলন্ত সিগারেট হাতে নিয়ে আমরা চা-চালায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে আছি।

আমাদের আশ্রয়ের অদূরেই একটা ছোট কাঠের সাঁকোর তলা দিয়ে প্রবল উচ্ছ্বাসে একটা ঝরনা বয়ে চলেছে। এই পথে পা দেবার পর

থেকে আজ পর্যন্ত অজস্র ঝরনা দেখে অজস্রতর বার মোহিত হয়েছি; কিন্তু এমন বিশাল, এমন প্রবল, এমন সুন্দর ঝরনা এর আগে আর দেখি নি। এর আগে অন্য কোন ঝরনা এমন ভাবে কল্পনা ও অনুভবশক্তির প্রসার বিস্তৃত করে নি। এই অভিজ্ঞানের পাশে অন্য সব ঝরনা যেন মেঘদূত। মহাকাব্যের পাশে গীতিকাব্য! উপরের ওই পাহাড়ের শীর্ষদেশে, আকাশের ঠিক তলাকার তুষারবিন্দু থেকে একটি ধারা নেমে আসছে, একটু নেমেই ধারাটি দ্বিধারা হয়েছে, তারপর ত্রিধারা, অবশেষে পথের উপরকার কাঠের সাঁকোটি পেরিয়ে সহস্রধারে অলকানন্দার বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়েছে—প্রতি মুহূর্তে পড়ছে। সে কি সঙ্গীত, সে কি কল্লোল, সে কি তীব্র আনন্দ! নৃত্যের ঝঙ্কারে যেন একটি ঘাগরা ফুলে ফুলে উড়ছে। ঝরনাটি যেন স্বর্গলোক ও মর্ত্যলোকের মধ্যকার সেতু।

হঠাৎ সকলে খেয়াল করলাম যে আমরা সকলেই হতচেতন হয়ে ঝরনাটির দিকে তাকিয়ে আছি। সবাই তখন সলজ্জ একটু হাসলাম এবং সামান্য অপ্রস্তুত বোধ করলাম। অনারোগ্য নাগরিক ভব্যতায়।

ঘণ্টাখানেক পরেও বৃষ্টি থামল না, তবে একটু ধরল। এদিকে সন্ধ্যাও সমাগত। হনুমান চটিতে যাওয়া আজ আর সম্ভব হবে না; কিন্তু বিনায়ক চটিতে যাত্রাভঙ্গ করাও অসম্ভব। কেন না, প্রথমত স্থানাভাব, তা ছাড়া কাল সকালে আর তা হলে বদরিনাথ পৌঁছনো সহজ হবে না। অগত্যা প্লাষ্টিকের চাদর মুড়ি দিয়ে, কুলিকে সামনে রেখে শম্বুক-গতিতে আমরা আবার যাত্রা শুরু করলাম। যতটুকু এগিয়ে থাকা যায়।

বিনায়ক চটি ছাড়তেই ওই অবিস্মরণীয় ঝরনাটির কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলাম। আশ্চর্য! কিন্তু গত কিছুকাল থেকে এই ব্যতিক্রমটাই যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীতের কোন দংশন নেই, ভবিষ্যতের কোন ভাবনা নেই, সমগ্র সত্তা দিয়ে বর্তমানটুকুর শুধু সম্পূর্ণ উপভোগ। সামগ্রিক উপলব্ধি। অস্তিত্বের এমন একাগ্রতার সঙ্গে আমার পূর্বপরিচয় ছিল না, কিন্তু এই অপরিচয়ের জন্য একটুও অসুবিধে হচ্ছে না।

না, সামান্য একটু হচ্ছিল। কারণ বৃষ্টি। রওয়ানা হবার সময় যে ঝিরঝিরে বৃষ্টি অচিরেই থেমে যাবে বলে আশা করেছিলাম, শীঘ্রই তার ক্রমবর্ধমান বেগ বর্ষাতির প্রতিরোধক্ষমতা অতিক্রম করল। টুপির কানাতের পাশ কাটিয়ে একটি করে বৃষ্টির ফোঁটা মুখে এসে লাগছে আর

যেন ছুঁচ ফুটছে। অগত্যা মাইল দেড়েক পথ অতিক্রম করেই সেদিনের মত যাত্রা স্থগিত রেখে লামবগড় চটিতে আশ্রয় নিলাম। ওই ঝড়ে জলে নিষ্ঠাচারী তারাদারও রান্না করবার উৎসাহ ছিল না। অজ্ঞাত-কুল-শীল চটিওয়ালার সঙ্গেই নৈশাহারের নিমিত্ত আটার রুটি ও আলুর ঝোলের বন্দোবস্ত করে তিনি পাহাড়ের গা বেয়ে চটির দু'তলায় উঠে গেলেন নৈশ আশ্রয়ের সংস্থান করতে। এমন লোককে নেতা মানবার সুবিধেই এই যে নিজের জন্যে আর অযথা ভেবে মরতে হয় না। অপরাপর সময়ে একনায়কত্ববাদের বিরুদ্ধে আমিও অহিংস আন্দোলন করব, কিন্তু উপস্থিত একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে জড়োসড়ো হয়ে বসলাম।—চা-ওয়ালার উনুনের পাশে ছোট্ট একটা বেঞ্চের উপর বাইরের বারিধারা উপভোগ করবার জন্য।

মানুষ মাত্রেরই বৃষ্টিধারার প্রতি একটা অন্ধ আকর্ষণ, প্রায় দুর্বলতা আছে। তায় যদি আবার মাথার উপর নিশ্ছিদ্র নিরাপদ আচ্ছাদন থাকে তবে তো সোনায় সোহাগা। আর্দ্র শীতল হাওয়ার সামান্য একটু স্পর্শ দেহে এসে লাগতেই সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড যেন ছায়াবাজীর মতো মিলিয়ে যায়। সমস্ত পার্থিব উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ভুলে চেতনা তখন এক অবিশ্বাস্য অলৌকিক অভিযানে উদ্দাম হয়ে উঠে। শিরা-উপশিরায় প্রাগৈতিহাসিক 'ডেল্যুজ'-এর সুপ্ত স্মৃতি এই উন্মাদনার একমাত্র কারণ কিনা তা' সঠিক বলতে পারব না, তবে একবার বৃষ্টি ঝেপে এলে আমার মুমূর্ষু চেতনাও আপন অক্ষমতা ভুলে মুহূর্তমধ্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে। ঠিক আনন্দে নয় ঠিক আশঙ্কায় নয়—একটা অনির্দেশ্য আবেগে, অজানা প্রত্যাশায় সমগ্র সত্তা যেন একাগ্র হয়ে থাকে। মুখর অন্তরীক্ষের অন্ধকার নিঃসীমতায় নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। মাঝে মাঝে বিজলি চমকে উঠতে থাকল, আর যেন ঝড়ের তাণ্ডব লীলা অকস্মাৎ চমকে উঠে থমকে দাঁড়িয়েই মুহূর্তমধ্যে আবার দ্বিগুন উৎসাহে মেতে উঠতে লাগল। মাঝে মাঝে দু'জন একজন যাত্রী ভিজতে ভিজতে চটিতে এসে পৌঁছল। কখন থেকে যেন—যেন অনন্তকাল থেকে ঝড়ের ঝাপটা হাওয়ায় বহু-দূরাগত একটি সঙ্গীতের সুর কখনো বাঁধ ভাঙা বন্যার মতো কখনো বা ধরিত্রীর ক্ষীণ ক্রন্দনের মতো ভেসে আসছিল। ডুবতে ডুবতে কখন যে কোন অতলে তলিয়ে গিয়েছিলাম নিজেরই খেয়াল ছিল না। অবশেষে

গানটা যেন স্পষ্টতর হতে থাকল। শ্রুতিতে গমগম করতে থাকল, চেতনা প্লাবিত করে দিল।

মিত্রো! কভি মত পুছনা মৈ জীব হুঁ য়া ঈশ হুঁ।
মৈ বন্ধ মে হি মোক্ষ হুঁ মৈ জীবমে বিশ্বেশ হুঁ॥
মৈ বাঁধতা মৈ হি বন্ধু মৈ ছুটতা মৈ ছোড়তা।
দেতা হুঁ উত্তর সব কো নহি মুখ কিসী সে মোড়তা॥

আমি মূক হয়ে বসে রইলাম মূর্তিটির মতো। আকাশ-অন্তরীক্ষ প্লাবিত করে গভীরতম চেতনায় আনন্দাশ্রু বইতে থাকল। বাইরে বারিধারা ঝরতেই থাকল।

আমাদের ননীবাবু কখন নিঃশব্দে আমার পাশে এসে বসেছিলেন। অবশেষে 'জয় কমল বিলোচন, সংশয় মোচন, ব্রহ্মরূপ জগত্রাতা' বলে গান করতে করতে যখন জনৈক সন্নাসী ভিজতে ভিজতে চটিতে এসে পৌছলেন তখন আমাদের ননীবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে একটু ধরা গলায় বললেন, এক গেলাস চা খাওয়া যাক।

এমন প্রস্তাবের কোন প্রত্যুত্তর নাগরিক আচরণ-বিধির কোথায়ও লেখা নেই। সমান অসহায়তায় কেবল নিমজ্জমান ননীবাবুর দিকে চাইলাম। সেই গৈরিক গায়ক চটিতে পৌছেও গা মুছতে মুছতে গেয়ে চললেন, দ্বিতলে উঠে গিয়েও অবিরত গাইতেই থাকলেন। বাইরে বৃষ্টি পড়তে থাকল। অবশেষে চা পরিবেশিত হলে ননীবাবু আবার বললেন, আমাদের এই যাত্রা সম্ভবত ব্যর্থ হয়নি। কিন্তু—। কিন্তু কথাটি শেষ না করেই তিনি অকস্মাৎ থেমে গেলেন।

আবার আমি বিপদে পড়লাম। কেন না এই উক্তিটিও স্পষ্টতই শ্রোতার সমর্থনের প্রত্যাশায় উচ্চারিত হয় নি। চোখ মেলে ননীবাবুর দিকে চাইতে যেন আমার ভয় করতে থাকল। দুন-এক্সপ্রেসের কামরায় একদা যেই আত্ম-প্রত্যয়শীল ননীবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল লামবগড়ের বৃষ্টিস্নাত নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় সেই তিনি আর এসে পৌছন নি। ক্ষণপ্রভার চকিত আলোয় মাঝে মাঝে পার্শ্বোপবিষ্টর অপরিচিত চেহারা নজরে আসছিল। এর মুখে সেই হাসি নেই তিক্ততা নেই বিরক্তি নেই,— যে-সবের সঙ্গে আমার ঘনিষ্টতা সে-সবের কিছুই নেই। একটা রূঢ়তা একটা ক্লিষ্টতা একটা অনির্দেশ্য নৈর্ব্যক্তিক যন্ত্রনা যেন আপন রহস্যে হতভম্ব

হয়ে আছে। এর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপনের চেষ্টা অর্থহীন। নিজের খোঁজে ননীবাবুও অনেক দূর সরে গেছেন। ভারত সরকারের স্থায়ী চাকুরে ননীবাবুর এমন পথ-বিভ্রমে সম্ভবত একটু করুণার্দ্র হওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু অথর্ব হয়ে বসে রইলাম। এতদিনে ননীবাবু পথে বেরিয়ে এসেছেন, পথের ঝড়-জল এইবার তাঁকে সইতেই হবে। হয়তো শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবেন না, অনভ্যস্ত পায়ে অপরিচিত পথাতিক্রম করতে গিয়ে হয়তো একদিন মুখ থুবড়ে পড়বেন,—কিন্তু সেই ব্যর্থতাও তাঁরই সার্থকতা। কোন্ আঘাতে জানি না, কিন্তু যেই পথে ননীবাবু আজ পা বাড়িয়েছেন সেই পথ একমুখো। সেই পথে প্রত্যাবর্ত্তনের সুযোগ নেই। বিশ্রামের অবকাশ নেই। সহযাত্রীত্বের সান্ত্বনা নেই। ননীবাবু নিজের কাছ থেকে নিজেকে টেনে হিঁচড়ে বের করে আনতে থাকলেন। আমার নিজেকে কেমন বাহুল্য মনে হল। বাইরে বৃষ্টি পড়তে থাকল, চটির ভিতরে গৈরিক গায়ক গাইতে থাকলেন।

অথর্বের মতো অনেকক্ষণ বসে থাকবার পর অবশেষে আবার নিজেকে হারিয়ে দিতে সক্ষম হলাম। ননীবাবুর পাশে তখন অতীতের অজস্র পরিচিত, অর্দ্ধ-পরিচিত, অপরিচিত চেহারা এসে সার বেধে দাঁড়িয়েছে। এতদিন যেন সব একটিমাত্র চেতনায় আবদ্ধ ছিল। সবাইকেই নিজের সত্তার অংশ বলে চিনতে অসুবিধে হচ্ছিল না, কিন্তু সবাইকে পথে অতিক্রম করে এসেছি। সবাই যে-যার পথ অতিক্রম করে চলেছে। অমন নিঃসঙ্গতায়ও নিজেকে ঠিক চিহ্নিত করতে পারলাম না। একটা রূপহীন বৈশিষ্ট্যহীন আদি-অন্তহীন কী যেন! আজকে আর ননীবাবুর এসে আমাকে রক্ষা করবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তিনি আমার পাশেই বসে ছিলেন। জীবন-রহস্যে বুদ হয়ে আমি বসে রইলাম। বাইরে একটানা বৃষ্টি চলল, চটির ভিতরে গান।

অবশেষে এক সময় অকস্মাৎ কার অট্টহাস্যে নিঃসীম নিশ্ছিদ্র অন্ধকার যেন খান খান হয়ে গেল। চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি একটি ছাতার অজুহাতের তলায় আমাদের নাস্তিক সাধু আর নব্য-নচিকেতা ভিজতে ভিজতে চটিতে এসে আশ্রয় নিলেন। হেসে আটখানা হচ্ছিলেন স্বয়ং নাস্তিক সাধু। অপরজন যেন তখনও পুরোপুরি আত্ম-প্রকাশ না করে ডস্টয়েভস্কির পাতা থেকেই ক্লিষ্ট চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে

দেখছিলেন। চটিতে পৌঁছেও তিনি নীরবেই নিকটতম চায়ের দোকানটির একটি টুলে আসন গ্রহণ করলেন। সেই দোকানেরই অপর একটি টুলে ননীবাবু ও আমি বসে ছিলাম। নাস্তিক সাধুও আমাদের দিকে ভ্রুক্ষেপমাত্র করলেন না। তিনি হেসেই খুন হতে থাকলেন। বাইরে তখনও বৃষ্টি পড়ছিল, মাঝে মাঝে বিজলি চমকাচ্ছিল। নির্গুণ নিরাকার অন্ধকার মাঝে মাঝে চোখ খুলে নিজের ব্যাপ্তি এক একবার মেপে দেখবার চেষ্টা করছিল। আবার রহস্যান্ধকারে নিজেকেই হারিয়ে ফেলবার ভয়ে বারম্বার আত্মগোপন করছিল ঐ অন্ধকারেরই আড়ালে। উপযাচক হয়ে কোন বাক্যালাপ সুরু করবার উৎসাহ আমার আর ছিল না,—এমন কি বেদান্ত দর্শন বা মোহমুদ্গর সম্পর্কেও নয়। সেই সব সিদ্ধি এবং সমাধানের কথা শুনে আমার কী হবে যেই সব সমস্যা বা সাধনাই আমার নেই? কেবল নিজেকে বিভ্রান্ত করা আর দৃষ্টিতে জট পাকানো! যেমন ছিলাম আমি তেমনি দূরত্ব বজায় রেখে অথর্ব হয়েই বসে রইলাম।

আগন্তুক দু'জন ততক্ষণে আবার নিবিষ্টচিত্তে এক অজ্ঞেয় রহস্যের পিছনে ধাওয়া করেছেন। আগুন উভয়ের কথায়ই যথেষ্ট পরিমাণ ছিল, কিন্তু তবু নাস্তিক সাধু মাঝে মাঝে সশব্দে হেসে না উঠে পারছিলেন না। অবশেষে অপরজন,—যিনি শোনেন বেশী বলেন কম,—তিনি যেন একবার কী বলছিলেন। তাঁকে কথা শেষ না করতে দিয়েই নাস্তিক সাধু আবার হঠাৎ হেসে গড়িয়ে পড়লেন। অতঃপর বললেন, আপনার কথা মানি আর না-মানি আপনি বলেছেন কিন্তু চমৎকার। এতো চমৎকার যে মনে হয় না-মানলেও বুঝি কিছু এসে যায় না!—নিজের কথা বন্ধ রেখেও তিনি আবার এক পেট হেসে নিলেন।—মৃত্যুটাই নিয়ম, জীবনটা ব্যভিচার! অন্ধকারই সহজাত, আলোটুকু সূর্যের নিকট থেকে ভিক্ষে করা ধার করা চুরি করা! ভূমিষ্টকাল থেকে মৃত্যুর শেষক্ষণটি পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তই মৃত্যুতে আকীর্ণ হয়ে আছে! এমন কি পরবর্তী জীবন-গুলোর সঙ্গেও পূর্ববর্তী মৃত্যুগুলোর কোন কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই,—প্রতিটি জীবনেই কেবল এক একটি সম্ভাবনার মৃত্যু, প্রতিশ্রুতির সমাধি! হাসি মানেই কান্নার আবরণ, আনন্দ মানেই দুঃখের প্রস্তুতি, প্রেম মানেই বিরহের ভূমিকা!—হাসতে হাসতে নাস্তিক সাধুর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল,

তবু তিনি ফুলে ফুলে হেসেই চললেন। এহেন হাস্যকর প্রস্তাব যেন সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরমে কেউ কোনদিন শোনেনি!

হাসতে হাসতে হঠাৎ এক সময় তিনি দপ্‌ করে থেমে গেলেন। যেন আঁধার-রাতে সাপের মাথায় পা পড়ে গেছে; চটি শুদ্ধ চমকে উঠল অকস্মাৎ! পিছন ফিরে দেখি দুজনের একজনের মুখেও আর শব্দটি নেই। দু'জনে বসে আছেন দুটো মূর্তির মতো। বাইরের আহত বিস্ময় সম্পর্কে উভয়ের কেউই যেন কণামাত্র সচেতন নয়।

অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে আবার চটির সাড়া পাওয়া যেতে থাকল, অত্যন্ত মৃদু গুঞ্জনধ্বনি:—যেন বিস্ময়ের অন্তরালে একবার শ্বাস নিয়ে নেবার চেষ্টা! কিন্তু ঘটনার আগা-মাথা কিছু বুঝতে না পেরে আমি বোকার মতো নির্বাক মূর্তি দুটোর দিকেই তাকিয়ে রইলাম। অবশেষে সেই মরণ-বাতিকগ্রস্ত ভদ্রলোক জুতো পরতে সুরু করলেন এবং এতক্ষণ পরে করুণ একটু হেসে বললেন, অনভিজ্ঞদের পক্ষে মৃত্যু সম্পর্কে রসিকতা করা খুবই সহজ। আপনাদের দেখলে ঈর্ষাও হয় আবার করুণাও হয়!

ভদ্রলোক ধীর ক্লান্ত পদে চটি থেকে নির্গত হয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে বাইরের হিমশীতল অন্ধকারে নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন। এঁর নিকট থেকে এমন হিংস্র রূঢ়তা কোনকালে সম্ভব বলে আশঙ্কা করিনি। নাস্তিক সাধুকেও অত্যন্ত মর্মাহত এবং অসহায় দেখাল। তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ সবাক সমবেদনাও যেন এই নিষ্ঠুর আঘাতে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়াল, মূক হয়ে গেল। কিন্তু নাস্তিক সাধুর অবয়বে পরাজয়-জনিত ক্ষোভ অপেক্ষা অক্ষমতা-জনিত অসহায় ভাবটাই অধিকতর পরিস্ফুট হয়ে রইল। আমি কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে অবশেষে হাল ছেড়ে দিলাম। বার কয়েক তিনি আমার দিকে তাকালেন বটে কিন্তু একবারও আমাকে দেখতে পেলেন না। আমার দৃষ্টি সাধুজীর প্রতিই নিবদ্ধ ছিল কিন্তু সাধুজীর দৃষ্টিতে আমার সামান্যতম স্বীকৃতিটুকুও অনুপস্থিত। আস্তে আস্তে বিচিত্র একটা অনুভূতিতে সব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে পড়বার সম্মুখীন হল। যেন আমার অস্তিত্বটাই একটা অবিশ্বাস্য আজগুবি ব্যাপার। আমি যেন আসলে একটা উদ্ভট কল্পনা! এই বিশ্ব-চরাচরের সর্বত্র সব কিছু যেন ঠিক আছে—সাধুজী দোকানদার দোকান আলো

আঁধার যেখানকার যা সব কিছু পরিপাটিরূপে সাজানো। কেবল আমি নেই। আমার যেন থাকবার কথাও নয়, যেন ছিলামও না কোনদিন। সামান্য এককণা ভ্রান্তি বুঝি ছিল, এখন আস্তে আস্তে সেটুকুও কেটে যাবার উপক্রম। অবকাশ থাকলে শেষ পর্যন্ত কোথাকার জল কোথায় দাঁড়াত জানি না, তবে চটি-ওয়ালা হঠাৎ নৈশাহার প্রস্তুত বলে হাঁক পাড়ল। তখন দেখি উননের সামনেই একটা বেঞ্চের উপব দিব্যি পা তুলে বসে আছি। স্বয়ং আমি এবং ননীবাবুও!

একটু পরে দলের অন্য সবাই উপর থেকে নেমে এল। নীলমণি কী নিয়ে যেন একটা রসিকতা করল। নৈশাশ্রয়টুকুর ব্যবস্থা করে দেওয়াতে তারাদা ঈশ্বরকে একবার ধন্যবাদ জানালেন। সুশীল বলল, ঘোঁৎ! খানিক পরে আমরা দলশুদ্ধ উপরে চলে এলাম। বাইরে তখন বৃষ্টি ঝড়ছে। নাস্তিক সাধু তখনও তেমনি বসে আছেন।

নাস্তিক সাধু তেমনি বসে রইলেন, কিন্তু তাঁর সম্পর্কেও আমার আর তখন বিন্দুমাত্র কৌতূহল ছিল না। একটু পরেই শয্যায় শয়ন-মাত্র নিদ্রাভিভূত হব,—আহার সমাধা হতেই দেহের শিরা-উপশিরা শিথিল হয়ে এল, চিন্তা চেতনা ঝিমোতে সুরু করল। এমন কি উপরে উঠে চটির অব্যবস্থা সরেজমিনে দেখবার পরেও যথেষ্ট বিরক্ত বোধ করতে পারলাম না। চটির অবস্থা সত্যিই বর্ণনাতীত! যেখানে দশ জন লোকেরও জায়গা হবার কথা নয় সেখানে এসে মাথা গুজেছে কমপক্ষে চল্লিশ জন লোক। টিনের ভিতরকার সাডিন মাছের মতো গায়ে গায়ে শুয়েও সমস্যার আদৌ সমাধান হয়নি, অনেকেই জড়োসড়ো হয়ে বসে গল্প জুরেছে। সেই গৈরিক গায়কও জনা কয়েক গঞ্জিকাসেবীর সঙ্গে গোল হয়ে বসে একের পর এক গান গেয়ে চলেছেন। আমাদের নীলমণি ও তারাদার যুগ্ম-প্রচেষ্টায় চটির এক কোণে সামান্য একটু স্থান সঙ্কুলান হয়েছিল—সেই প্রোক্রাষ্টিয়ান শয্যাতেই হাত পা গুটিয়ে শুয়ে পড়লাম। আজ আর এমন অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করি না, কিন্তু অত অসুবিধায় অমন হট্টগোলের মাঝেও শুয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম!

কিন্তু মুহূর্ত পরেই তড়াক করে আবার সবাইকে উঠে বসত হল। চটির চাল ভেদ করে জল পড়ছে অঝোর ধারে! চটির অন্যান্য তন্দ্রার্ত যাত্রীদের বিরক্তি উপেক্ষা করে বিছানাপত্র গুটিয়ে কিছুক্ষণ এ-কোণ

ও-কোণ ছুটোছুটি করা গেল। কিন্তু কেবল ছুটোছুটিই সার হল, চটির সব কোণেই বান। অগত্যা যে যার স্তূপীকৃত বিছানার উপর বসে ঝিমোতে ঝিমোতে সিগারেট টানতে লাগলাম। একটার পর একটা। বৃষ্টি পড়তেই থাকল। মাঝে মাঝে বিজলি চমকে উঠছে, সেই ক্ষণিক আলোয় ভারাক্রান্ত আকাশের আক্রোশ দেখে হিমালয় হতচকিত। এদিকে উত্তরের আগলহীন দরজা দিয়ে হু-হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে হাড় জমিয়ে দিচ্ছে। গরম কোট গরম ট্রাউজারসের উপরে গরম চাদর গরম কম্বল জড়িয়ে আমরা জড়োসড়ো হয়ে বসে রইলাম। রাত্রি বাড়তে লাগল।

ক্রমে রাত্রি কমতে লাগল। রাত্রির অবশেষে আর যখন মাত্র প্রহর দুয়েক বাকি তখন আমাদের চটিতেই অকস্মাৎ এমন এক হট্টগোল উঠল যে হঠাৎ মনে হল, বুঝি বা আগুনই লেগে থাকবে। কিন্তু আসল ঘটনা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। শালগ্রাম-শিলা মশায়, যিনি আমাদের চটিরই অপরপ্রান্তে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি তাঁর আফিমের কৌটো খুইয়েছেন। সমস্ত জিনিষপত্র তছনছ করে খোঁজা হয়েছে, কণ্ঠ সপ্তমে তুলে পত্নী ও কুলিকে শাসানো হয়েছে, পাড়াপড়শীদেরও হাতে পায়ে ধরে অনুনয় করা হয়েছে, কিন্তু হারানো মানিক মেলে নি। অগত্যা এখন তিনি নিজেরই পোড়াকপাল চাপড়াচ্ছেন, আর মাতৃহারা অনাথের মত কাঁদছেন। সমস্ত ব্যাপার দেখে আমাদের শীতের হি-হি আমোদের হা-হা হয়ে গেল। পঞ্চাশ বছরেরও বেশী বয়সের এক হোঁদল-কুৎকুৎ কালো মেদের জালা অবোধ শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে, এর চাইতে আমোদের আর কী আছে?

এর চাইতে অধিকতর দুঃখেরই বা আর আছে কী? দেখতে দেখতে আমাদের মুখের হাসি মুখেই শুকিয়ে গেল। আরও দু-চারবার অগোছালো জিনিসপত্রগুলো উল্টেপাল্টে খোঁজা হল, আরও দু-চারবার স্ত্রীকে কুলিকে শাসানো হল, অনুনয় করা হল, কিন্তু সব বৃথা। পরশপাথর মিলল না। তখন ভদ্রলোক আবার হাল ছেড়ে অসহায়ের মত কাঁদতে শুরু করলেন। এক দিন দু দিন নয়, দু বছর চার বছর নয়, গত ত্রিশ বছরের নেশা। আফিম না হলে ঘুম হয় না, ঘুম ভাঙে না। আফিম না খেলে মুখে অন্ন রোচে না, পেটের অন্ন হজম হয় না। সেই আফিম

না হলে তিনি বাঁচবেন কেমন করে, পথ চলবেন কেমন করে, ফিরেও যে যেতে পারবেন না! কোন্ পাপে ঈশ্বর এমন শাস্তি দিলেন? কার পাপে এমন হল! ঈশ্বর, শত্রুও যেন কখনও এমন অবস্থায় না পড়ে! ভদ্রলোক হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। হিমালয়, চটি, বিদ্যুৎ-আলোকে ঝলসানো দূরের সুক্ষ টানা পথ, যাত্রীরা সবাই শ্বাসরুদ্ধ করে উৎকর্ণ হয়ে সে কান্না শুনতে লাগল। বাইরে মুষলধারে বৃষ্টি ঝরেই চলেছে।

চটির দূরতম কোণে একটা কেরোসিনের ডিবে মিট মিট জ্বলতে থাকল। সেটাতে আলো অপেক্ষা ধোঁয়ার পরিমাণই বেশী। গান করতে করতে আমাদের গৈরিক গায়ক কখন পাশের দেয়ালে সামান্য হেলান দিয়ে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়েছেন। বিচিত্র গাত্রবর্ণ এই গৈরিক গায়কের, দেহের ত্বক্ ভেদ করে যেন প্রভাত-সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ছে। প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘায়ত চক্ষু, তীক্ষ্ণ নাসা, ক্ষীণ ওষ্ঠরেখা, সুগঠিত চিবুক,—বয়স পঁচিশও হতে পারে পঁয়তাল্লিশও হতে পারে। অবয়ব যোগে,—এমন কি বসবার ঋজু ভঙ্গীটিতে পর্যন্ত একটা অবিশ্বাস্য প্রশান্তিভাব। নিদ্রার সম্ভাবনা আর ছিল না। আমার আবার সেই জ্যোতিষ্পীঠের কথা মনে পড়ল। মনে হল, কাল আবর্তিত হয়েছে, আদর্শ বিবর্তিত হয়েছে এই সবই আসলে নিজেকে ভুলিয়ে রাখবার জন্যে দুর্বল মানুষের অপযুক্তি। আসলে সবকিছু চিরকালের জন্য নিত্য-বর্তমান। আমাদের পঙ্গু চেতনার অত সামর্থ্য নেই বলে আসল সত্যটাকেই আমরা উপেক্ষা করি। আসলে শঙ্করাচার্য আজকেও জন্মাচ্ছে, এবং হেলাভরে সব মিথ্যা ত্যাগ করে আসছে। শালগ্রাম শিলা কান্না দিয়ে নিজেকে ভুলিয়ে রাখুক, যাত্রীদল চটির অব্যবস্থায় নিজেদের বিক্ষিপ্ত করে রাখুক ক্লান্তির অজুহাতে যত খুশী ঝিমোক,—এই সকল মুখোশের অন্তরালে আসল রহস্য যে একবার জেনেছে তাঁর আর বিস্মিত হবার অবকাশ নেই। কেরোসিনের ডিবেটা থেকে ধোঁয়া নির্গত হতে থাকল,—শালগ্রাম শিলা কেঁদে চললেন,—গৈরিক গায়ক ভ্রূক্ষেপও করলেন না!

এই নিরুদ্বিগ্ন নিরুৎকণ্ঠা যতই বলিষ্ঠ এবং চিত্তের স্থিরতার জন্য যতই স্বাস্থ্যসম্মত হোক এর অন্তর্নিহিত নির্দয়তা কিন্তু বড়ই ক্লেশকর। যারা ঝিমোচ্ছেন তাদের নিকট আবেদন করা নিরর্থক, কিন্তু যিনি জেগে

উঠেছেন তিনি কেন জগতের এই বিশৃঙ্খলা উপেক্ষা করবেন? হয়তো কিছুই করবার নেই, কিন্তু তাই বলে অপরের অসহায়তায় সামান্য একটু বেদনা অনুভব করব না! গৈরিক গায়ক নির্বিঘ্নে ঘুমোতে থাকলেন। শালগ্রাম শিলা সমস্বরে কেঁদে চললেন। এমন মর্মান্তিক অসহায়তা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়, কেবল বুকভাঙা ক্রন্দনই এই অসহায়তার একমাত্র ভাষা! দিনের শেষে ছোট্ট মুদী-দোকানের নোংরা চটের উপর বসে একটি একটি করে পয়সা গুণতে থাকলে যাকে মানাত সে কিনা লামবগড় চটির বর্ষাবিক্ষুব্ধ সন্ধ্যায় এক ঘর অপরিচিত লোকের মাঝে বসে বুক উজাড় করে কেঁদে চলেছে!

অবসাদগ্রস্ত চেতনায় নানান পরস্পর-বিরোধী ভাবনা ভাবতে ভাবতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। হয়তো বা নিদ্রাভিভূতই হয়ে থাকব। কিন্তু মাথার ভিতরে, সুপ্ত চেতনায় শালগ্রাম শিলার ক্রন্দন অনুরণিত হচ্ছিল ক্রমাগত। কখনো উতরোল নিবিষ্টতায়, কখনো অবসন্ন অনিবার্যতায়। হঠাৎ যেন চেতনার সামনে থেকে একটা আবরণ সরে গেল। মনে হল যেই আঘাতে শালগ্রামশিলা আজ এমন অসহায় সেই আঘাত বুঝি তা'র বহু প্রত্যাশিত ছিল। আজ সন্ধ্যায় আফিমের কৌটোটি হারাবেন বলেই—হারিয়ে এমন হৃদয় উজার করে কাঁদবেন বলেই যেন গত ত্রিশ বৎসর সে কৌটো অত সন্তর্পণে সদা-সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে বহন করেছেন। মনে হল, বিশ্বচরাচরময় মানুষের এই যে বিরাট ছলনা—মান-সম্মান পদ-প্রতিপত্তি আশা-আকাঙ্ক্ষা—সবই কেবল সেই চূড়ান্ত আঘাতটির জন্য। আঘাতটি যাতে চূড়ান্ত হয় সেই জন্য। নিমজ্জনকালে যাতে হাতের মুঠোয় খড়-কুটোটিও না পাওয়া যায় সেইজন্য। সবাই ঝিমোচ্ছে ঐ জেগে উঠবার আশায়! সবাই নিজেকে ভুলিয়ে রাখছে অবশেষে একদিন নিজেকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করবে বলেই। সেদিন যাতে আর কোন প্রতিবন্ধক না থাকে!

ঘুমোতে ঘুমোতে ভাবছিলাম, কিম্বা ভাবতে ভাবতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলাম হলফ করে বলতে পারব না। তবে রাত্রির সেইটে প্রায় শেষ প্রহর। কোথাও কোন আলোড়ন নেই, শব্দ নেই। আমাদের চটির অপর প্রান্তে শুধু একটি স্তিমিত প্রদীপের শিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে। সেই কম্পিত আলোয় বসে এক হতভাগ্য প্রাণ

বুক উজাড় করে কাঁদছে। আদিগন্ত নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে একটি মাত্র ঢেউ, মৃদু একটু চাঞ্চল্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত একটা অত্যন্ত বিষাদব্যঞ্জক সঙ্গীতের মধ্যে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলছি। আশা নেই হতাশা নেই, সুখ নেই দুঃখ নেই, শুধু এক সঙ্গীতে সমস্ত চরাচর অভিভূত।

রাত্রির শেষ প্রহরের ঘুম, বসে বসে হলেও ভাঙতে নিশ্চয়ই বিলম্ব হত। কিন্তু ওই শালগ্রামশিলার এক চিৎকারেই আবার সকলে চমকে উঠে চোখ মেললাম। তবে এবারের চিৎকারটা আর উতরোল ক্রন্দনের নয়, অট্টহাস্যের। শালগ্রামশিলা দেখি তার বিশাল বপুটি নিয়ে বার বারই সসঙ্কোচিত সেই গৈরিক গায়কের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ছে আর বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হেসে হেসে বলছে: এমনটা যে ঘটবে তা আমি জানতাম; এমনটা যে ঘটতেই হবে। এতদূর পর্যন্ত টেনে এনে কি ঈশ্বর ভক্তকে ফিরিয়ে দিতে পারেন দর্শন না দিয়ে? আপনি ঈশ্বরের দূত, আপনিই আমাকে বাঁচালেন; অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করলেন। আপনার কথা আমার চিরজীবন স্মরণ থাকবে।

সঙ্কোচের সীমা অতিক্রম করে সাধুজী এইবার বিরক্ত হলেন। ভ্রূ কুঞ্চিত করে হিন্দি ভাষায় বললেন, আমাকে মনে রাখবার প্রয়োজন নেই। অনুগ্রহ করে এইটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট হবে যে আমার পক্ষে যতটুকু দেওয়া সম্ভব ছিল ততটুকুই আপনাকে দিয়েছি। আমার কাছে আর আফিম চাইবেন না, আমার কাছে আর নেই।—কাঁধের উপর কম্বল ফেলে, কোমর বেঁধে সাধুজী লাঠি হাতে বেরিয়ে পড়লেন।

একগাল হেসে শালগ্রামশিলা বলল, তা নয় নাই থাকল, আপনি থাকবেন তো? তা হলেই আমার চলে যাবে।—বলে হাসতে লাগল।

অবশেষে আমরাও চটি থেকে বেরিয়ে এলাম; এবং এক গ্লাস করে চা পানের পর পথ ধরলাম। সকাল হবার কিছুক্ষণ আগেই বৃষ্টি সম্পূর্ণ ধরে গিয়েছিল, কিন্তু পর্বতগাত্র এখনও শুকোয় নি। গাছের ভিজে পাতাগুলো সূর্যের প্রতিফলিত প্রভায় চকচক করছে।

হনুমান চটিতে ক্ষণিক মিলনের পর আমাদের দল আবার ভেঙে গেল। তারাদা সটান আগেই চলে গেলেন, ননীও খোঁড়াতে খোঁড়াতে তার পিছু ধরল। সুশীল একটা ঘোড়া নিল। তারপর আমি আর

নীলমণি গল্প করতে করতে ধীরপদে এগুতে লাগলাম। হনুমান চটির পর কুখ্যাত চার মাইল চড়াই আছে।

কিন্তু এই খ্যাতি সম্পূর্ণ অমূলক। শুধু তাই নয়, চলতে চলতে আমাদের মনে হচ্ছিল, এর চাইতে সুন্দর সহজ রাস্তা আশা করাই শক্ত। বেশ হালকা অলস একটি সুরের মত নিজেদের অজ্ঞাতে নিশ্চিন্তে বয়ে চলেছি। পথে এর সঙ্গে দেখা হচ্ছে, থেমে দুটো কথা বলছি। ওর সঙ্গে দেখা হচ্ছে, হেসে কুশল জিজ্ঞাসা করছি। পাশের উপত্যকা দিয়ে অলকানন্দা সকল্লোলে বয়ে চলেছে। উপরের চড়াই ভেঙে আমরা।

আরও কিছুটা পথ অতিক্রম করে দেখি, অদূরে পথের একটি বাঁকে কয়েকজন যাত্রী একজোট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং সবাই সমবেতভাবে হাত-পা নেড়ে কাকে যেন কী বুঝাবার চেষ্টায় ব্যস্ত। কাছে যেতে দেখলাম, এক মধ্যবয়স্কা মাদ্রাজী মহিলা পথের মাঝে বিপর্যস্ত হয়ে বসে হাটের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া উদ্‌ভ্রান্ত বালকের মত হাত পা ছুঁড়ে কাঁদছে। সমবেত যাত্রীদের কেউ মহিলার ভাষা বোঝে না, মহিলারও এক মাদ্রাজী ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানা নেই। দু পক্ষই তাই হাত-পা ছুঁড়ে অপর পক্ষকে নিজের কথা বোঝাবার অশেষ চেষ্টা করছে। কিন্তু বৃথা। দু-চার জন করে যাত্রী আসছে, মহিলার সমস্যা বোঝবার চেষ্টা করছে তারপর বুঝে বা না বুঝে যা হোক কোন একটা সমাধান বোঝাবার চেষ্টা করছে, অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে নিজের নিজের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। মহিলা কখনও কাঁদছে কখনও শুধু গোঙাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মহিলার অঙ্গভঙ্গি দেখবার পর ওর কান্নার কারণটা কথঞ্চিৎ অনুমান করা গেল, ও ওর সহযাত্রীকে হারিয়েছে। সহযাত্রী কি এগিয়ে গেছে, না পিছিয়ে পড়েছে ও কিছু জানে না। এখন ও করে কী? আমরা হাত-পা নেড়ে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, ও এখানেই আরও কিছুক্ষণ বসে সহযাত্রীর অপেক্ষা করতে পারে; আর নয়তো মাত্র দু মাইল পরেই বদ্রিনাথ, সেখানে গিয়েও খোঁজ নিতে পারে। কিন্তু কে কার কথা বোঝে? আমাদের কথা অর্দ্ধেক শেষ না হতেই মহিলা আবার হাত-পা নেড়ে কাঁদতে সুরু করল। কাঁদুক, যার যেমন কপাল! আমরাও আবার আমাদের পথ ধরলাম। কিন্তু

অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেহ-মনবিবশকারী একটা ব্যর্থতার ক্ষোভ অক্ষম বিবেককে দংশন করতে থাকল।

আরও মাইল খানেক পথ অতিক্রম করে নিজেদের পুরোপুরি সামলে নেবার আগেই আবার এক আঘাতে আমাদের পৌরুষ সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হল। এবারেও ঘটনা সেই একই, একই দৃশ্য! তবে পূর্বেকার অপরার্ধ। এখানেও জনৈকা মধ্যবয়স্কা মাদ্রাজী মহিলা পথের উপর লুটিয়ে হাত-পা ছুঁড়ে কাঁদছেন। দেখে মনে হল ইনি প্রথমার ভগ্নী হবেন। এইবারে সমাধানটা আমাদের জানা। হাত-পা নেড়ে অনেক করে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, মাত্র মাইল খানেক পথ পিছিয়ে গেলেই সে তার হারানো আপন জনকে খুঁজে পাবে। কিন্তু আবারও কে কার কথা শোনে! মহিলা মরছে নিজের শোকে, অপরের কথা শোনবার তার সময় কোথায়। ছিঁড়ুক, যে যার মাথার চুল ছিঁড়ুক, কপাল ঠুকে যে যার মাথা ভাঙুক! অপরে কী করবে, অপরে কী করতে পারে। একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিমর্ষ পদে আমরা আমাদের নির্ধারিত পথে চলে এলাম।

পরাজয়ের গ্লানির দুর্বহ বোঝা কাঁধে নিয়ে নিয়তির তাড়নায় পথ চলতে এইবার বেশ ক্লেশ হতে লাগল। পথও এখন অধিকতর সঙ্কীর্ণ ও বিপদ্‌সঙ্কুল, মাঝে মাঝেই বরফাবৃত এবং অত্যধিক পিচ্ছিল। নিকটস্থ তুষারশিখরে সূর্যকিরণের বর্ণোচ্ছল ক্রীড়া, সদ্য-জটামুক্ত অলকানন্দার সোচ্ছ্বাস প্রবাহ কোন দিকেই নজর দেবার অবসর ছিল না। নিজের ওই সঙ্কীর্ণ পথটুকুতেই দৃষ্টি সম্পূর্ণ নিবদ্ধ রেখে অতি সন্তর্পণে অতি ধীর পদে এগুতে লাগলাম। কেন না, সামান্যতম অসাবধানতায় একবার একটু পা ফসকালেই সঙ্গে সঙ্গে পতন ও মূর্চ্ছা নয়, অবধারিত সদ্গতি।

এমন সময় পাহাড়ের একটা বাঁক ঘুরতে অকস্মাৎ যেন যুগযুগান্তরের পুঞ্জীভূত বিষাক্ত কালো মেঘাচ্ছাদন ভেদ করে শরতের পূর্ণ শশী মিষ্টি হাসল—হাসতে লাগল। যেন তমসাবৃত প্রভঞ্জনোন্মত্ত পৃথ্বী বিজলির চকিত আলোয় চমকে উঠে চকিত সলজ্জতায় চক্ষু নিমীলিত করল, নিমীলিত চাইল। যেন জগতের সমস্ত সুরহীন ছন্দোহীন আবোলতাবোল কুৎসিত আর্তনাদরাশি একত্র হয়ে চোখের নিমেষে সঙ্গীতে রূপান্তরিত হল—বাজতে থাকল। যেন রুগ্ন সন্তানের উত্তপ্ত কপালে মা হাত

বুলোলেন; যেন হতভাগ্য বিকারগ্রস্ত বিভ্রান্ত মানুষের সামনে ঈশ্বর এসে সহাস্যমুখে দাঁড়ালেন। সুদীর্ঘ কুটিল পথের শেষে সঙ্কীর্ণ বিপদসঙ্কুল একটা বাঁক অতি সন্তর্পণে ঘুরে দেখি, অদূরেই বদরিকাশ্রম। সুদীর্ঘ-কালের অপরিচয়ের পর হঠাৎ দেখি হিরণ্ময়োঽহং শিবরূপমস্মি।

পূর্ণতার অনর্জিত পুরস্কারে এর আগে আমি একাধিকবার বিব্রত হয়েছি। এই সেদিনও কেদারনাথে আমার ভীতকম্পিত হাত থেকে তা ফসকে পড়ে গেছে, অপ্রতিভ চিত্তের তা উপলব্ধি করবার সাহস হয় নি। ইতিমধ্যে কোন উচ্চতর মূল্য দিয়েছি কি না জানি না, সজ্ঞানে অন্তত এক কানা কড়িও দিই নি; অথচ দূর থেকে আজ বদরিনাথের আলেখ্য দেখে সহজভাবেই অনুভব করলাম যে, আকাশ অন্তরীক্ষ পৃথিবীর সঙ্গে আমি এক অভিন্ন এবং অবিচ্ছেদ্য। স্পষ্ট উপলব্ধি হল যে, আমাকে ছাড়িয়েই আমি পূর্ণ। আমিতে বিধৃত হলেও আমি আমাকে ছাড়িয়ে! এষ একো দেবঃ।

ধ্বনি দিতে দিতে যাত্রীদল আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। তাদের কারও আর পায়ে ক্লান্তি নেই, সকলেরই চোখে অবসন্নতা ভেদ করে অবিশ্বাস্য এক দ্যুতি ঠিকরে বেরুচ্ছে, সবারই চিত্ত পূর্ণ। একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেট নীলমণির দিকে এগিয়ে ধরে বললাম, আসুন, একটু ধূমপান করে নেওয়া যাক।

এক্ষুনি আবার কেন? আগে চলুন নয়নকে কৃতার্থ করি, তারপর প্রেমসে সিগারেট ফোঁকা যাবে! নীলমণি মৃদু হাসল। মৃদু হেসে আমি সিগারেট ধরালাম।

আর কী করব, বলারই বা কী আছে! সৌভাগ্যের কথা? কিন্তু সে তো স্বতঃসিদ্ধ আর একান্তই স্বাভাবিক। পুরস্কারের প্রশংসা? অত সাহস কই! তবে? আবার দুজনে দুজনের দিকে মূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকা! শুনেছি না-কি প্রেমে পড়লে মানুষকে বোকা-বোকা দেখায়। অভিযোগটা সম্ভবত অমূলক নয়। সস্তা চাতুরি ও ক্ষুদ্র বুদ্ধির বাইরে সবাইকেই অমন অপ্রতিভ মনে হয়। সেটা আমাদের অভ্যাসের দোষ, দৃষ্টির অনারোগ্য পক্ষপাতিত্ব। জীবনের সঙ্কীর্ণ পরিধি থেকে, অসমঞ্জসতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পরিপূর্ণ সুসমঞ্জস কিছু স্বীকার করে নেয়া সহজ নয়। তাকে মূঢ়তা বলে উপেক্ষা করাই অপেক্ষাকৃত

সুবিধাজনক। তাই অমন তৃপ্তি সত্ত্বেও নিজেদেরকে কেমন বোকা-বোকা ছেলেমানুষ বলে মনে হচ্ছিল। অথচ ঐ প্রশাস্তিও প্রত্যাখ্যান করবার নয়। অগত্যা নিজের কাছে মুখ রাখবার জন্যে এক-একবার সিগারেটে টান দিই, আবার নিজেকে বিস্মৃত হয়ে মূঢ়ের মতো হাসতে থাকি! একটা অবিশ্বাস্য লুকোচুরি খেলা সুরু হল। নিজেকে ভব্য-সভ্য রাখতে গিয়ে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম!

সেদিন যা দেখেছি, সেদিন যা অনুভব করেছি কথায় তা বোঝাবার নয়; ভাষা তা বইতে পারবে না। গায়ক হলে গেয়ে শোনাতাম। মন্ত্র জানলে মোহিত করে বোঝাতাম। আমিও এখন গান শুনতে শুনতে সম্পূর্ণ মোহিত হলেই মানসনেত্রে মাঝে মাঝে আবার সেই দৃশ্য দেখতে পাই, সেই ব্যঞ্জনা কচিৎ কখনও সামগ্রিকভাবে চিত্তে অনুভব করতে পারি। সাদাসিধা ভাবলে শুধু মনে পড়ে, বদরিনাথ পর্বতশীর্ষের নাতিক্ষুদ্র বিস্তার, যা তুষার-আবৃত কিন্তু সমাধিস্থ নয়। তার পরেই প্রায় পাদদেশ পর্যন্ত পৃথিবীর উপাদান কালো শক্ত শিলা—এখানে-ওখানে কেবল একটু-আধটু ধবধবে বরফ জমে আছে। বদরিনাথের পাদদেশ অলকানন্দা বিধৌত। বাম দিকে স্বর্ণশূল থেকে শ্বেত উপবীতের মত ঋষিগঙ্গা নেমে এসে অলকানন্দার সঙ্গে মিশে পূর্ণতা পেয়েছে। মাঝখানে নিপুণ শিল্পীর কল্পনায় আঁকা ছোট ছোট বাড়ি, সরু সরু রাস্তা, একটি মন্দির চূড়ো, যাত্রীর ভিড়—জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত যুগ-যুগান্তরের তীর্থ, ভক্তের উদ্ধত আকাঙ্ক্ষা, আর্তের অন্তিম আশ্রয় বদরিকাশ্রম!

কেদারনাথ জিজ্ঞাসা, বদরিনাথ উত্তর। কেদার শান্ত বদরি স্নিগ্ধ। প্রথম সমাহিত দ্বিতীয় সস্মিত। এক নেশা অপর সুখস্মৃতি। কেদারনাথের দাবি স্বয়ং ভক্ত, বদরিনাথের দান ভক্ত স্বয়ং। কেদারনাথ সমাহিত মৃত্যু, বদরিনাথ উদার জীবন এবং পুনর্জীবন। কঠিন কেদার, বদরি বিশাল!

তেরো

ভাবুক ব্যক্তিমাত্রেই একান্ত ব্যক্তিগত কতকগুলো কাব্যকথা সমস্ত জীবন ধরে সন্তর্পণে রক্ষা ও সযত্নে পরিপুষ্ট করে থাকেন। ভাবুক যদি কবিও হন তবুও কদাচিৎ এই কাব্য লিপিবদ্ধ হয়, অধিকাংশ সময় এই কাব্য লেখবার কথা কবিমনেও উদিত হয় না। আর তৎসত্ত্বেও যদি সেই কাব্য কখনও কোনক্রমে লিখিত হয়ে যায় তবে তা কবির বিচক্ষণতার অন্তরালস্থিত একান্ত গোপনীয় অবোধ দুর্বল অসূর্যম্পশ্য শিশুটিকেই শুধু জ্ঞাতার নিষ্ঠুর চোখের সামনে মেলে ধরে। পৃথিবীর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, যে-কবির কাব্য অত মহৎ সে কবির জীবন কত করুণ, কত হাস্যকর। কিন্তু এই শিশুটি ভাবুক ব্যক্তির বড় আপনার জন, প্রায় একমাত্র আত্মীয়। এই অব্যক্ত কাব্যকথা ভাবুকের হতাশার আশা, ব্যর্থতার সান্ত্বনা, জগৎ ও জীবনের রূঢ়তা থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র বর্ম।

আমার মনের অন্য সব আগলই যখন আজ মেলে ধরেছি তখন আর এ কথা কবুল করতেও সঙ্কোচ নেই যে, আমিও আসলে এমনি কতকগুলো অব্যক্ত যুক্তিহীন রূপকথাজীবী। আর সেগুলোর মধ্যে যেটি অন্যতম সেটি হচ্ছে, সংক্ষেপে, আমি যখন যেখানে অনুপস্থিত তখন সেখানেই সেই বস্তুটি সহজলভ্য—যে বস্তুটির সন্ধানে আমি সমস্ত জীবন ক্ষ্যাপার মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি শ্যামবাজারে থাকলে সে বালিগঞ্জে; আমি দক্ষিণে এসে দেখি সে কখন্ উত্তরে চলে গেছে। দূরের বাঁশিতে কতদিন তার সাড়া পেয়েছি, দূর দিগন্তে তার অস্তিত্ব পরোক্ষভাবে কতবার প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু যতবারই তাকে ধরবার জন্য দিগন্তের দিকে ছুটে গেছি

ততবারই সে দিগন্তরে আত্মগোপন করেছে। দীনতার সঙ্গে তখন ব্যর্থতা যুক্ত হয়ে জীবনই কেবল অধিকতর দুঃসহ হয়েছে।

বদরিকাশ্রমে আমার জন্য এমনি এক মর্মান্তিক হতাশা প্রচ্ছন্নভাবে প্রতীক্ষা করছিল। চার ফার্লঙ দূর থেকে অজ্ঞেয়কে অত কাছাকাছি দেখে মনে হয়েছিল এইবার আর পথ ভুল করি নি। ভেবেছিলাম দুঃস্বপ্নকণ্টকিত বীভৎস তমসার শেষে দিন এইবার সমাগত। স্থির বিশ্বাস হয়েছিল যে, এই দীর্ঘকাল ধরে যত মূল্য দিয়েছি তার বিনিময়ে এবার আমার শূন্য ঝুলি পূর্ণ হবে। অমন নিশ্চয়তার পরে নিশ্চিত ব্যর্থতায়ও প্রথমটা বিশ্বাস করে উঠতে পারলাম না।

অলকানন্দার ঝুলা পেরিয়ে আরও খানিকটা পথ হেঁটে বদরিকাশ্রমে ঢুকতেই বাম দিকে দেখি, না, ষাঁড়-শার্দুলে এক সঙ্গে খেলা করছে না, একটি পাকা ডাকঘর। তার-যোগে পৌঁছসংবাদ পাঠাবার জন্যে সেখানে যাত্রীদের ভিড়। তার পরে আরও ভিতরে শুদ্ধ-বিশুদ্ধ শিলাজিৎ ও মুদ্রিত আলোকচিত্রের সারি সারি দোকান। মাঝে মাঝে জুতো এবং মিষ্টির দোকান ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। পথে যাত্রীদের ভীড়, দোকানে দোকানে দরাদরি, প্রথমটায় কেমন যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। কী পেয়েছি আর কী পাইনি, কোন্ আশা ব্যর্থ হয়েছে, কিছুই খেয়াল রইল না।

অবশেষে মন্দির-দ্বারে গিয়ে দাঁড়ালাম; এবং চট করে ঘটনাটা বিশ্বাস হল না। গলা টান করে মাথা উঁচু করে যখন দেখলাম যে শীর্ষে সত্যেই একটা চূড়ো মত আছে তখন কথঞ্চিৎ নিশ্চিত হওয়া গেল। কিন্তু সেই মন্দির সুন্দর না কুৎসিত তা আজও সঠিক জানি না। ডাইনে বামে মন্দিরের একেবারে গায়ে গায়ে বসত-বাড়ি উঠেছে, পশ্চাতে হিমালয়ের প্রাচীর। সামনে শুধু চার ফুটের একটু রাস্তা। অথচ মন্দির দর্শনের পক্ষে ওই সামান্য পরিসরটুকু মোটেই যথেষ্ট নয়। বদরিকাশ্রমেও নারায়ণের এমন গৃহসমস্যা দেখে মন কিঞ্চিৎ বিষণ্ন হল।

অকস্মাৎ স্মরণ হ'ল—বিদ্যুৎ কশার মতো—যে বদরিনাথই আমাদের যাত্রাপথের শেষ-তীর্থ। এর পরে আর অধীর আগ্রহে প্রত্যাশা করবার মতো কোন নিশ্চিত ভবিষ্যৎ থাকবে না, থাকবে কেবল অতীতের গৌরব কিম্বা গ্লানি, জয় অথবা পরাজয়। এর পরে আর কোন লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে

অগ্রসর হওয়া নয়, চূড়ান্তরূপে পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে নিজের ঝুলি কাঁধে ফেলে অতঃপর এইখান থেকেই প্রত্যাবর্তন। আপন উদ্‌গ্রীবতায় আপনিই কেমন বিমূঢ় বোধ করলাম। কোন *বিশল্যকরণী প্রত্যাশা* করবার যেন সামান্যতম যুক্তি ছিল না, যেন সুদূরতম সম্ভাবনা ছিল না কোন সমস্যা সমাধানের। উদ্‌গ্রীবতার পুরোটাই ছিল যেন বিশুদ্ধ বাতুলতা। অবিমিশ্র স্ববারি। অবশেষে অমন মর্মান্তিক হতাশা গোপন করতে গিয়েও সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়লাম!

এই হতাশার ধরণটাই কিঞ্চিৎ বিদ্‌ঘুটে। কেননা জীবনটাকে সমস্যা কণ্টকিত বলে স্বীকার করে নির্দয় হবার, এমন কি বিমর্ষ হবার অধিকার আমার আছে। অথচ ধর্ম বা ঐতিহ্যের নিকট থেকে কোন প্রকার সান্ত্বনা গ্রহণ করা এমন কি প্রত্যাশা করা বিধিবহির্ভূত। অনুচ্চারিত কিন্তু অলঙ্ঘনীয় অনুশাসনটি হচ্ছে সমস্যাগুলোকে ক্রমে ক্রমে সমাধানহীন জেনে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত অপরাপর সমাধানে নিজেকে বিভ্রান্ত করে রেখে অবশেষে সফলভাবে প্রস্তরীভূত হয়ে যাওয়া! খেলিয়ে খেলিয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেকে পোষ মানানো। তারপরেই অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা, অথবা মুষ্টিযুদ্ধ প্রদর্শনীর সভাপতিত্ব, কিম্বা নিদেন পক্ষে নোবেল পুরস্কার! অত্যন্ত সহজ পথ, প্রতিটি বাঁকে দ্ব্যর্থহীন রেখায় তীর চিহ্নিত নিশানা আছে।

কিন্তু নাস্তিক হিন্দু—সমস্যা বিক্ষুব্ধ সংশয় কণ্টকিত সভ্য হিন্দু—সে-এক বিচিত্র ধরণের জীব। 'কম্‌পারেটিভ রিলিজিয়ন'-এর ছাত্ররা বলে থাকেন যে হিন্দু ধর্মকে কোনক্রমেই যথাযথভাবে সংজ্ঞাবদ্ধ করা যায় না। এ কথার সত্যাসত্য তাঁদেরই জানবার কথা। কিন্তু কোন হিন্দুকে, এমন কি আত্ম-বিস্মৃত হিন্দুকে চূড়ান্তরূপে একটি যুক্তি-সূত্রে বেঁধে ফেলা সত্যিই শক্ত। প্রায় অসম্ভব। এই ধর্ম যেন ঠিক বিশ্বাস-নির্ভর নয়। এ-যেন জন্মান্তরের একটি সংস্কার—শতধারে শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত—শত প্রক্ষালনেও যার ক্ষয় নেই। হিন্দু ব্রাহ্ম হলেও বারবেলা মানে, কলমা পড়লেও মানত করে, ক্রিশ্চিয়ান হলেও অসহিষ্ণু হয় না। তার সমস্ত হতাশার অন্তরালে একটা অন্তর্নিহিত আশ্বাস অবিরত জাগরূক থাকে।—নেতি নেতি বলে যতদূরই অগ্রসর হই না কেন এইটুকু নিশ্চিত-রূপে জানি যে শেষ পর্যন্ত নাগালের বাইরে গিয়ে পড়বার কোন আশঙ্কাই নেই। অধমর্ণ চার্বাকও শেষ পর্যন্ত মুনি বলে স্বীকৃত হবেন!

কিছুদিন আগে পর্যন্তও সজ্ঞান চেতনার অন্তরালে—'অবচেতন' তো প্রশ্নাতীত স্বতঃসিদ্ধ!—কিন্তু অপর কোন সত্তায় বিশ্বাস করা নিতান্তই নিম্নশ্রেণীর কুসংস্কার বলে জানতাম। এমন কি এই পথে রওয়ানা হবার সময়তেও একটা অভিনব অবসর বিনোদনের প্রলোভনেই নিজেকে প্রলুব্ধ করেছিলাম। তদতিরিক্ত কোন উদ্দেশ্যের নাম-গন্ধও তখন ত্রিসীমার মধ্যে ছিল না। কিন্তু এই অজ্ঞতার পুরোটাই ছিল নিজের কাছে মুখ রক্ষা করবার জন্যে স্থূল বুদ্ধির স্থূলতর চাতুরি! কেন না পথ চলতে চলতে অবশেষে একদিন অনস্বীকার্যরূপে আবিষ্কার করতে হয়েছিল যে চূড়ান্ত একটা আশ্বাস আমার আছে বলেই সংশয়বাদের মতো বিষাক্ত সাপ নিয়ে অমন অবলীলাক্রমে খেলা দেখাবার এমন উৎকট দুঃসাহসিকতা! কেদারনাথের প্রবঞ্চনা সত্ত্বেও অন্তরের সেই আশ্বাস কণামাত্র ক্ষীণ হয় নি। আশ্বাসটি এমনই সন্দেহাতীত যে তার পরেও ছোট খাটো অজস্র সুযোগ স্বেচ্ছায় উপেক্ষা করে গেছি। হাতের পাঁচ তো আছেই, শেষ পর্যন্ত সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে,—একবার কেবল বদরিকাশ্রমে পৌঁছবার অপেক্ষা! কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতো সাধের বদরিকাশ্রমে পৌঁছেও যখন স্বয়ং নারায়ণের মন্দিরটিই খুঁজে বের করতে হল, চূড়ো দেখে যাচাই করে তবে নিশ্চিত হতে হল—তখন সামান্য হতাশ না হয়ে পারলাম না। হতাশাটুকু গোপন করতে গিয়ে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম!

দূরে ও নিকটে অজস্র তুষার শিখর ঝক্‌ঝক্ করতে থাকল। যাত্রীরা আসছে যাচ্ছে, অলকানন্দা বয়ে চলেছে সকল্লোলে,—আকাশ অন্তরীক্ষ ব্যেপে একটা বিচিত্র নিরুদ্বিগ্নতা, একটা অবিশ্বাস্য নিরুৎকণ্ঠা। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল যেন বহুদূর থেকে বদরিকাশ্রমের দিকে তাকিয়ে আছি নির্নিমেষ চোখে। সব কিছু ঠিক নেশাগ্রস্ত নয়, যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আছে। হতাশাবোধের আত্মম্ভরিতাটুকু আস্ফালন অনুযায়ী যথেষ্ট প্রকট হবার আগেই কার অঙ্গুলি হেলনে যেন কর্পূরের মতো উবে গেল। কোন কালে কিছু আশা করেছিলাম বলেই আর স্মরণ রইল না। বদরিকাশ্রমে পৌঁছে নারায়ণের মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

ইতিমধ্যে মন্দিরাভ্যন্তর থেকে সুমধুর ভজন সঙ্গীত ভেসে আসছিল। বেশ সুরেলা কণ্ঠ। কখনও একক, কখনও দ্বৈত, কখনও সমবেত।

সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলাম। কিন্তু মূল মন্দির তখন বন্ধ হয়ে গেছে। ঘুরে ফিরে দেখবার মত কিছু না পেয়ে যেখানে ভজন হচ্ছিল সেখানে গিয়ে বসলাম। নাতি-প্রশস্ত ঘর, এক দিক সম্পূর্ণ খোলা। অদূরে শুভ্র তুষারক্ষেত্র, অলকানন্দার তীব্র মধুর প্রবাহ, যাত্রীদের ধীর মন্থর চলাচল—বহির্জগতের সমস্ত কিছুই অন্দর থেকে চোখে পড়ে। হারমোনিয়াম ও খঞ্জনী সংযোগে দুই জন সাধুদর্শন যুবা ভজন গাইছেন; অপর একজন বিরলশ্মশ্রু বিবস্ত্রদেহ কালোপানা বালক তবলা সঙ্গত করছে। ভজনের পদ বলতে কিছুই নেই, শুধু নারায়ণ আর নারায়ণ। মাঝে মাঝে কেবল আস্থায়ীতে বদরি শব্দটি উচ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু ওই কথা কয়টিই বিভিন্ন সুরে বিভিন্ন ছন্দে বিভিন্ন তালে, দ্রুত এবং বিলম্বিতে, আলাপে এবং বিস্তারে কক্ষটি শুধু নয়, শুধু সমবেত শ্রোতাদের দেহমনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষগুলোই নয়, বাইরের ওই বিশাল পরিধি পর্যন্ত যেন মৌ মৌ করে তুলছে। স্থির হয়ে বসে গান শুনতে শুনতে অল্প ক্ষণের মধ্যেই মনে হল, মাথার ভিতরটা কেমন যেন আবছা হয়ে আসছে, অনুভূতির তীক্ষ্ণ প্রান্ত ক্রমে যেন কোমল সুডোল হয়ে উঠছে। অবশেষে সংজ্ঞাটুকুও হারাবার পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎ মনে পড়ল যে, বদরিকাশ্রমে এসে পর্যন্ত এক গেলাস চা-ও পান করা হয় নি এবং একটি সিগারেটও নয়। তখন আশঙ্কা হল এই বিদেহীভাবের আসল কারণ হয়তো ওই অভ্যাসের ব্যতিক্রমেই নিহিত। এ কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে মনটা বিষিয়ে উঠল। তখন আবার ভজন-সভা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

একান্তই নিরীহ নির্দোষ, এবং সমর্থিত না হলেও সর্বত্রই অনুমোদিত বিলাস,—চা ও সিগারেট! কিন্তু এই নগণ্য চা ও অকিঞ্চিৎকর সিগারেটের অজুহাত না থাকলে এতদিনে হয়তো নিজের পথ স্বচ্ছন্দে চিহ্নিত করতে পারতাম, অনুসরণ করতে পারতাম। কিন্তু এ-ও হয়তো আজকের নাগরিক চেতনার চতুর অনুশোচনা, গূঢ়তর কোন দুর্বলতা অক্ষমতা বা অপূর্ণতা থেকে দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত রাখবার স্থূল কৌশল। তবে এই অনুশোচনা যেমন আজকের তেমনি এই পশ্চাৎচিন্তাও আজকেরই ব্যাধি!—বদ্রিনাথে কিন্তু সেদিন সচ্ছন্দে নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলেছি। উচ্চতার কারণেই হোক—অথবা গভীরতর কোন কারণে—বদ্রিনাথ স্থানটাই কেমন যেন খোলামেলা!

বাইরে এসেও কানের মধ্যে, হয়তো মনের মধ্যেও, ভজনের ওই সুরটা বারে বারেই বাজতে থাকল। চায়ের দোকানে বসেও। চায়ের নির্দেশ দিয়েও। দু-চার জনের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হবার পরেও দেখি, সুরটা মোটেই চাপা পড়ে নি। বরং যেন ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। অবশেষে আবারও পরাজয় স্বীকার করতে হল। সম্মুখ-সমরে এঁটে উঠবার সম্ভাবনা নেই বুঝে অভ্যস্ত কুটিলতায় চেতনার মোড়ই আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে দিতে হল। চায়ের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে তখন বাইরের দিকে চেয়ে পথের যাত্রীদের গতায়াত দেখতে লাগলাম। আয়াসমুক্ত নিবিষ্টতায় দেখতে সক্ষম হলাম !

কেদারনাথ ও কেদারনাথের পথে বা তুঙ্গনাথের চড়াই-উতরাইতে যাত্রী-সাধারণের ক্ষত-বিক্ষত ক্লান্ত পদক্ষেপ দেখে ভারতীয় চরিত্রের সহজ পাঠ গ্রহণ করবার যে অবকাশ আছে বদরিকাশ্রমে সেই সুযোগ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। যাত্রীদের সবাই দীন-দরিদ্র উৎসর্গীকৃত তো নয়ই বরং অধিকাংশই অসমর্পিত ও আপন আপন বাতুলতার ঔদ্ধত্যে অন্ধ। পথ অনেক কম ক্লেশকর বলে বদরিকাশ্রমে ধনী অভিজাত সম্বরদের সমাগম বেশী। এঁদের চলনের চাপল্য, স্যুটের ভাঁজ, হাতের ছড়ি এবং উন্নাসিক অবয়ব দেখে মনে হয় যেন পিতার জমীদারী তদারক করতেই আগমন। এঁদের সঙ্গের মেয়েরা আবার এককাঠি বাড়া। সেই এনামেল-করা মুখ, রঙবেরঙের শাড়িসালোয়ার এমন কি স্ল্যাক্স্, তার উপর চটুল ভঙ্গুর চলন—যেন তীর্থে নয় পিকনিকে এসেছে। দোকানপাটেও এদের ভীড়, রাস্তায়ও। এরা এদের অমার্জিত উচ্ছলতায় বদরিকাশ্রমের উদার স্নিগ্ধতা আবৃত করে ফেলেছে, এদের দাপটে সত্যিকারের যাত্রীদের এখানে নাগাল পাওয়া শক্ত।

বাইরে থেকে অন্দরে দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলাম। মনের মধ্যে তখনও সেই সুরটা বাজছে ! চোখের সামনে সেই তিন জন গায়কের চেহারা ভেসে উঠল। তিন জনেরই বয়স অত্যন্ত কম, কুড়ি একুশের বেশি কারও হবে না। তিন জনই সুদর্শন ; তীক্ষ্ণ নাসা, সরু চিবুক, টানা টানা চোখ, পাতলা ঠোঁট, প্রশস্ত ললাট। একজনের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, অপর দুজন গৌর। তিন জনেরই মাথায় অযত্নবর্ধিত বাবড়ি চুল, মুখে গোঁফের আভাস ; তিন জনেরই অবয়বে অবিশ্বাস্য বুদ্ধির দীপ্তি। একবার দেখলেই বোঝা

যায় যে, অমন চেহারা অভিজাত বংশে না জন্মালে সম্ভব হয় না। ভাবতে ভাবতে খেই হারিয়ে ফেললাম। ওরা কারা? কোথা থেকে এসেছে? কেন এসেছে? কেন ওইখানে অমন দীন বসনে অত উৎসাহে অবিরাম ভজন গেয়ে চলেছে? ওদের মুখে হাসির রেখাটুকু লেগেই আছে কেন? চোখেই বা অত দীপ্তি কিসের? যে জীবন ওরা পিছনে ফেলে এসেছে সেই জীবন যে কত বিষাক্ত তা কি ওরা জানে? জানে কি, যে-জীবনে ওরা প্রত্যাশী সেই জীবন মিষ্ট কি তিক্ত? ঈশ্বর কে, এই প্রশ্নের কি ওরা কখনও সম্মুখীন হয়েছে? ঈশ্বরের প্রয়োজন কি অনুভব করেছে কখনও? কতটুকু করেই বা বয়স এক এক জনের! অভিজ্ঞতার পরিসর কতটুকু! কোন আঘাতের ক্ষীণতম ক্ষতচিহ্নও নেই কারো দৃষ্টিতে। তবে কেন এমন সোল্লাস উৎসাহে এরা আত্মীয়-পরিজন সব পিছনে ছেড়ে এসেছে? কিম্বা হয়তো পিছনে ছেড়ে আসবার কিছু নেই—কেবল সামনে এগিয়ে আয়ত্তাধীন করা! একের পর এক প্রশ্নে ক্রমে কেবল বিভ্রান্ত বোধ করলাম। কানে কিন্তু সেই ভজন গান বাজতে থাকল। তখনও তেমনি নিখুঁত সুরে।

নীলমণি এসে ডাকতে চৈতন্য হল। পাণ্ডার কাছ থেকে ঘর নেয়া হয়েছে, ঘরে বিছানা পাতা হয়েছে। স্থির হয়েছে আজ আর রান্না না করে দোকানেই দ্বিপ্রাহরিক আহার সারা হবে—অতএব এইবার গাত্রোত্থান করে স্নানের জোগাড় দেখে অনুগৃহীত করলে হয়। অবশ্যই অবশ্যই, অপ্রস্তুত হয়ে আমি উঠে পড়লাম। কিন্তু চায়ের দাম দিতে গিয়ে দেখি পকেটে একটিও পয়সা নেই, টাকা সব পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মত থলতেয় কোমরে বাঁধা। নীলমণিও জামা-কাপড় ছেড়ে তেল মাখতে মাখতে আমায় ডাকতে এসেছে। অগত্যা সরম সঙ্কোচ ত্যাগ করে কামিজ তুলে থলে বের করলাম। ব্যাপার দেখে গাড়োয়ালী চা-ওয়ালার চক্ষু ছানাবড়া। আমতা আমতা করে বুঝিয়ে বলতে হল যে, বিদেশ-বিভূঁয়ে এসেছি, যদি খোয়া যায় তো প্রাণে মারা পড়তে হবে, তাই এ সাবধানতা। ব্যাখ্যা শুনে চা-ওয়ালা মূর্ছা যায় আর কি! খোয়া যাবে না টাকা আপনার, সে টাকা কে নিতে যাবে? এ দেবভূমি, চোর ডাকাত এ-দেশে নেই মশাই! কথাটায় সামান্য পরিমাণ অতিশয়োক্তি ছিল, খুচরো পয়সা ফেরত নিয়ে চোরের মত তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম।

আস্তানায় ফিরে দেখি, তন্মধ্যে অন্য সকলেরই স্নান হয়ে গেছে। তাবাদার তাড়া খেয়ে আমি আর নীলমণিও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম উষ্ণকুণ্ডের উদ্দেশ্যে। কুণ্ডটি মন্দিরেরই সামনে খানিকটা নীচে—একেবারে অলকানন্দার বক্ষে। কুণ্ডের পাশেই নাতিপ্রশস্ত বাঁধানো একটু চত্বর, তার বামে কয়েক শো টনের বিশাল এক পর্বতপ্রমাণ প্রস্তর, নীচে প্রবহমানা কলোচ্ছ্বাসময়ী অলকানন্দা। কুণ্ডটি থেকে অবিরত উষ্ণ বাষ্প উঠছে। অনেকদিন পরে অনেকক্ষণ ধরে অবগাহন করা গেল।

অবগাহন করে গরম জল গায়ে ঠাণ্ডা হবার আগেই ছুটে ওপরের রৌদ্রালোকে এসে দাঁড়ালাম। আমি জামা-কাপড় পরে নিতে নীলমণি ওর জামা-কাপড় ছেড়ে গেল স্নান করতে। একটা সিগারেট ধরিয়ে রোদ পোয়াতে পোয়াতে তখন চতুর্দিকের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখতে লাগলাম। যেন নতুন দেশে এসেছি। নদী-পথ-প্রান্তর-পর্বত সব কিছু আপন সৌন্দর্য্যে ঝকমক করছে—হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ঘটা চতুর্দিকে। বদরিকাশ্রমের এই তো দিগন্তবিস্তৃত উজ্জ্বল প্রশান্তি! সম্মুখেই সমস্ত জিজ্ঞাসার চূড়ান্ত উত্তর আদিগন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে মুখর নৈঃশব্দ্যে। সে-উত্তরের পাঠোদ্ধার করবার বিদ্যা এবং সাধনা না-ই বা থাকল, তার সত্যতায় সংশয় প্রকাশ করবার ক্লীব ঔদ্ধত্যও তখন অবশিষ্ট ছিল না। বিস্ময়ে কিছুক্ষণ পর্যন্ত মূক হয়ে রইলাম।

সামনের বিশাল প্রস্তরটায় অলকানন্দার দিকের ঢালুতে বসে একজন রুক্ষকেশ ক্লিষ্টদেহ, পরণে জীর্ণ কটিবাস, অশিক্ষিত অমার্জিত চেহারার মধ্যবয়স্ক হিন্দুস্থানী একটা কটকটে হলদে-লাল-সবুজ-রঙের সস্তা মলাটের চটি বই অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে পড়ে চলেছে। পায়ের কাছেই অলকানন্দার উত্তাল ঢেউ। আমার বোধ হয় একটু বিস্মিত হওয়া উচিত ছিল, অভ্যাসমত বিনা প্রয়োজনেও জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল যে বইটা কী বই? কেদারবদরিকা পথপ্রদর্শিকা বা মোহমুদ্গর বা তোতা-মৈনা? শ্লেষভরে আপন মনে একটু হাসলেও হয়তো আদৌ অসঙ্গত হত না, কিন্তু বহিঃ-প্রকৃতির সঙ্গে লোকটি এমনই অবিচ্ছেদ্য ভাবে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল যে এসব কোন কথাই আমার মনে এল না। মনে পড়ল কেদারনাথের কথা! একটা সামান্য নগণ্য বিশেষত্ব বর্জিত প্রস্তরখণ্ড।—যুগাতিযুগ ধরে দূরাতিদূর থেকে যাত্রীদের টেনে আনছে নিজের কাছে। নির্বাক

নিশ্চল—অথচ ব্যঞ্জনাময়। সে চেতনারোপ আমাদের যুক্তির জোরে ঘটেনি, ঘটেছে এদেরই বিশ্বাসের বলিষ্ঠতায় একাগ্রতায়। এরা হয়তো জানে না এরা কী করছে, কিন্তু তা নিশ্চয়ই অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে পারে। এরা হয়তো কথা দিয়ে বুঝিয়ে বলতে পারে না এরা কী চায়, কিন্তু তবু অন্য কিছু চাইবার কথা এদের মনেও হবে না কোনদিন। কোন নির্ভরই এদের নেই, তবু এরা কি নিশ্চিন্ত! এদের শ্লেষ করা সহজ, করুণা করা সহজতর। কিন্তু এরাই সেই ঐতিহ্যের অন্ধ বাহক ও অজ্ঞ ধারক—যে ঐতিহ্যের গরিমায় হীনমন্যতা সত্ত্বেও আমরা পাশ্চাত্ত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস পাই। এরা না থাকলে সে ঐতিহ্যের ধারা কবে শুকিয়ে যেত। না, এদের ঘৃণা করবার অধিকার আমাদের নেই; সভ্যতার আলোকে এদের টেনে আনবার মানবহিতৈষণাও অক্ষমনীয় ঔদ্ধত্য হবে।

স্নান সেরে ফিরবার পথেও ওই কথাই ভাবছিলাম। আমি তো জানি, যে সভ্য সামাজিক জীবন আমি যাপন করি সে জীবন কত বিষাক্ত কত বঞ্চিত। গ্যালভানীর তারস্পর্শে কিছুক্ষণ অর্থহীন হাত-পা ছুঁড়ে তারপর কুকুরের মত নির্জনে নিঃসঙ্গ মৃত্যু। সে জীবনে কোন আনন্দ নেই, সে মৃত্যুতে সব শেষ। কিছুক্ষণ এ-দোরে ও-দোরে উদভ্রান্তের মত কড়া নেড়ে রাস্তার উপর মুখ থুবড়ে পড়া—কী অর্থ হয় এমন উন্মত্ত অশ্বের পিছনে সমস্ত জীবন ধরে ছোটবার? যা আকণ্ঠ পান করলেও আকণ্ঠ তৃষ্ণা থেকে যায় তারই একটু ছিটেফোঁটা পাবার জন্যে অত অপমান সহ্য করবারই বা কি যুক্তি? এই জীবনকে সংস্কার করবার চেষ্টা বাতুলতা, সুন্দর করার চেষ্টাও প্রতিবার ব্যর্থ হয়েছে। আর অপর দিকে এই অন্যতর জীবন, এই দ্বিতীয় দিগন্ত। প্রকৃতির অঞ্চলে সহজ সরল সুন্দর জীবন, কোন কুটিলতা নেই জটিলতা নেই, ঈর্ষা নেই দ্বেষ নেই। অজ্ঞেয়কে জানবার ব্যর্থ চেষ্টার পর নিজের সঙ্গে কোন গ্লানিকর বিবাদ নেই। এক অব্যয়, অপরা বিভক্তি। সর্বাংশে আমার মত, এমন কি আমার চাইতেও হীন কত লোক প্রকাশ্যে সে জীবন উপভোগ করছে। সে জীবন আজ আমারও হাতের নাগালে। নেব না?

কেমন যেন নেশা ধরে গিয়েছিল। এক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসতে পারছিলাম না। দ্বিপ্রাহরিক আহারের পর আধ ঘণ্টাটাক বিশ্রামের

নামে ছটফট করে আবার উঠে পড়লাম। আবার কিছুক্ষণ উদাসভাবে পথের আর্দ্র রৌদ্রে ঘুরে বেড়ালাম। আবার মন্দিরে গেলাম। আবার বসে কিছুক্ষণ ভজন শুনলাম। সেই পদ সেই গৎ সেই মূর্ছনা। কিছুক্ষণ পরে আবার বিমনা হয়ে সামান্য কি একটা অজুহাতে উঠে চলে এলাম। যাত্রীদের অধিকাংশই এখন বিশ্রামনিরত, পথও কথঞ্চিৎ জনবিরল। একটা চায়ের দোকানে প্রবেশ করলাম। চেয়ার টেনে বসতে দেখি, দোকানের এক কোণে সেই গৈরিক গায়ক বসে আছেন—লামবগড় চটিতে যিনি শালগ্রামশিলাকে অহিফেন দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। আমার কাছ থেকে কোন প্রশ্রয় না পেয়ে নীলমণির মুখ এতক্ষণ বন্ধ ছিল, এবং এতক্ষণে ওর শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়ে এসে থাকবে। গৈরিক গায়ককে পেয়ে নীলমণি তাঁকে সাড়ম্বরে ধন্যবাদ জানাতে লাগল, তাঁর স্বার্থহীন সেবার জন্য। সহযাত্রীদের কাছ থেকে যদি প্রয়োজনমত সাহায্য না পাওয়া যায় তবে এত দূর তীর্থে আসা কোন্ সাহসে। কিন্তু এমন অযাচিত ধন্যবাদ পেয়েও তিনি আদৌ উৎফুল্ল হলেন না, এমন কি বিনয়বশত হাসলেন না পর্যন্ত একটু। যেমনি বসেছিলেন তেমনি বসে রইলেন—নির্বিকার এবং অচঞ্চল। একটু চিন্তামগ্ন কিন্তু সুদূর নন; অমায়িক না হলেও যেন অন্তরঙ্গ! অবশেষে অনির্দেশ্য কোথা থেকে বাম হাতের চেটোয় খানিকটা গাঁজা নিয়ে সেটুকুর পরিচর্যা করতে করতে গুনগুন স্বরে গান ধরলেন: ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব—। ঐ সঙ্গীত চলতে চলতেই গাঁজার ছোট কল্কে বেরুল, এক টুকরো বস্ত্রখণ্ড বেরুল। অতঃপর অকস্মাৎ কণ্ঠ সপ্তমে তুলে ত্বমেব সর্বং মম দেব দেব বলে শ্লোকটি শেষ করে গৈরিক গায়ক কল্কেতে টান দিলেন। ততক্ষণে আমার বিরক্তি ধরেছে,—ততটা গৈরিক গায়কের প্রতি নয় যতটা যাবতীয় সব কিছুর অসমঞ্জস অর্থহীনতায়, অর্থহীন অবোধ্যতায়। এমন কি অসহায় বোধ করা কতটুকু সহায়ক হবে তাও যেন স্থির করে উঠতে পারলাম না! বোকার মতো বাইরের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে সামান্যতম প্রয়াস ব্যতিরেকেই আবার আস্তে আস্তে সব কিছুর চেহারা পাল্টে যেতে লাগল। হয়তো সমুদ্রবক্ষ থেকে উচ্চতাই এমন অঘটনের কারণ, হয়তো বায়ুর অনভ্যস্ত পর্যাপ্ততা—কিম্বা অন্যতর কিছু—আবার বিশ্ব-সংসারের প্রতিটি খুঁটিনাটি অত্যন্ত পরিপাটিরূপে

সাজানো বলে মনে হল। আবারও যে নিজের সঙ্গে লুকোচুরি খেলছি সে কথা জানতে পেরেও এবার আর কণামাত্র বিষণ্ণ হলাম না।

গাঁজার কল্কেটি নিঃশেষিত করে গৈরিক গায়ক নীমিলিত চোখে আবার শ্লোক উচ্চারণ করছিলেন। দীর্ঘ রাগিনীর শেষে যেন ক্লান্ত বীণা, স্তব্ধ হয়েও সুর শিকিরিত করে চলেছে। অবশেষে হঠাৎ শ্লোক বন্ধ করে চোখ খুলে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে হিন্দীতে বললেন, যেন পরবর্তী উক্তির সঙ্গে পূর্ববর্তী ধ্যানমগ্নতার কার্য-কারণ সম্পর্ক!—অতো কী ভাবছ?—চিন্তা দিয়ে তো মুক্তি পাওয়া যায় না! মুক্তি পাবার আগে জানতে হবে বন্ধন কী—সংসারে ধরা না দিলে তা জানতে পারবে না কোনকালে। বন্ধন কী তা জানো, তা ছেদন করো—মুক্তির সন্ধান পেয়ে যাবে। ছেলেমানুষের মতো মুক্তি মুক্তি বলে কান্নাকাটি করলেই কি আর মা আঁচল থেকে মুক্তি বের করে দেবেন!—গৈরিক গায়ক মৃদু মৃদু হাসতে থাকলেন।

যতই বিমুগ্ধ থেকে থাকি না কেন অমন আকস্মিক সুসমাচারের জন্য আমি তখন আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। এমন কি কথাগুলোকে সম্পূর্ণরূপে গঞ্জিকার প্রভাবমুক্ত নয় বলেও ঘোরতর সন্দেহ হল। কিন্তু তবু কথাগুলোর সময়োচিত প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করবার চিন্তাও মাথায় এল না। শুনতে থাকলাম, যেন চুপ করে শুনবারই নির্দেশ ছিল।

গৈরিক গায়ক আবার বললেন, মানুষ হয়ে জন্মানো তো আর কুকুর হয়ে জন্মানো নয়, যে মালিকের দরজায় বসে থাকলেই জীবন সার্থক হবে! মানুষরূপে জন্মাবার দায়িত্ব গ্রহণ করলে সে দায়িত্ব পালন করতেই হয়।—ভিখারী হলেও রেহাই নেই আমীর হলেও রেহাই নেই। জীবনের উধার সবাইকে কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিতে হবে। মুক্তির দুয়ার তো খোলাই আছে, মূল্যটুকু দিলেই প্রবেশের অধিকার! দরজা তো চতুর্দিক থেকেই খোলা—যেদিক দিয়ে খুশী প্রবেশ করতে পার। কিন্তু শত চিন্তা করলেও মূল্য না দিয়ে, ফাঁকি দিয়ে কোন প্রকারেই ঢুকতে পারবে না।

কথাগুলোর অসংলগ্নতায় সেদিন কিন্তু বিন্দুমাত্র অস্বস্তি বোধ করিনি। শুনতে শুনতে এমন কি শুনতে পর্যন্ত ভুলে গেছি। এঁর কণ্ঠের স্বরটাই ছিল ওরকম,—যখন কথা বলেন তখনও যেন গানই করেন। কথাগুলো যেন ততটা অর্থবহ নয় যতটা মূর্ছনাময়। তাই কথা বলতে বলতে তিনি

যখন আবার এক ছিলিম গঞ্জিকার গৌরচন্দ্রিকা স্বরূপ গুনগুন করে সুর ধরলেন, ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব, ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব,—তখন অনায়াসে তা-ই শুনতে থাকলাম। একবারও মনে হল না যে প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হয়েছে!

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকবার পর নীলমণি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, কেমন লাগছে?

কিছু না ভেবে মুহূর্তমধ্যে জবাব দিলাম, বলে বোঝাতে পারব না।

এত ভাল?

তার চাইতেও ভাল।

সে কি মশাই, থেকে যাবার ইচ্ছে নাকি?

ইচ্ছে থাকলেও তা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা কই! কথাটা বলেই আমিও চমকে উঠেছিলাম। নীলমণিও বিস্মিত হয়ে থাকবে। কিন্তু আমাদের কথা আর এগুবার আগেই হা হা করে পরিতুষ্ট হাবার মত হাসতে হাসতে স্বয়ং শালগ্রামশিলা এসে চায়ের দোকানে প্রবেশ করলেন।

হে হে, এই যে দাদা আপনি এখানে বসে আছেন। আর দাদাকে খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান। হে হে!

গৈরিক গায়ক যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, হঠাৎ চোখ খুলে অত্যন্ত স্পষ্ট এবং তার চাইতেও বেশি সহজ এবং সপ্রতিভ কণ্ঠে বললেন, আমিও আপনাকে খুঁজছিলাম।

আমাকে খুঁজছিলেন, সে কি কথা দাদা! বলুন কেন, বলুন দাদা কেন এই অধমকে খুঁজছিলেন?

না এমনি। শুধু জিজ্ঞেস করবার জন্যে যে কেমন আছেন।

শালগ্রামশিলা এইবার মহা পরিতৃপ্তি সহকারে ভুঁড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বিনয়ে গলে পড়ে বললেন, সে কথা আর বলতে দাদা, আপনার আশীর্বাদে খাসা আছি।

ক্ষুধা হচ্ছে?

রাক্ষুসে ক্ষুধা।

দুপুরে একটু ঘুমিয়েছিলেন?

কুম্ভকর্ণের মত।

চলতে ফিরতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না?

একটুও না, একটুও না।

বেশ। আর একটু চাই?

শালগ্রামশিলার চোখ চকচক করে উঠল, গলায় কথা আটকে গেল। কোনক্রমে শুধু উচ্চারণ করলেন, কী?

কেন, সেই জিনিস!

তা, তা যদি অনুগ্রহ করেন। চাইবার তো আর মুখ নেই, যদি দয়া করে একটু দেন, তবে—

এই যে আসুন। একেবারে খাঁটি জিনিস, নিজের হাতের তৈরী। কথা কয়টি বলে তিনি বেশ বড়মত একটা ডিবে বের করলেন। তার থেকে কালো রঙের একটা গোল্লা, গুলি নয় প্রায় লাড্ডু, নিজের মুখে ফেলে টিনটা শালগ্রামশিলার দিকে এগিয়ে ধরলেন।

ব্যাপার দেখে শালগ্রামশিলা মূর্ছা যান আর কি। হাবার মত বড় বড় চোখ করে চেয়ে রইলেন; যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না।

আপনি, অতটা আপনি হজম করতে পারবেন?

পারব না মানে? বিষ তো নয়, চূরণ। আর তাই বা এমন কী বেশী খেয়েছি।

চূরণ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, চূরণ। কাল রাত্রিতে আপনি যা খেয়েছেন তাই। অত ভয় পাচ্ছেন কেন?

অ্যাঁ, চূরণ! কাল রাত্তিরে কি আপনি আমাকে চূরণ দিয়েছিলেন, আফিম নয়? কিন্তু…কিন্তু…। বাক্য শেষ হবার আগেই শালগ্রামশিলা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চললেন। কাল রাত্রির চাইতেও এ কান্না আরও অনেক বেশী অসহায়। একেবারে সান্ত্বনার অতীত। গৈরিক সাধক কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। মৃদু কণ্ঠে আবার ত্বমেব বিদ্যা দ্রবীনং ত্বমেব—গাইতে গাইতে নিজের লোটা কম্বল সামলে নিয়ে নির্বিকার পদক্ষেপে বাইরে চলে গেলেন। যেন কোনকালে কাউকে কণামাত্র আঘাত দেননি, পায়ের তলায় একটা মৃতদেহও নিষ্পেষিত হচ্ছে না! আমি আর নীলমণি হতচেতন হয়ে বসে রইলাম।

অবশেষে অবস্থা সহ্যের সীমা অতিক্রম করল। হতভাগ্য শালগ্রামশিলার দিকে এগিয়ে নীলমণি তখন বলল, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন আর কেঁদে কী হবে বলুন। মন্দিরে যান, মন্দিরে গিয়ে একটু ভজন শুনুন, মন পরিষ্কার হয়ে যাবে।

না দাদা, না। আমার আর মন পরিষ্কার করে দরকার নেই। হায় হায় হায় হায়, এত অসৎও মানুষ হয়! এমন দেবস্থানে এসেও মিথ্যাচার ছাড়তে পারে না! আমরাও খারাপ, আমরাও মন্দ—কিন্তু তাতে তো অপরের কোন ক্ষতি হয় না। আর ও আমায় একেবারে পথে বসিয়ে গেল! মানুষের এমন সর্বনাশও করতে হয়? আবার শালগ্রামশিলা কাঁদতে শুরু করলেন।

কিন্তু ওই ভদ্রলোক আপনার সর্বনাশ কোথায় করলেন? এই তো একটু আগে বলছিলেন ক্ষুধা হয়েছে। তা সবই যদি ঠিক মত চলেছে তবে আবার উনি আপনাকে পথে বসালেন কোথায়? উনি বরং আপনার মঙ্গলই করেছেন, আপনার এতদিনের নেশা একদিনে কাটিয়ে দিয়েছেন। তাই নয়?

ভ্রূ কুঞ্চিত করে মুখ তুলে শালগ্রামশিলা এইবার সোজাসুজি নীলমণির চোখের দিকে চাইলেন। নীরব অশ্রুতে ওঁর গাল ভেসে যেতে লাগল। তারপর হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে বার বার হাসবার চেষ্টা করে আবার কেঁদে ফেলে বললেন, তাই তো, আমার ত্রিশ বছরের নেশা—কিন্তু কই, একটুও তো অসুবিধে হয় নি! তবে কি—তাই তো, তাই তো! যে দাসত্ব থেকে কোনদিন মুক্তির সম্ভাবনা নেই জেনে দাসত্বকেই বাহাদুরী ভেবে নিজেকে ভোলাচ্ছিলাম, সেই দাসত্ব আজ কেটে গেল! তাই তো তাই তো! এত বড় সৌভাগ্যে তো বিশ্বাস হয় না! পিতৃপুরুষের কোন পুণ্যে অধমকে আজ এত কৃপা করলে নারায়ণ! নারায়ণ নারায়ণ! আপন মনে বিড়বিড় করতে করতে শালগ্রামশিলা মন্দিরের দিকে নিরুদ্দিষ্ট হলেন। আমি আর নীলমণি যুগপৎ অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে আরও দু গেলাস চায়ের নির্দেশ দিলাম। তার পরই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলাম।

বিকেলের দিকে সদলবলে ব্রহ্মকপাল যাওয়া হল। মন্দির ছাড়িয়ে আরও একটু এগিয়ে অলকানন্দার উপর সামান্য খানিকটা বাঁধানো জায়গা। পর্বতের দিকটাতে দুটো ছোট ছোট ঘর আছে পিণ্ড রাঁধবার জন্য। প্রেতলোকে এই স্থানটির গুরুত্ব গয়ার চাইতেও বেশী। কিন্তু গ্রাম্য শ্মশানেও যে নির্জন বৈরাগ্য আছে এখানে তা অনুপস্থিত। হয়তো বাহুল্য বিধায়!

চাতালের এক কোণে মাটির তলা থেকে দুটো নাতিবৃহৎ প্রস্তরের কতকাংশ উঠে আছে। প্রস্তর দুটো স্থাপিত বলে মনে হয় না, সম্ভবত স্বয়ম্ভূ। ওই প্রস্তরদ্বয়েরই নাম ব্রহ্মকপাল। ব্রহ্মের শারীরিক গঠন সম্পর্কে কোন ধারণাই আমার নেই, কিন্তু ওই যদি হয় ব্রহ্মকপাল তবে মানুষের সঙ্গে তার জ্ঞাতিত্ব অল্প হতে বাধ্য। বস্তুত বিশেষ কোন আকারই নেই পাথর দুটোর—না সুন্দর, না কুৎসিত, না কর্কশ, না কোমল, না গোল, না লম্বা পাথর দুটো সর্বাংশেই বৈশিষ্ট্যবর্জিত, কিন্তু তবু অবিস্মরণীয়। বিকেলের পড়ন্ত রোদের বিলম্বিত ছায়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এমন একটা নৈর্ব্যক্তিক সমন্বয়মূলক সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে, যা দেখলে হেনরি মোর ঈর্ষান্বিত হতে পারতেন। এমন বিদগ্ধ সৌন্দর্য সজ্ঞান চেতনায় সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কোন অলৌকিক প্রেরণায় এমন সৌন্দর্য কল্পনায় ধারণ করা সম্ভব? অথচ তা-ও কতযুগ আগেকার—কোন বিস্মৃত অতীতের কথা! পলকহীন দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ বিস্মিত হয়ে রইলাম। অলকানন্দা কলোচ্ছ্বাসে বয়ে চলল। তুষারশিখর আরক্তিম হয়ে ক্রমে ভস্মাবৃত হল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নেমে এল।

তখন সবাই মন্দিরে গেলাম আরতি দেখতে। কুঞ্চিত কেশ, গৌরবর্ণ, মার্জিত চেহারা, কৃশ দেহী, পরণে চকোলেট রঙের আজানুলম্বিত জোব্বা, হাতে স্বর্ণবলয়, কণ্ঠে স্বর্ণমালিকা দক্ষিণী ব্রাহ্মণ পুরোহিত রাওল বিভিন্ন প্রদীপ নিয়ে আরতি করলেন অনেকক্ষণ ধরে। পুরোহিত বয়সে যুবা, চেহারায়ও কেমন ভোগের চিহ্ন। নারায়ণও সজ্জার আড়ালে সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেছেন। আরতি শেষ হতে না হতেই মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি উঠল, ঝনাত ঝনাত প্রণামীর বৃষ্টি ঝরল। ত্রিযুগী ও কেদারনাথের আরতিতে যে রিক্ত গাম্ভীর্য প্রত্যক্ষ করেছিলাম, এখানে তার পরিবর্তে একটি সাড়ম্বর অনুষ্ঠান। ক্ষুব্ধ চিত্ত নিয়েই তখন মন্দির ত্যাগ করে চত্বরের ভজন-সভায় এসে বসলাম।

ভজন-সভায় ইতিমধ্যে সমস্ত বদরিকাশ্রম এসে জড় হয়েছে। মেদপর্বত শালগ্রামশিলা একধারে বসে চক্ষু মুদে ঢুলছেন। শাকম্বরী মাতার স্থানে যে ভদ্রলোকের করুণ জীবন-কাহিনী শুনেছিলাম তিনি এক কোণে সন্ত্রস্ত হয়ে বসে আছেন। ভীড়ের মধ্যে দেখলাম, পথে ক্রন্দনরতা সেই দুই মাদ্রাজী নারীও পাশাপাশি বসে মহা ভক্তিভরে মাথা নেড়ে চলেছে। সোৎসাহে খঞ্জনী বাজাচ্ছেন সেই নাস্তিক সাধু। তখনও যথারীতি অনুষ্ঠান আরম্ভ হয় নি, সেই সুযোগে ভাববিগলিতকণ্ঠে কর্ণেল-পত্নী একটার পর একটা হিন্দী ও বাংলা ভজন গাইছেন। অদূরে মূর্তিমতী পবিত্রতার মত বসে আছেন কর্ণেল-কন্যা, স্থির প্রশান্ত।

একটু পরেই সাড়ম্বরে আনুষ্ঠানিক ভজন-সভা বসল। একজন জটাবল্কলধারী আজানুলম্বিত-শ্মশ্রু সন্ন্যাসী বীণাহস্তে মঞ্চের উপর এসে বসলেন। প্রশস্ত ললাট, তীক্ষ্ণ নাসা, কৃশ অনাবৃত দেহ, তামাটে বর্ণ, একাধারে সংযম ও প্রশান্তির প্রতিরূপ। দীর্ঘ টানা টানা চোখ দুটো কেবল অত্যধিক সজীব, প্রায় চঞ্চল। সে চোখে চিন্তার প্রতিধ্বনি আছে কিন্তু ক্লেদ নেই। বড় বড় চোখ তুলে তিনি একবার সমবেত শ্রোতাদের দেখলেন, তারপর চক্ষু নিমীলিত করে বীণা বাজিয়ে ভজন ধরলেন। পদ, সেই নারায়ণ, নারায়ণ, না-রা-য়-ণ। কিন্তু শব্দের বৈচিত্র্যের আর অন্ত নেই। কখনও মনে হচ্ছে সমগ্র পৃথিবী বুঝি প্রভঞ্জনে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। কখনও মনে হচ্ছে বানের তোড়ে সমগ্র সৃষ্টি বুঝি ভেসে গেল। আবার কখনও মনে হয় সমস্ত চরাচর নিদ্রায় অভিভূত; সৌন্দর্যে আপ্লুত। অকস্মাৎ দেখলাম, কখন থেকে যেন, নিজের সমগ্র অতীতজীবনের কথা ভেবে চলেছি। কত পরিচিত, অর্ধ-পরিচিত, বিস্মৃত, অর্ধ-বিস্মৃত মুখ চোখের সামনে দিয়ে স্রোতের মত ভেসে চলেছে। কেউ হয়তো আত্মীয় ছিল, কেউ সহকর্মী; কারো সঙ্গে হয়তো বিবাদ হয়েছিল, কারো সঙ্গে অনেক দিন সাক্ষাৎ হয় নি। চাকরি-জীবনের প্রথম দিনটির কথা মনে পড়ল। কত প্রত্যাশিত দিন। কী মর্মান্তিক হতাশা! ফিরে গিয়ে আবার সেই চেয়ারে বসতে হবে। আবার সেই অপরিণত বৃদ্ধদের সঙ্গে অশ্লীল আলাপে কালাতিপাত করতে হবে। তাঁদের চোখে দীপ্তি নেই, কর্মে উৎসাহ নেই, মনে আশা নেই। ক্রমাগত কেবল নিজেদের চিমটি কেটে কোনক্রমে জাগিয়ে রাখা। কখনও রাজনীতির চিমটি, কখনও

অর্থাভাবের চিমটি, কখনও বা রোগের। তারপরে শীঘ্রই একদিন অবশ্যম্ভাবীরূপে ওঁদের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য মিশে যাব। মরে গিয়ে তখন আর জানতেই পারব না যে মরে গেছি। কিন্তু সব—এই মর্মান্তিক ভবিষ্যৎটাও যেন কত আগেকার কথা! অবিস্মরণীয়, অনস্বীকার্য কিন্তু আজ সম্পূর্ণ জ্বালাহীন। ভজনের গ্রাম কখনও উঠছে কখন নামছে, মাঝে মাঝে বীণার তীব্র ঝঙ্কার ছাপিয়ে উঠছে গায়কের উদাত্ত স্বর। ক্রমে যেন নিজেকে কেমন নেশাগ্রস্ত মনে হল। মাথা যেন একটু একটু এদিক-ওদিক দুলছে। সমগ্র বিশ্বচরাচর ঢাকা পড়ে গেছে, শ্রোতাদের কেউ আর চোখে পড়ছে না। সন্ন্যাসী শুধু গান গেয়ে চলেছেন বীণা বাজিয়ে। এক সঙ্গীতে সমস্ত পৃথিবী মূর্চ্ছিত। পৃথিবীর বক্ষ বিদীর্ণ করে গমকে গমকে রোদন উঠছে, সে রোদনে কি অপার শান্তি!

চলুন, চা খেয়ে আসা যাক। সেই নাস্তিক সাধু যে কখন খঞ্জনী ছেড়ে আমার পাশেই এসে বসেছিলেন খেয়াল করি নি। উনি আবার বললেন ফিস ফিস করে, চলুন, চা খাওয়া যাক।

চলুন।

আমরা দু জনে উঠে পড়লাম। বাইরে ততক্ষণে শীত বেশ জাঁকিয়ে বসেছে, সমস্ত অন্তরীক্ষ কুয়াশায় ঢাকা। এখানে ওখানে জড়ো হয়ে কুলির দল আগুন পোয়াচ্ছে। সিগারেট বের করে আমি একটা ধরালাম। ওঁকেও একটা দিলাম।

গান কেমন লাগছিল?

চমৎকার।

তবু কেন উঠে এলাম বলুন তো?

সে আমি কেমন করে জানব!

আপনি কেন তবে উঠে এলেন? শুধু চায়ের জন্যে নয় নিশ্চয়ই।

কুয়াশার স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করে চাঁদের নরম আলো তখন অদূরের তুষারশিখর নীলাভ করে তুলেছে; যেন স্বপ্নে-দেখা বিস্মৃতপ্রায় দৃশ্য। সাধুর ভ্রূতে কুঞ্চন নেই, কপালও ভাঁজমুক্ত; কিন্তু তবু অবয়বে কেমন নিবিষ্টতার ভাব। বললাম, নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম।

অতএব?

তবুও—

সিগারেট টানতে টানতে আবার দু জনে পথ চলতে লাগলাম। কেমন করে যেন এই নাস্তিক সাধুকে আজ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ মনে হচ্ছিল। যেন আমারই মতো অসহায় না হলেও, তদপেক্ষা অধিক উৎকণ্ঠিত। চলতে চলতে হঠাৎ যেন এক এক বার বোধ হল যে আমরা দু জনে আসলে এক এবং অবিচ্ছেদ্য। অবশেষে স্বল্পালোকিত একটা চায়ের দোকানে বসে সিগারেটটায় শেষ টান দিয়ে বললেন, আচ্ছা, নিজেকে না হারালে কি তাঁকে পাওয়া যায় না?

জানি না।

অথচ তাঁকে পাবার আশাতেই তো এত পথাতিক্রমণ, এত কষ্ট সওয়া!

তবু, অত আশা করবার সাহস কোথায়। আর পেলেই কি গ্রহণ করা সামর্থ্যে কুলোত!

কিন্তু মনের কোণে একটু আশার আভাস ছিল নিশ্চয়ই।

হয়তো ছিল।

তা ছাড়া, যেই নিজেকে সামলাবার জন্যে এত সন্তর্পণতা তা তো কীটদষ্ট।

এবং পূতিগন্ধময় কুৎসিত।

সেটুকু হারালে তো কষ্ট হবার কথা নয়, বরং স্বস্তি পাবার কথা।

বিলক্ষণ।

তবে?

তবুও!

দুজনে নীরবে চা পান করলাম। একটা করে আবার সিগারেট ধরালাম। তিনি বললেন, তা ছাড়া, নিজেকেই যদি হারালাম তবে তাঁকে যে পেলাম তা জানব কেমন করে?

তা ছাড়া, এক অজ্ঞেয়র আশায় এত দিনের অন্তরঙ্গতমকে এমন ভাবে বিসর্জন দেব?

আর আমরা যদি তাঁরই অংশ তবে ত্যাগই বা করতে হবে কেন? এক তো অপরেরই পরিপূরক, তবে এত দ্বন্দ্বই বা কিসের?

আপনার অভিজ্ঞতা বেশী, আপনিই বলুন।

বলবার মত ফল এখনও কিছু সংগ্রহ করতে পারি নি। তবে দ্বন্দ্ব আছে। একে অপরকে সইতে পারে না। আর আমি যেন দুই সতীনের স্বামী, না মেলে প্রেম না মেটে তৃষ্ণা।

আচ্ছা, জীবনটাকে আপনার কখনও সত্যিকারের নদীর মত বলে মনে হয়েছে ?

একাধিক বার। কত গ্রাম-জনপদ বন-জঙ্গল পাহাড়-প্রান্তর পেরিয়ে এলাম, তার ইয়ত্তা আছে ?

তবে তো দ্বন্দ্বের কোন কারণ দেখি নে। লাল, ঘোলা, সাদা বিভিন্ন নদীর কত বিচিত্র বর্ণ! কারও গতি ধীর-মন্থর, কেউ চলেছে পর্বত ভেঙে নগর ভাসিয়ে! অথচ সমুদ্রে পড়ে কে আর কার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখছে। সেখানে সবাই নীল; চন্দ্রের আকর্ষণে হয় জোয়ার, নয় ভাটা। কিন্তু তবু সমুদ্রের দিকে বইতে কারুরই উৎসাহের অন্ত নেই।

তা নেই।

তবে ?

তবুও।

দুজনে আবার কিছুক্ষণ নীরবে বসে রইলাম। স্বর্ণশৃঙ্গ ও বদরিকা পর্বতের মধ্যপথে নীলকণ্ঠ-চূড়া দেখা যাচ্ছে। সম্পূর্ণ বরফাবৃত। চূড়ার চতুর্দিকে যেন বরফের তাবু পড়েছে। চন্দ্রালোকে ঝকঝক করছে পিন্যাক্‌ল্‌গুলো।

হয়তো এই দ্বন্দ্বটাই আবরণ। দ্বন্দ্বের উর্ধ্বে উঠলেই তাঁকে পাব, তখন আর কোন ক্ষতও থাকবে না।

সে কি সম্ভব ?

অসম্ভবই বা বলি কী করে। তবে বড় শক্ত। বন্ধনের তো এককালে অন্ত ছিল না, চা সিগারেট এটা-ওটা-সেটা। কিন্তু সেগুলো সব আজকাল কাটিয়ে উঠেছি। আপনি বললেন, দু কাপ চা খেলাম, দশটা সিগারেট টানলাম, কিন্তু এ সবে আজকাল আর ধরে না। না হলেও দিব্যি চলে যায়। তবে ওই আমিত্ব কাটানো বড় শক্ত, এক এক সময় তো মনে হয় অসম্ভব।

চেষ্টা করেছেন কখনও ?

কখনও কখনও চেষ্টাও করে উঠতে পারি নি।

তবু আগেকার জীবনের চাইতে আপনার বর্তমান জীবনে চেষ্টা করবার সুযোগ নিশ্চয়ই বেশী।

কিন্তু প্রয়োজন অনেক কম। আগে যখন চাকরি করতাম, বালীগঞ্জের পথে পথে এর-ওর পেছনে কুকুরের মত ঘুরে বেড়াতাম তখন যেন ওই, যাকে বলে—ঐশী তৃষ্ণা, তা অনেক বেশী ছিল। সমস্ত দিন বঞ্চনা কুড়িয়ে কেটে যেত। কিন্তু তারপরই শুরু হত আত্মগ্লানি, আত্মনিগ্রহ। মুক্তির পথ খুঁজে খুঁজে রাত্রির পর রাত্রি বিনিদ্র কেটে যেত। জীবনের অর্থ, মৃত্যুর অর্থ, ত্যাগের অর্থ, ভোগের অর্থ ভেবে ভেবে বিভ্রান্ত হয়ে পড়তাম। এক এক দিন মনে হত, আত্মহত্যা ছাড়া রেহাই নেই ; এক এক দিন মনে হত এত যে চাইছি তার বিনিময়ে কী মূল্য দিয়েছি—মূল্য দিতে হবে সাধনা করতে হবে, তবে তো সিদ্ধি। আবার কখনও মনে হয়েছে, মূল্য কি কম দিয়েছি, সয়েছি কি কম ? এত গ্লানি, এত অপমান, এত বিচার-বিশ্লেষণ—এর কোন দাম নেই ? তার পরেই হয়তো হাসি পেয়েছে যে, সব মূল্যই তো জমা দিয়েছি ভুল সেরেস্তায় ! সে জীবনে দ্বন্দ্ব অনেক প্রখর ছিল, সমাধানের চেষ্টাও ছিল অনেক বেশী একাগ্র।

আর এখন ?

এখন ? না, এখন আর সেই দ্বন্দ্ব তেমন উগ্র নয়। সমস্ত দিন নতুন নতুন পথে হেঁটে, নিত্য নতুন লোকের সঙ্গে পরিচয় করে কেটে যায়, সন্ধ্যার পরেই অগাধ নিদ্রা। বিবাদেরও প্রয়োজন নেই ঈশ্বরও অনেক ফিকে হয়ে গেছেন। নিজে এসে গায়ে পড়ে দেখা না করলে আজকাল আর সাক্ষাত হয় না !

আমার আর কিছু বলার ছিল না, ছাড়া ছাড়া কথায় খেই হারিয়ে ফেলছিলাম। সাধুও আপন মনে বসে বসে ভাবতে লাগলেন। অবশেষে রাত এগারোটা নাগাদ যে-যার চটির উদ্দেশে রওনা হলাম। বদরিকাশ্রম তখন সুখস্বপ্নে বিভোর। মন্দির থেকে তখনও ভজনের সুর ভেসে আসছে ; নিশীথের নিস্তব্ধতা কানায় কানায় পূর্ণ করে তুলছে।

সেদিন চায়ের দোকান থেকে চটিতে ফেরবার পথে কী ভাবছিলাম ? কিছু ভেবেছিলাম কি ? সেই আজন্ম-পরিচিত নাগরিক-দিগন্তের কথা

বা এই দ্বিতীয় দিগন্তের কথা? পুরানো জীবনের বন্ধন আর এই নতুন জীবনের আকর্ষণে কোন টানা-হ্যাঁচড়া বেধেছিল কি? কিছুই মনে নেই। শুধু তখনকার দেখা একটা দৃশ্য এখনও স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নীলকণ্ঠ-চূড়ার এদিকে একটা বিরাট পর্বতের প্রায় শীর্ষদেশে তিনটে নির্ভীক নিঃসঙ্গ চেরী গাছ সোজা দাঁড়িয়ে আছে। যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রণতি জানাচ্ছে। তারপরেই দিগন্ত জুরে তুষারাবৃত নীলকণ্ঠ-পর্বত। চারপাশের বরফের দীপ—পিন্যাক্‌ল্‌গুলো চন্দ্রালোকে ঝকঝক করছে!

চটিতে ফিরে দেখি দলের সবাই নিদ্রামগ্ন। এক নীলমণি ছাড়া। আমি শুয়ে পড়তে ও বলল, ভাবছি কালই চলে যাব।

কেন, অত তাড়া কিসের?

পয়সাকড়ি ফুরিয়ে এল। পকেটে দুটো চারটে টাকা থাকতে থাকতে ঘরের ছেলে ঘরে ফেরা ভাল। গিয়েই তো দেখব, বাড়িতে বাজারের পয়সা নেই। আপনারা না হয় দুচারদিন থাকুন আরও।

এক্ষুণি তো আর যাচ্ছেন না। সে সব কথা কাল ভেবে দেখা যাবে। একটু হেসে আমি পাশ ফিরে শুলাম, এবং তক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়লাম।

সেই রাত্রির কথা ভেবে আজও আমার আর বিস্ময় কাটে না! কোন্‌টা সত্য ছিল এবং কোন্‌টা মিথ্যা? কিংবা দুটোই সত্য? ওই চায়ের দোকানে বসে অমন কঠোর আত্মজিজ্ঞাসা, অত চুলচেরা বিচার এবং তার একটু পরেই সহজ নিদ্রায় অমন সর্বাঙ্গীন আত্মবিস্মৃতি—কোন দ্বিধা নেই কোন দ্বন্দ্ব নেই! অত পাশাপাশি এই দুটোই বা সত্য হয় কী করে? অথচ দুটোর কোনটার তলাতেই তো সামান্যতম বিক্ষোভ প্রচ্ছন্ন ছিল না।

এক এক সময় মনে হয়, দুটোই বোধ হয় ছিল সংশয়বাদীর বিশুদ্ধ বিকৃতি। কিন্তু অমন কপটতার প্রশস্ত স্থান তো বদরিকাশ্রম নয়, পরিবেশটাও যে ছিল মধ্যরাত্রির মুখর নিস্তব্ধতা!

এক এক সময় মনে হয়, ওই জিজ্ঞাসাটা অত্যন্ত কঠোর ছিল এবং আকর্ষণটাও আন্তরিক। এত কঠোর এবং এত আন্তরিক যে একবার যদি প্রশ্নটার মুখোমুখি দাঁড়াতাম, তবেই বিজিত হতাম। ভীরুর মত

তাই সহজেই আত্মসমর্পণের ভান করে প্রথম সুযোগেই পালিয়ে এসেছি। সাময়িকভাবে হয়তো ওই কপটতাকে সত্য বলে বিশ্বাসও করেছিলাম, তাই ওই সহজ নিদ্রা!

আবার কখনও মনে হয়, আমার আচরণে কোন কপটতা বা ভানই হয়তো সেদিন ছিল না। বৈষয়িক জীবনের সাধারণ স্তর থেকে আমি হয়তো সেদিন সত্যি সত্যি অন্যতর কোন স্তরে উঠে থাকব, এবং তারপর হয়তো অন্যান্য সব স্তরের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে থাকব। এমনও হয়; আর তখন মনে হয়, যে স্তরে আছি সে ছাড়া অন্য কোন স্তরই আর জীবনের নেই,—যেখানে অধঃপতনের আশঙ্কা বা আরোহণের প্রত্যাশা থাকতে পারে। তাই অমন নৈর্ব্যক্তিক বিষয় নিয়ে এত রাত পর্যন্ত আলোচনা করতে সেদিন কণামাত্রও সঙ্কোচ বোধ করি নি, তাই শুয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সেদিন নিদ্রাও অতি সহজেই এসে গিয়েছে,—সে-যে সমস্ত দ্বিধা-তর্কের ঊর্ধে, সমস্ত আশা-আশঙ্কার অতীত।

কিন্তু তাই যদি পুরো সত্যি হবে তা হলে তার পরদিন সুশীল যখন নীলমণির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলল, আমিও আজকেই নেমে যাব; না-হয় মুসুরীতেই দুদিন বেশী থাকা যাবে!—তখন কেন আমি সুরসুর করে ওদের পিছন পিছন নেমে এলাম? আমার তো অর্থাভাবও ছিল না, মুসুরীতে যাবার লোভও ছিল না, বরং বদরিকাশ্রমেই, চিরকালের জন্য না হলেও অন্তত কিছুকালের জন্য থেকে যাবারই উদগ্র বাসনা ছিল। যে জিজ্ঞাসা মনের কোণে উঁকি মারছিল তার কোন একটা চূড়ান্ত জবাব পাবার আগেই আমি কেন পালিয়ে এলাম?

মনে হয়, মানুষ শঠ না হলেই সৎ আর সৎ না হলেই শঠ, এই কথাটা সর্বদা সত্য নয়। অধিকাংশ সময়েই মানুষ যুগপৎ শঠ এবং সৎ। আমার সেদিনের ঐশী অতৃপ্তি যতটা আন্তরিক ছিল হয়তো ততটাই কপট ছিল। প্রশ্নটা যেমন স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছোবার বাসনাও তার চাইতে কম প্রবল ছিল না। ধরা দেবার আকাঙ্ক্ষা যেমন ছিল তেমনি ছিল ফাঁকি দেবার দুষ্টবুদ্ধি। আমিও মানুষ!

মনে হয়, সেদিনও আমি আর একবার পরশপাথর হাতে পেয়ে ক্ষ্যাপার মত আর একবার ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। আমি মানুষ! বড়ো দুর্বলপ্রাণ!

চৌদ্দ

নেমে আসছি। পুনরবতরণের পথে চার ফার্লং অতিক্রম করে আর একবার ফিরে তাকিয়েছিলাম। সেই তুষারাবৃত বদরিকাশীর্ষ; পদপ্রান্তে সেই উচ্ছ্বাসময়ী নীলাম্বরী অলকানন্দা; মধ্যে ঋষির কল্পনা বদরিকাশ্রম! সূর্যের উজ্জ্বল আলোকে সমস্ত পৃথিবী প্রভাময়। সেই মধুবাতা ঋতায়তে মধুঃ ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মনের মধ্যে একটা খণ্ডিত লয় আবার মুখর হতে চাইছিল, সেটাকে চাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে আসছি।

নেমে আসছি। পাণ্ডুকেশ্বর পেছনে ফেলে, বিষ্ণুপ্রয়াগ ছাড়িয়ে, যোশীমঠ অতিক্রম করে, কুমার-চটিতে রাত কাটিয়ে নেমে আসছি। পূর্ব আকাশের সূর্য মাথার উপর দিয়ে গিয়ে পশ্চিম গগন রাঙিয়ে অস্ত যাচ্ছে। রাত্রিবেলা এ চটিতে আশ্রয়, দুপুরে আর এক চটিতে দুদণ্ড বিশ্রাম নিয়ে আমরা আমাদের পথে নেমে আসছি।

নেমে আসছি। সারিবদ্ধভাবে একের পর এক। পাঁচজনে এক। ঝগড়া নেই বিবাদ নেই। অসুবিধে নিয়ে খুঁতখুঁতুনি নেই। পথের সঙ্গে মনোমালিন্য নেই। নিজের প্রতি ভ্রূ-কুঞ্চন নেই। একটানা নেমে আসছি।

নেমে আসছি। ঝরনার মত উচ্ছলধারে নয়। গড়ানো পাথরের মত নিজেকে ও পথকে ক্ষতবিক্ষত করে নয়। হরিদ্বারের গঙ্গার মত সবেগে সকল্লোলে নয়। নিস্তরঙ্গ উচ্ছ্বাসহীন কাশীর গঙ্গার মত কুলুকুলু বেগে বুঝি বা হরিশ্চন্দ্র ঘাটও পেরিয়ে নেমে আসছি।

নেমে আসছি। আসতে আসতে মাঝে মাঝে কি সব মিলিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে যে, কী পেয়েছি আর কী পাই নি। আসা কি সার্থক হয়েছে? আশা কি ব্যর্থ হয়েছে? ব্যয় তো অর্থে আড়াই শো, দেহে অন্তত দশ সের। আর মন তো হাজার হাজার নিয়ে এসেছিলাম, ফিরছে কটা! আয়ই বা হয়েছে কী? সত্য বটে যে দ্বিতীয় একটা দিগন্তের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছি, ভারত বলতে যে শুধু একটা ভৌগোলিক ব্যাপ্তি মাত্র বোঝায় না সে সম্পর্কেও আর সন্দেহ নেই। কিন্তু এই নবলব্ধ জ্ঞানে কি আমার নাগরিক জীবনের গ্লানি কমবে? সেই কলঙ্কিত দিগন্ত ত্যাগ করে এই নতুন দিগন্তে আশ্রয় নেয়া কি সহজ হবে আমার পক্ষে? দৈহিক ক্লান্তি, মানসিক অবসন্নতা, আত্মিক অক্ষমতা ভেদ করে মাঝে মাঝে এই ধরণের প্রশ্ন মনে জাগে। এবং সঙ্গে সঙ্গে খোলসের ভেতর বালু ঢুকলে শামুক যেমন ক্রমাগত লালা নিঃসরণ করতে থাকে, আমিও তেমনি দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায়, অনুভূতির প্রতিটি আনাচে-কানাচে, বোধির কূল ছাপিয়ে আলস্য বিস্তার করে দিই। অতএব কোন ভাবনা-চিন্তা নেই, হিসেব-নিকেশ নেই; গর্বও নেই গ্লানিও নেই। শুধু নেমে আসছি।

নেমে আসছি। একাদিক্রমে তিন দিন চার দিন ধরে। কিন্তু আজ ভাবলে মনে হয়, এই নেমে আসাটা যেন যতিহীন অখণ্ড একটা ব্যাপার। কখন্ কোথায় চা খেয়েছি, কবে কোন্ চটিতে বিশ্রাম নিয়েছি, কী দেখে বিস্মিত হয়েছি, কী দেখে মোহিত হয়েছি কিছুই মনে নেই। শুধু মনে আছে যে নেমে আসছি, অবিরত নেমে আসছি কেবল।

অবশেষে উনিশ শো পঞ্চান্ন খ্রীষ্টাব্দের একত্রিশে মে মঙ্গলবার সায়াহ্ন-বেলায় আবার পিপুলকোটি এসে পৌঁছলাম। পায়ে-হাঁটা পথের এখানেই শেষ, এখান থেকে বাস-পথ শুরু। তীর্থ পরিক্রমণ সম্পন্ন হল, এখন শুধু উপসংহারটুকু বাকি। একদিন বেলাশেষে রুদ্রপ্রয়াগ থেকে যে যাত্রা সুরু হয়েছিল, অনেক পথ অনেক যুগ অনেক দিগন্ত অতিক্রম করে অপর এক বেলাশেষে সেই যাত্রা সমাপ্ত হল পিপুলকোটি টার্মিনাসে।

সেই পিপুলকোটি টার্মিনাস। যাত্রীদের ভিড় ইতিমধ্যে একটুও কমে নি, একটি ধূলিকণাও আকাশ থেকে মাটিতে নামে নি, কুলিদের দরাদরি কষাকষি সেই উচ্চস্বরেই চলেছে। চমোলী থেকে এখনও একটায়

পর একটা বাস এসে থামছে, শত শত যাত্রী উদ্‌গিরণ করছে। এতকাল নির্জনবাসের পর জনতার সান্নিধ্য প্রথমটায় মন্দ লাগল না, কিন্তু অল্প পরেই অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করলাম। তন্মধ্যে করিৎকর্মা নীলমণি পরদিন সকালের প্রথম বাসের টিকিট কিনে এনেছে। আমরা দুজনে তখন ইতস্তত হাঁটতে হাঁটতে চটি থেকে একটু দূরে সরে এলাম, একটু নিস্তব্ধতায়।

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনিয়ে আসছে। পর্বতের বিলম্বিত ছায়ায় পাশের উপত্যকা শান্ত স্নিগ্ধ। ক্ষেতের কাজ সেরে পর্বত-তনয়ারা ধীর ক্লান্তপদে ঘরে ফিরে যাচ্ছে। অদূরে চটির কোলাহল মাঝপথ পর্যন্ত এসেই পথ হারিয়ে ফেলল। হিমালয়ের নির্জন বক্ষে আজকেই আমাদের শেষ সন্ধ্যা। কাল সকালে উঠেই বাস ধরব, তার পর কোথায় হারিয়ে যাব কেউ জানবে না!

পথ থেকে খানিকটা নেমে গমক্ষেতের আলের উপর দুজনে পাশাপাশি বসলাম। বসেই রইলাম কিছুক্ষণ। কারও মুখে কোন কথা নেই। মাঝে মাঝে পরস্পরের মুখের দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে চাইছি, কী যেন বলার আছে! তার পরই আবার দূর পর্বত-দিগন্তের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি, কী আর বলার আছে! দুদিন আগেও তো কেউ কাউকে চিনতাম না। কারও সঙ্গে কোন পরিচয়ই ছিল না। তার পর কার নির্দেশে কোথা থেকে কে এসে এক সঙ্গে পাচজন অকস্মাৎ জড়ো হলাম। কত পথ অতিক্রম করলাম, কত পথ-কষ্টের অংশীদার হলাম, বিবাদেরও কি অন্ত ছিল? না সৌহার্দ্যের! কত সৌন্দর্যে এক যোগে মোহিত, কত ব্যর্থতায় যুগপৎ ক্লিষ্ট হলাম। পার্থিব অপার্থিব কত অনুভূতিতে রোমাঞ্চিত শিহরিত হলাম! অবশেষে আজকের এই অন্তিম সন্ধ্যা। এর পর জনতার ভীড়ে কে কোথায় হারিয়ে যাব কে জানে, হয়তো সাক্ষাৎটুকুও হবে না আর কোনদিন, হলেও তখন কেউ কাউকে চিনতে পারব কি? হিমালয়ের পটভূমিকা সরে গেলে কার কেমন চেহারা হবে? হয়তো এর পর দৈনন্দিন ব্যস্ততার আড়ালে এই সহযাত্রীত্বের স্মৃতিটুকুও সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবে। আজকের এই শেষ সন্ধ্যায় আবার একবার তাই সবাইকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে! কিন্তু অদূরেই সেই চির-পরিচিত সমাজের আনুশাসনিক তর্জনী। নীলমণি

তাই আমার দিকে মাঝে মাঝে নীরবে চোখ ফেরাচ্ছে শুধু। আমিও নীলমণির দিকে চাইলাম।

মাথায় এক মাথা অযত্নবর্ধিত অবিন্যস্ত চুল। কপালের শিরাগুলো নীল হয়ে ফুলে উঠেছে। কোটরাগত চোখ দুটোর অস্বাভাবিক দীপ্তির উপরেও অবসন্নতার অনপনেয় ছায়া। তোবড়ান গাল দুটোর ওপর তিন সপ্তাহের খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। দেহ শুধু ক্লান্ত নয়, শীর্ণ এবং শুষ্ক। পরণের জামা-কাপড় পথের ধুলোর রঙে রঞ্জিত হয়ে গেছে। দেখলেই মনে হয়, এ কোথাকার হতভাগ্য ভবঘুরে! কোথাকার লক্ষ্মীছাড়া, যার দিকে চাইলেই চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়! গভীর উপত্যকার তলদেশে আবার দৃষ্টি ফেরালাম।

হতভাগ্য লক্ষ্মীছাড়া? হবও বা। কোন পুণ্যই অর্জন করি নি, ঝুলির শূন্যতা গোপন করবার মত সামান্য একটুও নয়। এত তীর্থ ঘুরলাম, কিন্তু ঈশ্বরে এখনও আস্থা আসে নি। একের পর এক কত মন্দির দেখলাম অথচ এক জায়গায়ও নিজেকে সমর্পণ করতে পারলাম না। কত বিগ্রহের কাছে পূজা নিবেদন করলাম তবু কারও ওপর নির্ভর করতে ভরসা হল না। এখনও মন অশান্ত, চিত্ত বিক্ষুব্ধ; পায়ের তলায় এখনও কোন নিশ্চিত ভূমি নেই, ভবিষ্যৎ আজও অন্ধকারে লক্ষ্যহীন। অথচ কেদারবদরিকা পরিক্রমা করে এলাম প্রায় দু' শ মাইল চড়াই উতরাই ভেঙে! আমরা কি শুধু হতভাগ্য লক্ষ্মীছাড়া?

ক্রমেই সন্ধ্যার অন্ধকার আরও ঘনিয়ে আসছে। ঘনায়মান তমিস্রায় হিমালয় যেন আকাশের ধূসর-কালো পটের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে মিলিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। কিন্তু এর মধ্যেই দূরে ও নিকটে, নীচে ও উপরে পাহাড়ের গায়ে কুটীরে কুটীরে দীপ জ্বালা হয়েছে। কোথায়ও বা চাষের আগে ক্ষেতে আগুন লাগান হয়েছে। বিশাল অন্ধকার সমুদ্রে ছোট ছোট আলোর দ্বীপ। যেন দীপাবলী রাত্রির অবসন্ন অন্তিম প্রহর। কৃষ্ণপক্ষের কালো আকাশে দুটো চারটে রূপালী তারা।

কিন্তু শুধুই হতভাগ্য লক্ষ্মীছাড়া, আর কিছু নই! সত্য বটে, বলে বোঝাবার মত কিছুই সংগ্রহ করতে পারি নি, কিন্তু বলে বোঝাবার জন্যে আদৌ উৎকণ্ঠাও তো নেই। সর্বসমক্ষে খুলে দেখাবার মত পুণ্য সঞ্চয় হয় নি বটে, কিন্তু খুলে দেখাবার ব্যগ্রতাই বা কই! এই তো

পিপুলকোটি টার্মিনাসের দক্ষিণে ক্ষেতের আলে বেশ নিশ্চিন্তে বসে আছি। চেহারা যাই বলুক, মনে তো কোন বিক্ষোভ নেই, কোন বঞ্চনা নেই। চিত্ত তো বেশ পরিতুষ্ট, যেন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে আছে। কিসে পরিতুষ্ট তার বৈজ্ঞানিক নামটা না-হয় নাই জানলাম; তার স্পর্শটুকুই কি যথেষ্ট নয়! এর পরও কেদার-বদরিকা স্ব স্ব স্থানেই সমাসীন থাকবে সে-কথায় তো কোনক্রমেই বিশ্বাস হয় না। তারাদাও কবে যেন বলেছিলেন যে, এ আপনার যুদ্ধের স্ফীত-বাজারে অর্থ বিনিয়োগ নয় যে রাতারাতি লাল হয়ে পত্রপাঠ রক্তচাপে মারা যাবেন। এ হচ্ছে গিয়ে যেন জীবন-বীমা। এখন প্রিমিয়াম গুনতে হচ্ছে, এরপরে হয়তো তা গুনতে আরও অসুবিধা হবে, কিন্তু অভাবের সময় প্রয়োজনের সময় এর উপযোগিতা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এ তো আর গাঁজার চাষ নয় যে বেলাবেলি বীজ রোপণ করে রাতারাতি ফসল ঘরে তুলবেন। এ হচ্ছে গিয়ে যাকে বলে মহীরুহ, অনেক জল শুষবে, অনেক যত্ন-আত্তি করতে হবে, অনেক দিন কোন ফলই পাবেন না। তার পর যখন ফল দিতে শুরু করবে তখন শুধু ভাণ্ডার পূর্ণ করেই দেবে না, বছরে বছরেও দেবে! হয়তো তাই। আজ কিন্তু গম ক্ষেতের এই আলে বসে মনে হচ্ছে, নিশ্চয়ই তাই। পর্বতের পটে দুটো চারটে প্রদীপের আলো ঝিকমিক করছে। দুজনে নির্বাক বসে রইলাম। আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে অবশেষে উঠে পড়লাম।

চটিতে নয়,—ক্লান্ত দিবসের শেষে চটির শান্ত-সন্ধ্যায় আশ্রয় নেয়া ঘুচে গেছে,—আস্তানায় ফিরে দেখি তার মধ্যে সব দায় সারা। মাল-পত্র তোলা হয়েছে, কুলি-ছড়িদারের হিসেব-নিকেশ মিলেছে, নৈশাহার হোটেলে।

হোটেলে খেতে গিয়ে দেখি, সামনে একটা পিতলের গ্লাসে চা নিয়ে সেই ভদ্রলোক—অজরামরকে যার চাই-ই চাই, যার জীবন-কাহিনীর করুণ আর্তনাদ শুনে শাকম্বরী মাতার স্থানে এক নির্জন বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যায় নিজেকে জগতের সঙ্গে এক এবং অবিচ্ছেদ্য বলে নির্ভুল উপলব্ধি হয়েছিল, সেই ভদ্রলোক উদাসভাবে বসে সিগারেট টানছেন একটার পর একটা। খেতে বসে বার বার মুখ তুলে ওঁর দিকে চাইছিলাম, দৃষ্টি বিনিময় হল একাধিকবার, কিন্তু একবারও তিনি আমায় চিনতে

পেয়েছেন বলে মনে হল না। আমার একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল যে ওঁর সন্ধান সার্থক হয়েছে কি না, সাধনা সিদ্ধিলাভ করেছে কি না। কিন্তু তন্মুহূর্তেই আবার প্রশ্নটাকে কেমন যেন অবান্তর বলে মনে হল। দাম চুকিয়ে দিয়ে আমরা হোটেল থেকে বেরিয়ে এলাম।

আবার আস্তানায় ফিরে কুলি-ছড়িদারের পাওনা যতটা অর্থে পরিশোধনীয় ততটা পরিশোধ করে দিলাম। গত তিন সপ্তাহের সহযাত্রীত্বে এদের সঙ্গেও কম মনোমালিন্য হয়নি, প্রচুর ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে। পথের সঙ্গে ঝগড়া করে এদের বকে শান্ত হয়েছি; নিজের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এদের বকে ঝাল মিটিয়েছি; এদের কাঁধে আমরা শুধু মালই চাপাই নি, আপন ব্যর্থতার জ্বালায়ও এদের দগ্ধ করেছি। আজ এই শেষ সন্ধ্যায় সেই সব কথা স্মরণ হতে সকলেরই চোখ ছলছল করে উঠল। কিন্তু কয়েকটা টাকা বেশী দিয়ে শুধু ঋণ বাড়ানো ছাড়া আর কিছুই করবার সাধ্য আমাদের ছিল না। উত্তমর্ণের দৃষ্টি এড়িয়ে তাড়াতাড়ি কম্বলের তলায় আত্মগোপন করলাম।

কিন্তু সেই রাত্রিতে ঠিক সুনিদ্রা হল না। ক্লান্ত চোখ ও অবসন্ন মনে সহজেই তন্দ্রা নেমে এল, এবং তন্দ্রাবিষ্ট মনের চোখের সামনে দিয়ে একে একে ভেসে যেতে লাগল সেই মন্দাকিনী বক্ষে রামপুর চটি; সেই চা-ওয়ালা আবার মাথা নেড়ে বলল, হম তো যাত্রীলোগোকে পায়ের কি চাল হি পড়তা রহতা হ্যায়; সেই চন্দ্রাসঙ্গমে চন্দ্রাপুরী চটি; সেই পর্বতশীর্ষে কোমল আলোক-স্নাত ত্রিযুগীনারায়ণ, তারপর গৌরীকুণ্ড, উখীমঠ, মণ্ডল, যোশীমঠ, পাণ্ডুকেশ্বর, চটির পর চটি। কত অজস্র চটি! আর টানা টানা পথ। পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে যোজনের পর যোজন চড়াই আর উতরাই। কোথায়ও একটু ছায়াস্নিগ্ধ, কোথায়ও সূর্যকিরণে তপ্ত। আর কত যাত্রী! অজস্র অগণ্য, অথচ সবাই নিঃসঙ্গ। সেই বুড়ি, সেই বাঈজী, সেই কর্ণেল-পত্নীর পারলৌকিক অভিভাবক, সেই ভদ্রলোক, সেই কুলি, সেই শালগ্রামশিলা, আরও আরও কত কে—যে-যার বোঝা কাঁধে ফেলে ধীরপদে সেই পথ ধরে আমার তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখের সামনে দিয়ে কোন্ অনন্তলোকের উদ্দেশে চলেছে সবাই! হঠাৎ দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, চন্দ্রাপ্রয়াগ, শোণপ্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ—প্রয়াগগুলো সব সম্মিলিত হয়ে কলগর্জনে সবকিছু ভাসিয়ে দিল নিঃশেষে। পথ, চটি,

যাত্রী, পর্বত সবকিছু অকস্মাৎ কোথায় মিলিয়ে গেল! তীব্র বেগে সমস্ত চরাচর প্লাবিত করে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ডুবিয়ে চতুর্দিকে শুধু জল আর জল! তারপরই তুষার দিগন্তে সেই তুষারাবৃত কেদার পর্বত—মৃত্যুর মত স্থির অচঞ্চল নিষ্কলঙ্ক। কেদারনাথের গায়ে সরীসৃপের মত একটি বাঁকা পথ আঁকা। তবে পথটি যেন আর অনির্দেশ্য নয়, ওই তো পথের অপরপ্রান্তে মন্দমধুর হাওয়ায় ভজনের অপার্থিব সুর মূর্ছা যাচ্ছে। ওই তো বদরিকাশ্রম। শীর্ষে সেই তুষারক্ষেত্র, পদপ্রান্তে সেই উচ্ছ্বাসময়ী অলকানন্দা, মধ্যে ঋষির কল্পনার উদার রঙে আঁকা বদরিকাশ্রম। ওই তো বীণার তীব্র ঝঙ্কারে সে-আলেখ্য মুখর হয়ে উঠছে।

সমে পৌঁছতে তন্দ্রা কেটে গেল। আস্তানার সবাই তখনও নিদ্রামগ্ন। আমার পাশেই তারাদা শুয়ে আছেন। উস্কখুস্ক চুল, চোখ বোজা, মুখটা হাঁ হয়ে আছে, কিন্তু তবু যেন নিদ্রিত নন। এই স্বল্পালোকেও চোখের পলক দুটো অতিক্রম করে কোন দৃশ্য দেখে যেন মোহিত হয়ে আছেন। দরজা-পথে বাইরের দিকে চাইলাম। হিমালয় অন্ধকারের সঙ্গে মিশে আছে, দিগন্তের কালো মেঘের মত। কিন্তু উপরে, অনেক উপরে, আকাশের একটু নীচে ক্ষেতের আগুন তখন অনেক দূর ছড়িয়ে গেছে। সে-আগুনে আকাশ রক্তিম। এইবার জেগে বসে ভাবতে লাগলাম। অনির্দেশ্য সব চিন্তা।

কিছুক্ষণ পরেই চটির নিদ্রা ভাঙল। তখন শুরু হল বাসগুলোতে জল ভরা, বাসগুলো মোছা, বাসগুলোকে সারিবদ্ধভাবে সাজানো। কুলি ও ছড়িদারদের সহযোগিতায় তাড়াতাড়ি বিছানা-পত্র বেঁধে নিয়ে সবাই ছুটে গিয়ে বাসে উঠে বসলাম। পিপুলকোটি টার্মিনাস তখন কোলাহলে সরগরম। পূর্বদিগন্তের আলো ইতিমধ্যেই পথের ধূলায় ম্লান। বিদায়ের ক্ষণটি যেন আর একটু শান্ত আর একটু স্নিগ্ধ হলেই ভাল হত!

অবশেষে বাসের ড্রাইভারও এসে আপন আসনে সমাসীন হল, বাস ছাড়তে আর বিলম্ব নেই। এমন সময় ছুটতে ছুটতে কুলি দেশীরাম এসে হাজির। মুখ কাচুমাচু করে অপরাধীর মত আমার দিকে ছ আনা পয়সা এগিয়ে ধরল দেশীরাম; সেই পাণ্ডুকেশ্বরে উধার নিয়েছিল, তারপর খেয়াল করে আর শোধ দেওয়া হয় নি, সেই ছ আনা! আমি কিন্তু আদৌ হতবাক হলাম না, কিন্তু তবু গলায় কথা আটকে গেল। ওর হাত

স্পর্শ করে পয়সা কটা ওকেই রাখতে বললাম। সেলাম করে দেশীরাম পিছন ফিরল। আমাদের বাসও সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল। পেছন ফিরে দেখি, দেশীরাম কার সঙ্গে যেন অত্যন্ত ব্যস্তভাবে কথা বলছে, আমাদের বাসটার দিকে একবার চোখ কাত করেও দেখল না। কি জানি, এই-ই হয়তো স্বাভাবিক!

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পিপুলকোটি পর্বতের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল, শ্বাসরুদ্ধ করে চড়াই ভেঙে, নিশ্বাস ছেড়ে উতরাই নেমে বাস দ্রুতবেগে পথ অতিক্রম করতে থাকল। আবারও সেই সামনে দু হাতের বেশী পথ নজরে পড়ে না, ডাইনেই অতলস্পর্শী গভীর উপত্যকা। কিন্তু, কি আশ্চর্য, সেই মৃত্যুভয় আজ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত! যেমন আমার মধ্যে তেমন অন্যান্য যাত্রীদের আচরণে। সেই মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি নেই, সেই কলকের পর কলকে গঞ্জিকা-সেবন নেই। রুদ্রপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, কর্ণ-প্রয়াগ অতিক্রম করে বাস এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে পথিপার্শ্বের অবহেলিত চটিগুলো কাতর নয়নে চলমান বাসটির দিকে তাকিয়ে দেখেই আবার ঝিমোতে শুরু করছে। স্থানীয় পথিকেরা বাস দেখে পথ ছেড়ে হয় উপরে উঠে যাচ্ছে, নয় নীচে নামছে। বাসের ঝাঁকুনিতে চোখে একটু তন্দ্রা এসেছিল। সজাগ হতে দেখি মাথার বিলিতি ফেল্টের টুপিটা কখন বাইরে উড়ে হারিয়ে গেছে। সেই টুপিটা, প্রণামীর থালায় যার কোণ ঠেকতে ত্রিযুগীনারায়ণে শেষ পর্যন্ত আর প্রণাম করা হয়ে ওঠে নি! এই টুপির কানাতে বাধা পেয়ে হিমালয়ের আরও কত রূপ আমার অদেখা রয়ে গেল তাই বা কে জানে। সেই টুপিটা এতদিনে হারাল। এতদিনে। যাত্রাও হয়তো শুরু হল এতদিনে। সমাপ্তি মানেই তো নব-প্রস্তুতি!

শ্রীনগরে বাস থেকে নেমে কিয়াতনগরে পৌঁছতেই আবার বাস মিলে গেল। সন্ধ্যাবেলায় আবার সেই হৃষিকেশ।

তিন সপ্তাহের তীর্থ পরিক্রমা অবশেষে সমাপ্ত হল। এ পরিক্রমা সার্থক হয়েছে কি ব্যর্থ হয়েছে তা জানি না। সার্থক যদি হয়ে থাকে তবে তার জন্যে কোন গর্ব নেই, যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে তবে তাও

অনুশোচনাহীন। যদি কেউ জিজ্ঞেস করেন, যাত্রা কেমন হল ? তবে ভাল না, সেটা অপ্রাসঙ্গিক হবে। মন্দও বলব না, সেটা হবে মিথ্যাকথন। সুন্দর বললে কিছুই বলা হবে না, অপূর্ব বললে বোঝা যাবে না কিছুই পথকষ্ট এখানেও সেই একই সমস্যা। মারাত্মক মিথ্যা নগণ্য বললে হবে অসত্য। এর জবাবেও আকাশের দিকে চাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই !

তবু বলব, এ পথে আবার আমি আসব। যদি এই পথে বাস অনেক দূর এগিয়ে যায় তবে গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী যাব, পশুপতিনাথ যাব, কৈলাস মানস-সরোবর যাব, ঈশ্বরের অনুগ্রহ থাকলে মুক্তিনাথ। সময় হলে সুযোগ করে হিমালয়ে বার বার আসব আমি।

তবে কোন আশা নিয়ে আর কখনও আসব না। তবু প্রতিবার যে আশাতিরিক্ত নিয়ে ফিরব এই যাত্রার শেষে সে বিষয়ে অন্তত আর কোন সন্দেহ নেই !

॥ শেষ ॥